সম্পাদকের নিবেদন।

সবুজপত্র যেমন করেই হোক্ আরো এক বৎসর বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে আমরা বাধ্য।

একটা নবযুগ তার আনুসঙ্গিক নানারূপ আশা বিভীষিকা সঙ্গে নিয়ে আমাদের দুয়োরে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে কি ভাবে আমরা ঘরে তুলে নিই—আদরে না অবহেলায়, আনন্দে না আশঙ্কায়, তার উপর আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করবে। আমাদের মত যারা এই নবযুগের উদ্গাতা তাদের পক্ষে এ সময়ে নীরব থাকা অসম্ভব।

অতঃপর এ দেশে যে ডিমোক্রাসির সূত্রপাত হল, সে বিষয়ে আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। যাঁর আছে, হয় তিনি ডিমোক্রাসির অর্থ বোঝেন না, নয় তাঁর দূরদৃষ্টি নেই। এর উত্তরে পূর্ব্ব পক্ষ নিশ্চয়ই বলবেন যে আমরা চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখছি। এ উত্তরের প্রত্যুত্তরে কিছু বলা অনাবশ্যক। এক পক্ষের কাছে যা অস্তি আর এক পক্ষের কাছে যদি তা নাস্তি হয় তাহলে হাজার তর্কে সে দু'পক্ষের মতের মিল কিছুতেই হতে পারে না। শুধু ধর্ম্মে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আস্তিক ও নাস্তিক, দুটি বিভিন্ন জাতের লোক। এদের পরস্পারের মূল প্রভেদ হচ্ছে প্রকৃতিগত।

স্বজাতির পলিটিক্যাল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আস্তিক। আমি

স্বজাতির মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি এবং বিজাতির মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি নে। এইজন্যে আমি তাঁদের বলি নাস্তিক, যাঁরা স্বজাতির মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করেন না, এবং বিজাতির মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন। আমাদের এই বিশ্বাস ও তাঁদের এই অবিশ্বাস কোন পক্ষই তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না, কেননা এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই দুটি অজানা জিনিষ নিয়ে কারবার করছেন, প্রথম জাতীয় আত্মা, দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ কাল।

আমাদের কথা হচ্ছে এই যে উক্ত বিশ্বাসই হচ্ছে আমাদের সকল বলা-কওয়ার আসল ভিত্তি। ও-বিশ্বাস ত্যাগ করলে আমাদের পক্ষে মৌনব্রত অবলম্বন করে নির্ব্বাণমুক্তির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ডিমোক্রাসি শব্দের অর্থ কি?—

একটা জাতির ভিতর এক এক যুগে এক একটি কথা ওঠে বা হাওয়ায় উড়ে আসে, যা সকলের মুখেই শোনা যায়, আর যা সকলের মনকেই আকৃষ্ট করে, সে সব কথার স্পষ্ট অর্থ বোঝানো অসম্ভব। আমার দার্শনিক গুরু Bergson বলেন, সে অর্থ বোঝানো যেমন অসম্ভব, জনগণের পক্ষে তা বোঝাও তেমনি অনাবশ্যক। কেননা সে সব কথার প্রকৃত অর্থ অভিধানের মধ্যে নেই, আছে জীবনের অভিব্যক্তির মধ্যে। এ জাতীয় কথা যে ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় সে ধাতু হচ্ছে প্রাণ। লোকের যদি বিশ্বাস থাকে যে ডিমোক্রাসির অর্থ তারা বোঝে ও সে পদার্থে তাদের আস্থা থাকে তাহলেই তারা ডিমোক্রাসি গড়ে তুলতে পারবে। এ আস্থাই হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্বের

উপর বিশ্বাস। তার পর ডিমোক্রাসি কোনো দেশেই পড়ে-পাওয়ার জিনিষ নয়, সব দেশেই গড়ে তোলবার জিনিষ। এবং সেই জন্যই ডিমোক্রাসি শব্দের প্রতি ভাষায় অর্থ স্বতন্ত্র, কেননা প্রতি জাতি ও-বস্তু নিজের মন ও প্রাণ দিয়ে গড়ে তোলে। আর যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তেমনি জাতিতে জাতিতেও মনপ্রাণের অল্প বিস্তর পার্থক্য আছে। যেদিন আমরা ডিমোক্রাসি গড়ে তুলতে পারব সেই দিন ও-শব্দ বাঙলা হয়ে উঠবে, তখন তার মানে জানবার জন্যে আমাদের ইংরাজি অভিধানের আর সাহায্যে নিতে হবে না। ডিমোক্রাসির অর্থ একটা বিশেষ রকমের শাসনতন্ত্র মাত্র নয়, ও-বস্তু হচ্ছে একটা জাতির আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের একটা পরিণত রূপ।

আমরা এই স্বদেশী ডিমোক্রাসির গঠনকার্য্যে নিজ শক্তি নিয়োজিত করব, অবশ্য একমাত্র কথা কয়ে। কিন্তু কারো ভোলা উচিত নয় যে কথাও হচ্ছে এক রকম কাজ—অবশ্য সে কথার ভিতর যদি আন্তরিকতা থাকে।

বিলেতি ডিমোক্রাসির যে-সকল নমুনা আমাদের চোখের সুমুখে রয়েছে তা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরও নয়, সর্ব্বগুণে গুণান্বিতও নয়। স্বরাজ্য কোনো দেশেই স্বর্গরাজ্য নয়। শাসনতন্ত্র হিসেবে ডিমোক্রাসি হচ্ছে প্রথমত কথার রাজ্য। সংবাদ-পত্র ও বক্তৃতা এ তন্ত্রের দুটি শক্তিশালী অঙ্গ। যে দেশে এ তন্ত্র আছে সে দেশে কথার আর অন্ত নেই। "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর"—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি, ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। সুতরাং দুদিন পরে দেখা যাবে যে, দেশের আকাশ মিছে কথার কুয়াসায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তার পর

ডিমোক্রাসি সম্প্রদায়িক দ্বেষহিংসার অত্যন্ত প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু ডিমোক্রাসির সব চাইতে সর্ব্বনেশে দোষ এই যে, এ তন্ত্রে বৈশ্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণবুদ্ধির স্থানকে অধিকার করে। কেননা শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়ার চাইতে বৈশ্য হওয়া ঢের বেশি সহজ। শুধু তাই নয়, এ তন্ত্রে বৈশ্যেরাই শূদ্রের বেনামিতে দেশের লোকের উপর প্রভুত্ব করে। ফলে ভাবে ও ভাষায়, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে এ তন্ত্রের সহজ ঝোঁক ইতরতার দিকে। সুতরাং একদিকে ডিমোক্রাসি গড়ে তোলবার সাহায্য করা যেমন আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য আর একদিকে এই মিছে কথা, এই দ্বেষহিংসা এই বৈশ্যবুদ্ধি এই ইতরতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাও আমাদের পক্ষে তেমনি কর্ত্তব্য এবং সে অস্ত্র হচ্ছে সাহিত্য। রূপ-লোকের সন্ধান না পেলে মানুষে কামলোকের মায়া কাটাতে পারে না। সাহিত্য অবশ্য এই রূপলোকের কথাই মানুষকে শোনাতে চায়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অশান্তের দল।

—:o:—

পূর্ব্বাচল হ'তে আজি এসো নিয়ে এসো
স্বর্ণ রশ্মি-জাল,
ভূষিত করিয়া দাও কনকভূষণে
লজ্জা-নত ভাল।
স্কন্ধে লয়ে কে ফিরিবে দ্বারে দ্বারে দ্বারে
ভিক্ষা-করা ঝুলি ?
করুণার সুরে বাঁধা লজ্জাহীন মুখে
কাতরতা-বুলি ?
পূর্ব্বাচল হ'তে নিয়ে স্বর্ণ রশ্মিমালা
কর কর ভূষা,
আঁধারের শেষে আজি সাগরের নীরে
ওই জাগে উষা !

উদয় অচলে আজি ওই জাগে উষা ;
অশান্তের দল,
কোন্ বেশ পরি' তোরা বিশ্বরাজ-পথে
বাহিরিবি বল্ ?
বক্ষপাশে জাগিবে কি অদম্য উল্লাসে
জীবনের সুখ ?

সীমাহীন দিগন্তের আলো স্বপ্ন দিয়া
ভরিবে কি বুক ?
সপ্তসিন্ধু-বুকে-ফেরা এনো যে বাতাস
অশান্তের দল !
তারে কি ধরিবি আজি তোর বক্ষপুটে
বল্ ওরে বল্ ?

কে রহিবে ওরে আজি কে রহিবে ঘরে
শান্ত অন্ধ মূক !
আজি যে এ ধরিত্রীর প্রতি রন্ধ্রে জাগে
অদম্য কৌতুক !
দিগন্তের কোণে কোণে নিমেষে নিমেষে
ওঠে তার হাসি,
সপ্তসিন্ধু বুকে বুকে কার বাজে ওই
আমন্ত্রণ বাঁশী !
চরণ রহে না আর—অশান্ত চরণ
রুদ্ধ দ্বার ঘরে,
আজি যে বিশ্বের রাজা ডাকে বাহিরিতে
বরাভয় করে !
আয় আজি আয় ওরে অশান্তের দল
ছাড়ি মিথ্যা ভয়,
সপ্তসিন্ধু-কূলে কূলে গাব জীবনের
জয় জয় জয় !

অনন্ত গগন পানে দিব দিব মেলি
এই ক্ষুদ্র হাত,
পারি না পারি না আজি করিব রে ভয়
বজ্র অকস্মাৎ—
আকাশের তারা ছিঁড়ি কণ্ঠহার গাঁথি
পরিব গলায়,
ভয় যে লাগে না প্রাণে উল্কা হ'য়ে যদি
ভস্ম করি যায়,—
চাঁদিমার রৌপ্য কাড়ি' গড়িয়া কিরীট
দিব শিরোপরি,
অদম্য পুলক বুকে কেমনে বাঁধিব
শঙ্কা ছল করি'?
উদয়-অচলে আজি জাগে স্বর্ণ উষা
জীবন মোহন,
রে অশান্ত আয় ছুটি বিশ্বপথে পরি'
বীরের ভূষণ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পত্র।

শ্রীযুক্ত "সবুজপত্র" সম্পাদক মহাশয়

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

আমার বড় অহঙ্কার যে সবুজ-পত্রের মধ্যে আমিও একটি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহুদিন আপনি এই পত্রটির কোন খোঁজ নেন নাই। আমিও আপনার কোন খোঁজ নিতে পারি নাই; কেননা আমার এতদিন 'নিজের খোঁজই কে-নেয়' এই অবস্থা ছিল। এই অবস্থার শেষে এবং বসন্তের প্রথমে আপনার খোঁজ নেবার কথা প্রাণে প্রাণে বোধ করিলাম।

আমাদের দুই ভাইয়ের, প্রথমটির নাম তুলসী পত্র বা তুলসী পাতা, দ্বিতীয়টির নাম বিল্বপত্র বা বেলের পাতা। দ্বিতীয়টি আমি, আমিই বিল্বপত্র। দুইটি ভগ্নাও—করবী ও অতসি। শক্তি-উপাসক-দম্পতীর, আদরের নামই পাইয়াছিল। কিন্তু আমার কথাটাই আমি বলিব।

বিল্বপত্র বা বেলের পাতার তিনটি অংশ,—একটি সাম্য, একটি মৈত্রী আর মধ্যেরটি উচ্চশির সুতরাং স্বাধীনতা; একটি সত্ত্ব, একটি তমঃ, মধ্যেরটি একই কারণে রজঃ; একটি সৃষ্টি, একটি লয় মধ্যেরটি মধ্যাবস্থা সুতরাং স্থিতি ইত্যাদি বহুপ্রকারে ঐ তিন অংশের

বা দলের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার দুর্দ্দশার সীমা নাই। ব্যাপারটা শুনুন।

উচ্চকুলে জন্ম, দেবতার পূজায় লাগি,—কাজেই মধ্যের দলটি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম আমার সঙ্গে তুলনা কার? শৈশবের কচি রঙ কচি বয়স, নব বসন্তের মধুর বাতাস—প্রাণ উল্লাসে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। কুক্ষণেই স্খলিত বা স্খলিতপ্রায় পাণ্ডু-পত্রদিগকে উপহাস করিয়াছিলাম! একটা ঘুর্ণিবায়ুতে কতকগুলি ধূলি বালির সহিত মিশিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে তাহারা আমাকে অভিশাপ দিয়া গেল। তখন তাহা গ্রাহ্য করি নাই, ক্রমে দেখি তাহা ফলিল।

একদিন একজন আমাকে তুলিতে আসিল। শিহরিয়া উঠিলাম, হায়! পরের পূজা পরাধীনতা”! মধ্যের পাতাটি নম্র হইয়া আসিল। সাম্য ও মৈত্রী বলিল “দোষ কি? সবাই সমান, সবাই পূজার পাত্র”। যে আসিয়াছিল সে ছাড়িল না। তুলিয়া লইল। স্বাধীনতা আশ্বাস মানিল যে স্বেচ্ছায় পরের পূজা করায় পরাধীনতা নাই, অনিচ্ছায় পরসেবাতেই পরাধীনতা।

পূজার আয়োজন হইল। পূজা সরস্বতীর। আমাকে তুলিয়াছিল স্কুলের ছেলেরা। বেলের পাতার ডালায় চোখ মেলিয়া দেখি সাম্য ও মৈত্রী মলিন মুখ। স্বাধীনতা অভিমানে গর গর করিতেছে। সাম্য ও মৈত্রী সমস্বরে বলিল, “এ’ত সরস্বতীর পূজা নয়, দুষ্টা সরস্বতীর পূজা। কেননা যাহারা পূজা করিতেছে তাহারা বাহিরে জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ লইয়া বিষম তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে, মারামারি বুঝি একটা হয়।

ব্রাহ্মণ কায়স্থেতর জাতিরা মণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারিবে না, আর, একটি মুসলমান মণ্ডপের কাছে আসিয়াছিল বলিয়া গলাধাক্কা খাইয়াছে।" স্বাধীনতা বলিল "এ পূজায় আমি থাকিব না"! সাম্য ও মৈত্রী বলিল "এখন ছাড়ে কে"? হঠাৎ দেখি ডালা উল্টাইয়া মেজেতে পড়িয়া গিয়াছি। ভাবিলাম ভালই হইল। তখনই একটি বালক শশব্যস্তে আসিয়া আমাকে ডালায় তুলিয়া দিল। বিরক্ত হইলাম। কিন্তু ঠাণ্ডা হইলাম বালকটির ঐ স্পর্শে। সে স্পর্শে কত যত্ন কত আগ্রহ।

পূজা চলিতেছিল। ফুলগুলি আমার মনের কথা জানিয়া থাকিবে। তাহারা বলিল "এখানে আর স্বাধীনতার বড়াই খাটে না, সাম্য মৈত্রীর বড়াই খাটে না। পরাধীনতা যখন স্বীকার করিয়াছ তাহার শেষ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হও"। পুরোহিত কি যেন মন্ত্র পড়িয়া বড় বড় গাঁদা ফুল গুলিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেবীর পায়ে দিতে লাগিল। ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ধূপ ধূনা জ্বলিতে লাগিল। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল এ'ত পূজা নয়, এ আমাদের বলি। ইতিমধ্যে কে যেন আমার গায়ে চন্দন মাখাইয়া দিল। চন্দনের মাধুর্য্য বিশেষ কিছু বোধ করিতে পারিলাম না,—একটা শীতল কম্পন শিরায় উপশিরায় বহিয়া গেল। যখন কয়েকটি বালক আমাকে ছিন্ন ভিন্ন ফুলের দলের সহিত অঞ্জলির মধ্যে পূরিল তখন আমি অবসন্ন, দুঃখ বেদনা তখন আর নাই। তাহারা মন্ত্র পড়িয়া আমাকে প্রতিমার দিকে নিক্ষেপ করিল। আমি কাঠামের একটি বাঁশের গায়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। কোথায় বা দেবী, কোথায় বা পূজা। বুঝিতেও

পারিলাম না। দুই দিন পর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে দেখিতে পাইলাম কয়েকটি ফুলের দল, একটু ভস্ম, একটু কাদা, একটু ধূনা, এই সবের মাঝে পড়িয়া আছি। সে সাম্যও নাই, সে মৈত্রীও নাই, সে স্বাধীনতাও নাই; সে পুরোহিতও নাই, সে প্রতিমাও নাই, সে বালক দলও নাই। অনতি দূরে শব্দ শুনিতে পাইলাম সপ্ সপ্ সপ্; চকিতে একটি সন্মার্জ্জনী শলাকায় তাড়িত হইয়া একটি স্তূপে অধিষ্ঠিত হইলাম। সেখানেও নিস্তার নাই একটি ঝাড়িতে বাহিত হইয়া নদীতীরে নীত হইলাম। আমার সহযাত্রীরা নদী জলে নিক্ষিপ্ত হইল, যে নিক্ষেপ করিতেছিল তাহার অসাবধানতায় আমি সে পরিণাম হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম—নদীতীরেই পড়িয়া রহিলাম। এমন সময় একটি গরু আসিয়া সুদীর্ঘ রসনা বেষ্টনে আমাকে তদীয় উদরাভ্যন্তরে প্রেরণ করিল। দুই দিন পর আবার দেখি আমি এক গৃহস্থের গৃহ পার্শ্বে গোময়ের মধ্যে অবসুপ্ত থাকিয়া নূতন প্রভাত কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছি। শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটি স্থল-পথের ছিন্ন শাখাগ্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। শাখাগুলিরও কচি কচি পাতা গজাইয়াছে।

এইরূপ নানা দুর্দ্দশার পর নূতন চেহারা লইয়া আজ আপনার কথাই মনে পড়িল। আপনি সবুজপত্রের রক্ষক; দেখিতেছেন আপনি বর্ত্তমান থাকিতেই আমার কি দুর্দ্দশা। তবে আর আমরা কাহার অহঙ্কার করিব, কাহার ভরসা করিব! আমরা ত সবুজ থাকিতেই চাই। পোড়া সংসার বাদ সাধে। সংসার বলে দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া চলিতে হয়। যদি না চলিতে চাই, সে জোর করিয়া চালাইয়া লয়। বয়সের অহঙ্কার, রঙের অহঙ্কার, তেজের

অহঙ্কার, রসের অহঙ্কার, কোন অহঙ্কারই কিছুতে রক্ষা করিতে পারি না।

আপনি যে পত্রের নিশান উড়াইয়া থাকেন, তাহা উচ্চ বৃক্ষশীর্ষ বাসী, কিন্তু তাহার অবস্থাও নিরাপদ নহে। সংসার তাহা দিয়া আরামে বাতাস খাইবার জন্য পাখা তৈয়ারী করে, অথবা তাহাতে পুঁথি লেখে, কিন্তু এ দুই অবস্থায়েই তাহার সজীব বর্ণ সে রক্ষা করিতে পারে না।

যদি ইহার একটা প্রতিকারের পথ না করিতে পারিলেন, তবে মিছাই আপনি সবুজ গৌরব করেন। আশা করি, আমি যে অব-অবস্থাতেই থাকি, আপনি বেশ খোস মেজাজে ও বাহাল তবিয়তে আছেন। নিবেদন ইতি—

৺বিল্বপত্র বা বেলের পাতা,

হাল সাকিম—শ্রীঅরবিন্দ সেনের আঁস্তাকুড়,

ঠাকুরগাঁও।

৪ঠা চৈত্র, ১৩২৬।

শাস্ত্র ও স্বাধীনতা।

——:০:——

শাস্ত্র জিনিষটা হচ্ছে মানবজীবনের ব্যাকরণ। আর ব্যাকরণ জিনিষটা আর যাই হোক সেটা যে কোন রকমের axiom নয় এটা সেকালের গ্রীসের পিথাগোরাস্ থেকে আরম্ভ করে' একালের মাদ্রাজের রামানুজ পর্য্যন্ত সবাই সাক্ষী দেবেন। কিন্তু ওই যে বলেছি শাস্ত্র জিনিষটা ব্যাকরণ আমার বোধ হয় ঐ কারণেই টুলো-পণ্ডিতদের কাছে ওর একটার আদর যতখানি আর একটার আদরও ততখানি, অর্থাৎ—তাঁদের কাছে যেমন সংস্কৃত-কাব্যের আগে সংস্কৃত ব্যাকরণ, তেমনি মানুষের জীবনের আগে মনুর শাস্ত্র। তাঁরা যেমন সূত্র শিখে কাব্য পড়েন তেমনি শাস্ত্র শিখে জীবন গড়েন, অর্থাৎ—গড়তে চান। কিন্তু তা ত চলে না—তাই জগতের পনের আনা তিন পাই লোকের পথ ঠিক তাঁদের পথের উল্টো।

ব্যাকরণের আধিপত্য কোথায়? ব্যাকরণ না হ'লে এক পা অগ্রসর হবার উপায় নেই কোথায়? এ আধিপত্য কেবল মৃত ভাষা সম্বন্ধে—ইংরেজিতে যাকে বলে dead language, অর্থাৎ—যে-ভাষা কারোও মুখে নেই কিন্তু বইয়ের পাতায় আছে। যে-ভাষা কারো মুখে নেই অথচ একদিন ছিল, সে-ভাষা বুঝতে হ'লে ব্যাকরণ ছাড়া উপায় নেই। তেমনি শাস্ত্রের আধিপত্য কোথায়?—সেইখানে, যেখানে সমাজ মৃত। যে-সমাজ একটুকুও চলে না অথচ একদিন

চলত—সেই চলা যে কেমন চলা তা জানতে হ'লে শাস্ত্র ছাড়া উপায় নেই। যে-সমাজ আজ চলবার শক্তি হারিয়েছে তাকে চলতে হ'লে প্রতি পদে পিছন থেকে শাস্ত্রের শ্লোকের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলতে হয়। যখন নিজের চলবার উপায় নেই অথচ চলতেই হবে তখন আর কারো বা আর কিছুর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলি তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু আপত্তি করি তখন যখন শুনি যে ঐ যে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলা ঐ-ই হচ্ছে পরম সুন্দর চলা—কেবল পরম সুন্দরই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তা পরম মঙ্গল।

কিন্তু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল যদি পরস্পর বিরোধী কথা না হয় তবে ঐ চলা সুন্দরও নয় মঙ্গলও নয়, কেননা ঐ ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলা মানুষের সত্য নয়, কারণ মানুষের মধ্যে যে পরম দেবতা আছেন তিনি দাসও নন, জড়ও নন।

সুতরাং ঐ ধাক্কা খেয়ে চলার বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ হচ্ছে এই যে—মানুষ নামক জীবটির মন বলে একটি পদার্থ আছে এবং এই মন জিনিসটির দুটি অভ্যাস আছে—সে হচ্ছে চিন্তা করা ও ইচ্ছা করা।

এই জন্যেই দেখতে পাই মানুষ নিয়তই নতুন পথে চলেছে—গাড়ান সহজ রাস্তা ছেড়ে যেদিকে রাস্তা নেই, হয় ত কেবল বন কেবল কাঁটা কেবল অন্ধকার, সেই দিকে ছুটে চলেছে। তাতে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়েছে, অনেক মন দুঃখ পেয়েছে; কিন্তু মানুষের জীবনে ঐ ত সবার চাইতে ভগবানের বড় আশীর্ব্বাদ যে মৃত্যুর ভয় তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, দুঃখের বেদনা তাকে দুর্ব্বল করে' ফেলতে পারে নি—তা যদি পারত তবে যে তাঁর লীলা দু'দিনে মিথ্যা

হ'য়ে উঠত, অর্থহীন হয়ে উঠত, বোঝার মত হয়ে উঠত। এই যে মানুষ নিত্য নব নব পথে চলেছে তাইতেই বিশ্বমানব সম্পদশালী হয়েছে। আর এই যে মানুষ নব নব পথে চলতে পেরেছে তার কারণ তার মন নামক পদার্থটি স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই মনের চিন্তা করা censured হয় নি।

যেখানে এই মনের চিন্তা করা ও ইচ্ছা করা censured হয়েছে এবং মানুষ সেই censure-কে একান্ত করে মেনে নিয়েছে, সেখানেই বুঝতে হবে যে মানুষের মধ্যে পরবশ্যতাটাই বড় হ'য়ে উঠেছে, সত্য হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু পরবশ্যতাই ত মানুষের চিরন্তন নয়, তার গভীরতম সত্য নয়, তাই দেখতে পাই যেখানে শাস্ত্র আপনার অধিকার ছাড়িয়ে মানুষের শৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে, সূত্রকারের দর্ভ-আসনখানি ত্যাগ করে' প্রভুত্বের উচ্চ সিংহাসনে শস্ত্রধারী হয়ে বসেছে, সেখানে একদিন মানুষের অন্তরে অন্তরে রুদ্রের বিষাণ বেজে উঠেছে, ডমরুনিনাদ জেগে উঠেছে। মানুষ সেদিন আকুল কণ্ঠে বলেছে, আমার জানবার উপায় নেই গো, উপায় নেই। ঐ যে নিষেধের লম্বা তালিকা ঐ তালিকার তলে আমার বিচার বিবেচনাকে তলিয়ে দিতে পারব না গো পারব না। ঐ যে বিধির সংকীর্ণ লিষ্ট, ঐ লিষ্টের মাঝে আমার শক্তি গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকবে না—থাকবে না—থাকবে না। মানুষ চিরদিন বলেছে—শৃঙ্খলা আমি চাই-ই, কিন্তু শৃঙ্খল আমি চাই নে কিছুতেই।

এই যে মানুষের মনের স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা একমাত্র মানুষেরই অধিকার, এই স্বাধীনতা অস্বীকার করবে কারা?—তারাই, যারা মর্ম্মে মর্ম্মে দাস, যারা মনে প্রাণে শূদ্র, স্বাধীনতা যাদের আন-

ন্দের সামগ্রী নয়, মঙ্গলের পথ নয়, স্বাধীনতা যাদের ভয়ের বস্তু। ঐ স্বাধীনতার পথ তার যার নিজের দায়িত্ব নিজে বয়ে চলতে হয়, নিজের দেবতাকে জাগ্রত ক'রে তুলতে হয়, নিজের মন-বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে চায়। তাই ঐ স্বাধীনতার পথ শূদ্রের অসত্যের পথ; সুতরাং অমঙ্গলের পথ ধ্বংসের পথ, তার ভয়ের বস্তু—কারণ আত্মবশ্যতা যে শূদ্রের অধর্ম্ম।

এই যে দেশের চারিদিকে আজ এই মনের স্বাধীনতা প্রাণের মুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে, সে ওই দেশের মূঢ়বদ্ধ শূদ্রান্ত-রাত্মার স্বাধীনতা-ভীতি থেকে উদ্ভূত করুণ আর্ত্তনাদ। কিন্তু মানুষের আত্মপ্রতারণার ত আর অন্ত নেই। তাই ঐ শূদ্র-সমষ্টির আর্ত্তনাদকে জড়িয়ে কতগুলো বড় বড় কথা আজ জেগে উঠল—কোনোখানে সনাতন ধর্ম্ম, কোনোখানে জাতীয় বৈশিষ্ট্য, কোনোখানে বাঙলার প্রাণ, কোনোখানে পেট্রিয়টিজ্‌ম্ বা অমনি আর কিছু। কিন্তু আসলে ভিতরের কথাটা হচ্ছে সবখানেই ঐ শূদ্র-অন্তরাত্মার স্বাধীনতা-ভীতি।

শূদ্র-অন্তরের এই স্বাধীনতা-ভীতিই আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সত্য হয়ে উঠুক, দেশের বাল-বৃদ্ধ-যুবা বরণ করে নিক—এই দাস-জনোচিত প্রার্থনা আজ আমরা করতে পারব না—বলাই বাহুল্য। মানুষের সকল অমঙ্গলের মূল যে তার স্বাধীনতা, এই এত বড় একটা প্রত্যক্ষ অসত্য স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এসে বললেও আজ আমরা মানতে পারব না। আমরা আজ শূদ্র গড়তে বসি নি। তাই আজ আমরা স্বাধীনতার বাণীই মানুষকে শোনাতে চাই। যে-স্বাধীনতার মাঝে শৃঙ্খলাই মানুষের আসল সত্য, যে-স্বাধীনতার মাঝে সংযমই মানুষের আসল অমৃত। আমরা আজ চাই প্রত্যেক মানুষটি তার আপনার

ভার নিক। কারণ দেখতে পাচ্ছি আমাদের সমাজ আমাদের প্রত্যে-কের ভার নিয়েছে বলে' আমরা কেউ সমাজের ভার নিতে পারি নি। কেননা সমাজ কিছুই করতে পারে না যদি না সেই সমাজের লোকেদের কিছু করবার শক্তি থাকে। সমাজ এমন একটা ভেল্কি নয় যেখানে দুটো বোকারাম মিলে একটি বুদ্ধিমান হয় বা তিনটে "বিদ্যা দিগ্‌গজ" মিশিয়ে একজন এডিসন হয়। প্রত্যেক মানুষটাকে খাটো করলে অসত্য করে' তুললে সমাজকে একদিন না একদিন তার দাম কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবেই হবে।

(২)

এই যে আজ মানুষের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দেশের চারিদিক থেকে শূদ্রাস্তরাত্মার নানা তান জেগে উঠল—কোনোখানে বা দীপক কোনো-খানে বা ভৈরবী কোনোখানে বা মিশ্রকানাড়া কোনোখানে বা লক্ষ্ণৌ ঠুংরী, এই সমস্ত এলোমেলো আর্ত্তনাদের ভিতর থেকে আজ যে-কথাটা আমরা-কথঞ্চিৎ স্পষ্ট করে' শুনতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাঙালীর জাতী-য়তা। আমরা আজ শুনতে পাচ্ছি যে বাঙলার মাটীর নাকি এমনি একটা গুণ আছে যে এখানে জন্মগ্রহণ করলে হয় শ্রীরাধা নয় চন্দ্রাবলী নেহাৎ পক্ষে নয় ত জটিলা কুটিলার কেউ একজন হতে হবেই হবে। বাঙালীর জাতীয়তার সূক্ষ্মদেহ যে দিব্য দৃষ্টিতে দেশের একদল লোকও দেখতে পেয়েছেন এতে বাঙালীর গৌরব নিশ্চয়ই—কিন্তু এ-দেখা যে আর কেউ মানছেন না, এমন কি যাঁরা মানছেন তাঁদের পর্য্যন্ত আচারে ব্যবহারে কথায় বার্ত্তায় চিন্তায় কর্ম্মে সেই সত্যই যে প্রকাশ হ'য়ে পড়ছে না সেটা নিশ্চয়ই একটা বিষাদ ব্যাথার অপেক্ষা রাখে।

আমাদের আশা আছে মহাপ্রলয়ের আগেই এ বিশদ ব্যাখ্যা একদিন না একদিন আমরা শুনতে পাব।

ইতিমধ্যে সপ্রতিভ ভাবেই এই কথাটা আজ আমরা স্বীকার করব যে একটা জাতির জাতীয়তাটা যে তার ঠিক কোন্‌খানটায়, তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবার সাহস আমাদের নেই। কেননা চোখে আমাদের দিব্যদৃষ্টি থাকলেও কপালে আমাদের দিব্যদৃষ্টির দাবী করতে পারি নে। অপর পক্ষে আমরা জ্যামিতি শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত নই; সুতরাং আমাদের জাতীয়তাটা ঠিক রম্বস্, না রম্বোইড, না বিন্দু, অর্থাৎ—which has position but no magnitude—তা সঠিক বাৎলিয়ে দিতেও আমরা অক্ষম। কিন্তু এইটুকু বলবার সাহস আমাদের আছে যে, সমাজ যখনই কোনোখানে মাটী গেড়ে বসেছে তখনই মানুষ মিথ্যা হ'য়ে উঠেছে, কেননা মানুষের ধর্ম্ম বসে থাকবার ধর্ম্ম নয়, তা হচ্ছে সৃষ্টি করবার ধর্ম্ম, নব নব পথে নব নব জীবনের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে।

তাই আজ আমরা বিনা দ্বিধায় এই কথাটা মনে করব যে যে-সত্যটা শাস্ত্রের কড়া শাসনে বজায় রাখতে হয় সেটা মোটেই সত্য নয়। কিন্তু আসল সত্য ঘটনা এই যে, শাস্ত্রের শাসনে কিছুই বজায় থাকে না—মনুসংহিতার পাতার সঙ্গে আজকার সমাজের দু' এক অধ্যায় মিলিয়ে দেখলেই তা ধরা পড়ে।

সুতরাং আজ আমরা জোর করেই বলব যে মানুষের মুক্তির দিকই বড় দিক, সেইটেই তার সত্যের দিক। মানুষের এই বড় দিকটায়, সত্যের দিকটায় এ পর্য্যন্ত কেউ এমন কোনো বাধা স্থাপন করতে পারে নি যাতে করে' মানুষের জীবন-স্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

যখনই যেখানে এই জীবনস্রোত রুদ্ধ হবার জোগাড় হয়েছে তখনই সেখানে সমাজ-বুক থেকেই এক ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ উদ্দাম উচ্ছল গতির বেগ ভীম গর্জ্জনে প্রলয় নিঃস্বনে সে জীবন-স্রোতের রুদ্ধ মোহনা উদ্‌ঘাটিত করে' দিয়েছে। তখন ভয়াতুরের ভীতি-কাতরকণ্ঠে করুণ আর্ত্তনাদ জেগে উঠেছে, আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে তখন তাঁরা ইষ্টদেবতার নাম জপতে বসে গেছেন ; কিন্তু সেই গতির মাঝে, মুক্তির মাঝে জেগেছে নবীন প্রাণের তরুণ আনন্দ, তাদের উৎসাহ-ধারা, তাদের উৎসব-কাকলি এই তরুণ আনন্দ আবার চলেছে নব নব পথে নব নব আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে। আর এতেই বেড়েছে মানুষের গৌরব, সমাজের সম্পদ, বিশ্বমানবের নব নব কীর্ত্তি। এই হচ্ছে বিশ্বমানবের সনাতন ইতিহাস, সনাতন ধর্ম্ম।

বিশ্বমানবের এই সনাতন ইতিহাস সনাতন ধর্ম্ম অস্বীকার করে' কোনো সমাজ বা জাতিকে মন-গড়া জাতীয়তার প্লাস্‌তারা দিয়ে শক্ত করে' তুললে যে কি দুর্ঘটনা ঘটে তার সম্বন্ধে একটা গল্প আমার এক রসিক বন্ধু আমাদের শোনালেন। গল্পটা যে সত্যি তা ডাক্তার স্পুনারের মত প্রচণ্ড প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে পর্য্যন্ত মানা কঠিন। কিন্তু মিথ্যা গল্পের মধ্যেও যে অনেক সময় সত্য সিদ্ধান্ত সব থাকে তা, কি স্বদেশের বিষ্ণুশর্ম্মা, কি বিদেশের La Fontaine—দু'জনাই প্রমান করেছেন। সুতরাং গল্পটা বলছি।

(৩)

বন্ধুবর ফরাসের উপরে জোড়াসন হয়ে বসে কথকঠাকুরের মত হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলেন—"ওই যে তোমরা শোন

গ্রীন্‌ল্যাণ্ড, গ্রীন্‌ল্যাণ্ড—যেখানে সূর্য্যদেব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কচিৎ কদাচিৎ উঠে নিদ্রাতুর চোখে বরফের আয়নায় মুখ দেখেন, যেখানে দু'মাইলের মধ্যে তিন জন মানুষ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, যেখানে চারিদিকে কেবল বরফ, আর বরফ, আর বরফ, চারিদিকে কেবল সাদা আর সাদা আর সাদা, সেই যে গ্রীন্‌ল্যাণ্ড তা চিরকাল এমন ছিল না। ন' লক্ষ একানব্বুই হাজার বছর পূর্ব্বে ঐ দেশটা ছিল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ—এই ঠিক বাঙলা দেশেরই মত। তখন ও-দেশ ছিল শস্যশ্যামলা, "নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী," "শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্‌, ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্‌"—চারিদিকে গাছ পাতা লতা-গুল্ম ফুল ফল—কেবল সবুজ আর সবুজ আর সবুজ। তোমরা হয়ত বিশ্বাস করছ না, কিন্তু প্রমাণ শোন। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে দেশের সব পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল কিন্তু দেশের নামটার গায়ে সে-যুগের ছাপ রয়েই গেল, ঐ কারণেই ও-দেশের নাম গ্রীনল্যাণ্ড।

সে যাই হোক, সেই ন' লক্ষ একানব্বুই হাজার বছর পূর্ব্বে সেই গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে এমন এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যে সে-সভ্যতা অর্ব্বাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা বা অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার চাইতে কোন অংশে হীন নয়। তোমরা দক্ষিণ আমেরিকার চিলি সভ্যতা বা Peruvian civilisation-এর কথা শোন, উত্তর আমেরিকার গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে তেমনি এক সভ্যতা ছিল ন' লক্ষ একানব্বুই হাজার বছর আগে। গ্রীনল্যাণ্ডের সে-সভ্যতা যে কত উঁচুতে উঠেছিল সে সম্বন্ধে এইটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে তারা তিন শ' তেষট্টি রকমের মানুষ-মারা কল আবিষ্কার করেছিল।

এইখানে আর একটা মজার কথা শুনে তোমরা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হবে ও গৌরব বোধ করবে যে, সেই তখনকার গ্রীনল্যাণ্ডবাসীরা সবাই পোষাক পরত ঠিক আজকার বাঙালীর মত। মিহি তাঁতের ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী, সূক্ষ্ম উড়ানি, বার্ণিশ করা লপেটা—একেবারে ফুল-বাবু। কিন্তু তারা ছিল যেমনি বলিষ্ঠ তেমনি সুন্দর—কি দেহে কি মনে। দেশে ঐশ্বর্য্য সম্পদ রাখবার আর স্থান নেই, চারিদিকে নগর নগরী জনপদ, সমুদ্রোপকূলে বিশাল বিশাল বন্দর, কত হর্ম্ম্য কত মন্দির কত স্মৃতি-সৌধ, কত প্রমোদ উদ্যান কত দীর্ঘিকা। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছিল শুধু একটা জিনিস—জীবনের আনন্দ। জীবনের আনন্দ যেন শত ধারে সহস্র ধারে লক্ষ ধারে দুর্ব্বার হ'য়ে বিচ্ছুরিত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়ছিল—কোথাও ভয় নেই, কোথাও সীমা নেই, কোথাও দ্বিধা নেই—চারি-দিকে কেবল সাহস আর সাহস আর সাহস। এই সাহসকে আশ্রয় করে' গ্রীনল্যাণ্ডে যে সভ্যতা গড়ে উঠল সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—সেই ন' লক্ষ একনব্বই হাজার বছর পূর্ব্বে।

এমনি করে গ্রীনল্যাণ্ডের সেই সভ্যতা যে কত হাজার বৎসর চলে' এল তার ঠিক নেই। এমন সময় ঘটল এক পরিবর্ত্তন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ঠিক ছ' লক্ষ সাড়ে সাইত্রিশ অব্দে হঠাৎ দেশের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ধীরে ধীরে শৈত্য অনুভূত হ'তে লাগল। নির্ম্মল সূর্য্য ক্রমে মলিন হ'তে লাগল। গাছপালা ক্রমে কঙ্কাল বের করতে লাগল। দেশের লোকে দেখলে মিহি সূতোর ধুতি চাদর পাঞ্জাবীতে আর চলে না। রেশম পশমের আমদানী হ'ল। তাঁতিদের তাঁতে মোটা মোটা গরম কাপড় বুনোনো হ'তে

লাগল। কিন্তু পশমের মোটা কাপড় ত আর ধূতির মত করে' পরা চলে না। সুতরাং কাটা কাপড় গ্রীন্‌ল্যাণ্ডবাসীরা পরতে সুরু করলে—সেই শীত থেকে বাঁচবার জন্যে।

এই রকম ত অবস্থা এমন সময় দেশের সাতখানি সংবাদপত্র সমস্বরে চীৎকার করে' উঠল—গেল গেল গেল! কি গেল?—গেল গ্রীনল্যাণ্ডবাসীর এতদিনকার জাতীয়তা। সাতাত্তর হাজার বছর ধরে তিরাশি হাজার পুরুষ যে মিহি ধূতি চাদর পাঞ্জাবী লপেটা ব্যবহার করে' এসেছে, তাই যদি গেল তবে আর গ্রীনল্যাণ্ডবাসীর জাতীয়তার রইল কি? চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। সংবাদপত্রের পাতায় কলম ছুটতে লাগল, বড় বড় সভাগৃহে বক্তাদের কড়া গলা ফুটতে লাগল! কি সে কলমের জোর! কি সে গলার তোড়! অতিরিক্ত উৎসাহী যারা তারা বলতে লাগল ঐ যে অধ্যাপক লুৎস্কিমো আবিষ্কার করলেন যে, মানুষ বাঁচতে চাইলে তার খাওয়া দরকার, সে ত তিনি ধূতি চাদর পরতেন বলে'। ঐ যে নৌ-সেনাপতি ফারুৎমিরি অসাধারণ শৌর্য্যে Iceland-এর বিরাট নৌ-বাহিনীর জন্মের মত মাথা নীচু করিয়ে দিলেন সে ত ঐ ধূতি চাদরের জোরে। পণ্ডিতেরা সব বড় বড় মোটা নিত্য-কর্ম্ম-কুঞ্চিকা সনাতন-ধর্ম্ম-পঞ্জিকা ইত্যাদি খুলে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন যে সেখানে পশমী কাপড়ের কোনো উল্লেখ মাত্র নেই। দেশের লোক সকল শুনে ত একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। দিকে দিকে সভাসমিতি স্থাপিত হ'তে লাগল। যেমন করে' হোক গ্রীনল্যাণ্ডবাসীর জাতীয়তা বজায় রাখতেই হবে—যেমন করে' হোক। কড়া আইন তৈরী হ'ল—শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। আইন হ'ল যে তাঁতী পশমী

কাপড় বুনবে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আর যে তা পরবে তার প্রাণদণ্ড। রাজা শীতে হি হি করে' কাঁপতে কাঁপতে আইনে সহি দিলেন, পুলিশ হি হি করে' কাঁপতে কাঁপতে ব্যাটন উঁচিয়ে তাঁতী-দের বাড়ী বাড়ী সন্ধান নিতে লাগল, আর দেশের তিন পোয়া লোক হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মরে' গেল। এক পোয়া লোক তাদের রক্তের তেজে কোন রকমে বেঁচে রইল। শীত ক্রমে বেড়েই চলল। কি রকম প্রকৃতির নিয়ম, দেখা গেল এই এক পোয়া লোকের সর্বাঙ্গে বড় বড় লোম গজাচ্ছে। ক' হাজার বছর কেটে গেছে। একদিন দেখা গেল যে গ্রীনল্যাণ্ডবাসী সবাই বড় বড় রোঁয়াওয়ালা শিম্পাঞ্জি হ'য়ে উঠেছে। তারপর যখন একবার ভীষণ বরফ পড়তে সুরু করল তখন তারা সব ঠায় দাঁড়িয়ে মরল। গ্রীনল্যাণ্ডের সেই প্রাচীন সভ্যতার ও গ্রীনল্যাণ্ড বাসীর সেই প্রাচীনতর জাতীয়তার এইখানেই যবনিকা পতন।"

বন্ধুবর কথা শেষ করে' তাঁর পকেট থেকে সাজসরঞ্জাম বের করে' এমনি ভাবে একটি সিগারেট পাকাতে লেগে গেলেন যেন তিনি এতক্ষণ ধরে' যা বল্লেন সে-সব তাঁর নিজের চোখে দেখা ঘটনা।

বন্ধুবরের ঐ গল্পটা ডাহা মিথ্যে হোক, কিন্তু ওর পিছনে একটা সত্য আছে। সেটা হচ্ছে এই যে যখনই একটা সমাজের অচলতাকে সত্য ও বড় করে' তুলি তখন সেই সমাজের মানুষদের দ্বারা ডারউইন সাহেবের থিওরির উল্টো দিক্‌টা হাতে কলমে প্রমাণ হবার সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে যায়।

(৪)

আমরা মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির দিকটা, তার স্বাধীনতার দিকটা যতদূর সম্ভব প্রশস্ত করে' দিতে চাই—সমাজ-সঙ্ঘকে অসম্ভব করে' না তুলে। কেননা সঙ্ঘেই যে শক্তি, তা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু কোন্ সঙ্ঘ শক্তিমান?—সেই সঙ্ঘ যে সঙ্ঘের প্রত্যেক অংশটি সামর্থ্যবান। অর্থাৎ—সমাজের যে শক্তি তা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উচ্ছেদে নয়, তা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে ও তাদেরই মিলনে, অর্থাৎ—প্রত্যেক ব্যষ্টির annihilation-এ নয়, সমস্ত ব্যষ্টির co-operation-এ।

এই কথাটাই আমরা ভুলে যাই যে মাতৃভূমির মূর্ত্তি গড়িয়ে পুজোই করি আর যাই করি যেমন দেশের লোকের শক্তি ছাড়া আর কোথায়ও শক্তি নেই, তেমনি সমাজের গায়ে যত তেল সিঁদুরই লেপি না কেন সেই সমাজের সভ্যদের অন্তরে ব্যতীত আর কোনোখানে দেবতা নেই। সেই দেবতাদের শক্তিই শক্তি এবং সেই শক্তির মিলনই আসল শক্তি-ভাণ্ডার। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সমাজের এই দেবতা জাগ্রত হবে না যদি না তার মুক্তির দিক থাকে। সুতরাং এই মুক্তির দিকটাকেই আজ মুক্ত করতে হবে।

এতে সমাজপতিদের ভয় করবার কিছু নেই। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিকটা যত প্রশস্তই হোক না কেন, তারা দলবদ্ধ হবেই, সমাজ তাদের মধ্যে গড়ে' উঠবেই, কেননা দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করবার ইচ্ছা মানুষের এমনি একটা সত্য যা শাস্ত্রের শ্লোকে শ্লোকে গড়ে' ওঠে নি। সুতরাং ব্যক্তিগত মুক্তির দিক প্রশস্ততর করার মানেই

যে সমাজ-বন্ধন শিথিল হওয়া তা নয়। জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও সমাজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই এ-সত্য ধরা পড়ে।

সকল প্রকার শাস্ত্রের মোহভার থেকে আমরা মানুষকে মুক্ত করতে চাই, কেননা একাল পর্য্যন্ত কি কর্ম্ম-জগতে কি ধর্ম্ম-জগতে মানুষের যে সম্পদ জমেছে তা মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির দিক খোলা ছিল বলে'। হিসেব নিলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতি তাদের যা কিছু নিয়ে আজ গৌরব করছে তার অধিকাংশই লব্ধ হয়েছে দশজনের পরামর্শ সভা বসিয়ে নয়—কিন্তু এক এক জনের আনন্দের ভিতর দিয়ে, যে আনন্দ কোনো শাস্ত্রীয়-শ্লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। এই বাঙলা দেশেই আজ আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে তিনজনকে নিয়ে সবার চাইতে বেশি গৌরব করি—মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ—এই তিন জনাই তাঁদের কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত মনের মুক্তির দিক দিয়ে। তা যদি না হত তাঁরা যদি পদে পদে বাঙলা গদ্য পদ্যের শাস্ত্র মেনে চলতেন তবে আজ বাঙলা সাহিত্য তাঁদের বিচিত্র সৃষ্টি দিয়ে যে সম্পদশালী হয়ে চলত না তা নিশ্চয়। বাঙলা পদ্যের পয়ারের বেড়ী যদি রবীন্দ্রনাথের মনের কঠিন শৃঙ্খল হ'য়ে থাকত তবে বাঙলা সাহিত্যে তাঁর দান আজ কি দাঁড়াত কে জানে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর মনের মুক্তির দিকটা তাঁর পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল।

এইখানে কেউ বা বলে উঠতে পারেন যে সবাই ত আর রবীন্দ্রনাথ নয়। রবীন্দ্রনাথ তার মুক্তির ভিতর দিয়ে যে সম্পদ ব'য়ে এনেছেন অন্য কেউ এই মুক্তিকে আশ্রয় করলে হয়ত কেলেঙ্কারি করে বসবে।

কিন্তু তাতে সমাজের ভয় করবার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা ঐ কেলেঙ্কারি যে করবে সে নিজেই ঠকবে, ঠেকে শিখবে।

কিন্তু সবাই রবীন্দ্রনাথ নন। এর একটা অন্য দিকও দেখবার আছে। সমাজের সবাই যদি রবীন্দ্রনাথ হতেন তবে এতে করে' মুক্তির পতাকা সমাজের বুকে তুলে রাখবার কোনই দরকার হত না। কেননা রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিদের অন্তরে এমন একটা দীপ্ত সত্য থাকে যা সকল বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আপনাকে সার্থক করে তোলে। এঁদের কানের কাছে মুক্তি মুক্তি বলে' জপ করবার কোনই দরকার নেই, এঁরা নিজেরাই নিজের পথ করে' নেন।

আগেই বলেছি, সবাই রবীন্দ্রনাথ নয়। প্রত্যেক সমাজে তিন রকমের লোক আছেন। এক রবীন্দ্রনাথের মত যাঁরা অসাধারণ, যাঁদের সাক্ষাৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ মেলে। আর এক রকম অতি সাধারণ, যাঁরা হাজার বক্তৃতা হাজার উৎসাহ হাজার উদ্দীপনার মাঝেও বাঁধা পথে পাকা হয়েই থাকবেন। শালগ্রামের মত এঁদের শোয়া বসা সমান। তমের টানই এঁদের মধ্যে প্রবল। আর এই অসাধারণ ও অতিসাধারণের মাঝে আর এক রকমের লোকআছেন যাঁরা এমনি একটা আলগা সাম্য অবস্থায় এমনি একটা equllibrium অবস্থায় আছেন যে এঁদের একটু ঠেলে দিলে উপরে উঠতে পারেন আবার একটু টিপে দিলে নীচে নেমে পড়বেন। এঁরা একটা কিছু হলেও হতে পারেন, একটা কিছু করলেও করতে পারেন—যদি থাকে তাঁদের পিছনে সমস্ত সমাজের অনুমতি সমস্ত সমাজের উৎসাহ ও উদ্যম। এঁদের জন্যেই চাই সকল অতীতের শাসন-ভীতি থেকে, শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল থেকে সমাজের মাঝে মুক্তির বাতাস, কেননা

অসাধারণরা যদি সমাজের মাথা হন তবে এঁরাই হচ্ছেন তার মেরুদণ্ড। মাথা যে সম্ভারই ব'য়ে আনুক মেরুদণ্ডের যদি তা গ্রহণ করবার ও বহন করবার শক্তি ও প্রবৃত্তি না থাকে তবে সে অসাধারণের দানের মূল্য সমাজের কাছে হ'য়ে থাকবে কেবল শূন্য।

তাই আজ আমাদের স্পষ্ট করে' বলতেই হবে যে—চাই মুক্তি। মুক্তি—সকল প্রকার বন্ধন থেকে, অর্থাৎ—সকল প্রকার মিথ্যা থেকে। কেননা মিথ্যাই বন্ধন। চাই মুক্তি সেই শাস্ত্র থেকে যে শাস্ত্রে আমাদের মনের ছাপ নেই, প্রাণের ছাপ নেই, বুদ্ধির ছাপ নেই, আমাদের কালের ছাপ নেই। আমরা আমাদের একালের জীবনকে মুক্ত করতে চাই সেকালের শাস্ত্র থেকে। কেননা জীবন হচ্ছে কাব্য আর শাস্ত্র হচ্ছে ব্যাকরণ। কিন্তু আজ আমাদের মুখের বাঙলা ভাষার গায়ে সংস্কৃতের স্পর্শ থাকলেও যেমন তা সংস্কৃত নয়, তেমনি আমরা সে কালের লোকের বংশধর হলেও আমাদের মন ঠিক তাঁদের মন নয়। সুতরাং আমাদের মন তাঁদের শাস্ত্র দিয়ে একেবারে প্রতি পদে চালিত হতে পারে না। আমরা যেন আজ মনে করতে পারি যে আমরা গরুও নই গাধাও নই—আমরা মানুষ। এই নতুন কালের মাঝে নতুন অবস্থা নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নতুন প্রশ্ন নতুন সমস্যার সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়িয়ে জীবনকে মঙ্গলের পথে জয়ের পথে গৌরবের পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের স্বাধীনতার মধ্যেই আছে, অতীতের শাস্ত্রের মধ্যে নেই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ফাঁকা।

——ঃ*ঃ——

বাড়ীর উঠানে একটা মস্ত জামগাছ ছিল। জাম সে বছর বছর দিত না—তবু তার বয়স পঞ্চাশ বছর। জন্মে অবধি তাকে দেখছি। শুনেছি সে বাবার নিজের হাতে পোঁতা। আমার বেশ মনে আছে, পেরেক ফুটবে বলে বাবা তার গায়ে বাড়ীর নম্বর-আলা টিনের চাক্তি মারতে দেন নি।

কতজনে তার কত নিন্দা করতে লাগলো। কেউ এসে বললে "জামগাছের হাওয়া ভাল নয়", কেউ বললে "ঐ জন্যেই তোমাদের বাড়ীর অসুখ ছাড়ায় না", কেউ বললে "তা না হোক্ বাড়ীটাকে আওতা করে রেখেছে", কেউ বললে "রাত্রে মাথা-ঠুকে যাওয়া সম্ভব", কেউ বললে "জামের ডাল বড় পল্‌কা—ছেলেপিলে না পড়ে যায়", কেউ বললে "কাটলে অনেক তক্তা বেরোবে—বাড়ী মেরামত করছো, কাজে লাগবে।"

দশের কথায় কান ভারী হল—তবলদার ডেকে আনালুম। তারা এসেই কোপ জুড়ে দিলে। আমি আড়ালে বসে কাজ করতে লাগলুম কিন্তু কোপের আওয়াজ কেমন ভাল লাগলো না—উঠে তফাতে চলে গেলুম; কিন্তু কেন জানি না তখনি আবার উঠানে এসে দাঁড়াতে হল।

দেখি, গাছকে তখন নেড়া করে ফেলেছে। কোথায় গেছে তার

সেই সবুজ ছাতি যা সে এতদিন ধরে মাথায় দিয়ে ছিল। আমি বাড়ীর ভিতর গেলুম একটা পান খেয়ে আসতে।

এসে দেখি, তার গোড়ার বাঁধন ঢিল হয়ে এসেছে। কোপের মুখে সে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে; তবু প্রাণপণে মাটী কামড়ে আছে—তার অনেক দিনকার মাটী। চাকরকে "তামাক সাজ" বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

ফিরে এসে দেখি যে টলমল করে দুলচে—দুজনে দড়ি দিয়ে তাকে টানচে, আর একজন তখনো গোড়ায় কোপ মারচে। তবু সে পড়তে চায় না। তার দু'চারটা শির-বেরোনো আঙুল তখনো মাটীকে মুঠো করে ধরে রয়েছে, আর গোড়া দিয়ে হুহু করে লালচে রস বেরোচ্ছে—সে রস, না রক্ত!

আছে—এখনো আছে। এখনো যদি তার গোড়ায় মাটী চাপা দেওয়া যায়, হয়ত সে সামলে ওঠে। কিন্তু কেউ তা দিলে না। সে চিড় চিড় করে শব্দ করে উঠলো—আমি খুব জোরে গড়গড়ার নল টানলুম।

'মিড়—মিড়—মিড়—মড়—মড়—মড়—মড়—ধড়াম্'। সব শেষ। নীচের দিকে চেয়ে দেখি সে পড়ে রয়েছে, উপর দিকে চেয়ে দেখি খোলা আকাশ হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে।

সকলে এসে বললে—"বাঃ বাড়ীময় আলো—কেমন ফাঁকা দেখাচ্চে।"

আমি উত্তর দিলুম—"সবই ফাঁকা।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

প্রজাস্বত্বের কথা।

—:o:—

বীরবলজী,

আর একটু হলেই আপনাকে 'বীরবল বাবু' বলে ফেলেছিলাম। হঠাৎ স্মরণ হল আপনি আকবর শাহের দরবারের "দরবারী" ছিলেন। এ দেশে তখনো "বাবু" কথাটা চলতি হয় নি। অতএব আপনাকে "জী" বলেই সম্ভাষণ করতে সাহস করছি, "মিষ্টার" বললেও হয় ত হত, কিন্তু দেশী লোকের নামের সঙ্গে ঐ শব্দটার প্রয়োগ আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারি নে। আগে মনে করতাম বিলেত-ফেরত ব্যক্তিদের নামের আগেই ও-টার ব্যবহার হয়। যাঁরা কখনো বিলেত যান নি, এখন দেখছি তাদের নামকেও ঐ শব্দটি অলঙ্কৃত করেছে। যা হোক, "জী" সম্বোধনে ভরসা করি, আপনার কোনো আপত্তি হবে না, কারণ ওটা সনাতন সম্বোধন।

আপনাকে এই পত্রখানা লেখবার আবশ্যক হচ্ছে এই যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এবারকার (গত বৎসরের ফাল্গুন চৈত্র মাসের) সবুজপত্রে "রায়তের কথা" লিখেছেন, আর আমি হচ্ছি একজন রায়ত ও কৃষক, সুতরাং আমার ও-সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। আর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও, যাঁকে চৌধুরী মহাশয় "রায়তের কথা" লিখেছেন, আমার বক্তব্যটা ইচ্ছা করলে শুনতে পারবেন। তাঁকে শোনাবার কারণ এই যে, কৃষ্ণনগরের রায়ত সভায় এবং মেদিনীপুরের

প্রাদেশিক সমিতিতে কৃষকের হিতের জন্য তিনি দুটো ভাল কথা বলেছেন। মানুষের স্বভাবই এই যে, যেখানে মানুষ দুটো মিষ্ট কথা শুনতে পায়, সেইখানেই আর দুটো কথা বলতে চায়। তাই আমি আপনার কাছে, তথা রায় মহাশয়ের কাছে, দুটো কথা বলতে সাহস করেছি। আপনি ঠিকই বলেছেন যে অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধা হবে। এ পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় যাঁরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কৃষকের অবস্থাটা বেশ ভাল করে বোঝেন এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তার উপর ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের, মিউনিসিপালিটির, ডিষ্টিক্ট বোর্ডের, যেমন নির্ব্বাচিত নিজস্ব প্রতিনিধি আছেন, কৃষক সম্প্রদায়ের তেমন নির্ব্বাচিত নিজস্ব প্রতিনিধি নেই। কিন্তু জমিদারদের সে রকম প্রতিনিধি আছেন। তা' ছাড়াও অন্য রকমে নির্ব্বাচিত হয়ে, জমিদার স্বয়ং এবং প্রতিনিধি দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেন। এখন শুনছি সে অবস্থাটা থাকবে না। এর নিয়মগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নি। এখন চাই কৃষকের যিনি প্রতিনিধিত্ব করতে চাইবেন তাঁকে কৃষকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আর প্রতিনিধির কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করলে, পরে আর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হতে পারবেন না। এই প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন সম্বন্ধেই ব্যবস্থাপক সভায় একবার কি হয়েছিল, তা' বোধহয় আপনি জানেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের পাঁচ শালা বন্দোবস্ত, তারপর শাল শাল বন্দোবস্ত, তারপর দশ শালা বন্দোবস্ত, তারপর দশ শালের দু'শাল না যেতে যেতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; তারপর ১৮৫৯ শালের দশ আইন, তার পর ১৮৬৯ শালের আট আইন প্রভৃতি সব করেও যখন কৃষকের দুঃখ

ঘুচল না, তার প্রতি অত্যাচার কমল না, তখন ১৮৭৬ সালে এই আইন-সাগর মন্থন করে একটা নতুন আইন করবার জন্য এক পাণ্ডু-লিপি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হল। উদ্দেশ্য, কৃষকের স্বত্বটা সুনির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। স্মরণ রাখবেন প্রজাস্বত্ববিষয়ক এতগুলি আইন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রজাস্বত্ব পদার্থটিই অনির্দ্দিষ্ট থেকে গিয়েছে! যাক্ তিন বৎসরব্যাপী বাদানুবাদের পর এর ফল হল এক কমিশনের নিয়োগ! একটা Rent Law commission নিযুক্ত হল, আর তার সাহায্যের জন্য নিযুক্ত হ'ল এক কমিটি, যার সদস্য হলেন অভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারী, নীলকর সাহেব ও জমিদার!! আর প্রজা বা তার প্রতিনিধি?—নাদারৎ। কৃষকের পিতৃ-পুরুষের পুণ্যফলে এঁদের প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপিটি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নি। এবারেও শোনা যাচ্ছে যে, বিহারের নীলকর ও জমিদার জোট বেঁধেছেন। প্রজার হিতে না কি এঁদের অহিত হয়। আর এঁরাই জগৎকে বোঝাতে চান যে এঁরাই প্রজার স্বাভাবিক নেতা! এই জন্যই এবার কৃষকের অকৃত্রিম নেতা চাই।

আপনার কথায় বোধ হয় যে পাছে জমিদারেরা মনে করেন যে, আপনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী সেই জন্য আপনি শঙ্কিত। কিন্তু আপনি জানেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা যে প্রকৃতই চিরস্থায়ী হবে এমন কেউ-ই মনে করেন নি। কারণ, বন্দোবস্তটা করবার আগে কোনো অনুসন্ধানই করা হয় নি। আপনি ত আকবরের দরবারের অন্যতম রত্ন। আকবর টোডরমলের সাহায্যে কেমন করে দেশটাকে পরগণায় পরগণায় ভাগ করে জমির গুণাগুণ অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করে, আর নিরিখ বেঁধে দিয়ে কানুন-গো

পাটোয়ারি নিযুক্ত করে সমস্ত ব্যাপারটা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর মুরশিদকুলী খাঁও বাঙলা দেশে ঐ রকম করে খাজানা নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস এসব বিষয়ের কোনো অনুসন্ধানই করলেন না। স্থানীয় রীতি কি, তারও অনুসন্ধান করলেন না। এই অনুসন্ধানটা না কি কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কোম্পানীর রিপোর্টে উল্লিখিত আছে—"the lights formerly derivable from the Kanungo's offfice were no longer to be depended on, and a minute scrutiny into the value of lands by measurements and comparison of the village accounts, if sufficient for the purpose, *was prohibited from home* (Fifth Report on the affairs of the East India Company to the House of Commons vol. I, page 23). অনুসন্ধান ত হলই না, তাঁর পরিষদবর্গের মতামতও নেওয়া হল না। শোর প্রভৃতি মন্ত্রিরা যখন ত্রুটি দেখিয়ে দিলেন তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস যেন একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন—"I think it unnecessary to enter into any discussion of the grounds on which their (Zamindars') right appears to be founded. It is the most effectual mode for promoting the general improvement that I look upon as the important object for our present consideration, (Lord Cornwallis, in the Fifth Report vol. I, page 591). গবর্ণর জেনারেল যখন এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক অনাবশ্যক মনে করলেন তখন আর তর্কবিতর্ক অবশ্যই হল না।

১৭৯৩ সালের ২২ মার্চের সুপ্রভাতে লর্ড কর্ণওয়ালিস ঘোষণা করলেন —"The Governor General in council accordingly declares to the Zamindars, independent Taluqdars and other actual proprietors of land, with or on behalf of whom a settlement has been completed that at the expiration of the term of the settlement (ten years) no alteration will be made in the assessment which they have respectively engaged to pay, but that they and their heirs and lawful successors will be allowed to hold their estates at such assessments *for ever.* Land systems in British India, by Baden-Powell. vol. I, p. 400, foot note,). এখন দেখুন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলভিত্তি যে ঘোষণা, তাতে কৃষকের নামমাত্র নাই, আছে জমিদার তালুকদার এবং অন্যান্য জমির অধিকারী! কৃষকের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নি। তার স্বত্ব ত পরের কথা। এ সম্বন্ধে একজন অজ্ঞাতনামা সিভিলিয়ান তার "Land Tenures" নামক গ্রন্থে বলেন, "In point of law and fact, the raiyats can claim (that is ordinary raiyats can claim) under the provisions of Lord Cornwallis' Code, NO RIHTS at all. (Land Tenures, by a Civilian. page 104).

কিন্তু যাক স্বত্ব অধিকারের কথা। চৌধুরী মহাশয় বলেছেন ও কথাগুলো আমরা বুঝি না। কিন্তু আমরা যা বুঝি, হাড়ে হাড়ে বুঝি, তারই একটা প্রতিকার হোক। এই সে দিন পর পর দু'বৎসর

অনাবৃষ্টি হওয়ায়, দেশে হাহাকার পড়ে গেল, লোকের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। কৃষক ভিক্ষা করে' কর্জ্জ করে' চুরি করে' প্রাণ পাখীটিকে কোনো রকমে দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে রাখলে। জমিদার ও মহাজন তাঁদের প্রাপ্যের জন্য নালিশ করলেন, জমি বিক্রী হয়ে গেল, আর যা-কিছু ছিল, তাও তাই হল। কৃষক দিন-মজুরী করতে আরম্ভ করলে। এটা যে কৃষক বুঝেছে, সে বিষয়ে বোধ করি কারো কোনো সন্দেহ নেই। অনাবৃষ্টিটা ভারতবর্ষের একচেটে সম্পত্তি কি না জানি নে, কিন্তু অনাবৃষ্টির ফল দুর্ভিক্ষ যে ভারতবর্ষের একচেটে তা বেশ জানি। সেটা আর অন্য কোনো দেশে হয় না। কিন্তু কৃষকের জমিটুকু যদি বাস্তবিকই কৃষকের হত, বাকী খাজনার জন্য যদি নিলাম বিক্রী হয়ে না যেত ত কৃষককে কুলী হতে হত না। কথা উঠতে পারে তা হলে জমিদারের বাকী খাজনা কি করে আদায় হবে? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। নানা উপায়ে তা হতে পারে। তার মধ্যে একটা উপায় হচ্ছে এই যে, শস্য উৎপন্ন হলে কৃষকের খরচের মত রেখে, বাকীটা ক্রোক করে, বিক্রী করে নেওয়া যেতে পারে। জমিদারকেও সতর্ক হতে হবে, তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন আর যখন ইচ্ছা নালিশ করে কৃষকের জমিটুকু কেড়ে নেবেন, তা হতে পারবে না। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনটিও বড় চমৎকার। কৃষির লাঙ্গল, গোরু, বীজ প্রভৃতি বিক্রী হতে পারে না, কিন্তু যাতে লাঙ্গল, গোরু, বীজের ব্যবহার হবে, সে জমিটা বিক্রী হতে পারে! এই ক্রোক বিক্রীটা এ দেশে সম্পূর্ণ নতুন। হিন্দুদের রাজত্বেই বলুন, আর মুসলমানদের রাজত্বেই বলুন এটা ছিল না। এটি সম্পূর্ণ বিলিতি আমদানী। কোম্পানীর বিলিতি কর্ম্মচারীরা এ দেশের জমিদারকে তাঁদের দেশের

land lord বলে যেমন ভ্রম করলেন, প্রজাকেও তেমনি tenant বলে ভ্রম করলেন। আর সেই ভ্রমের বশেই সেখানকার ক্রোকের আইনটা এ দেশে আমদানী করে ১৭৯৩ শালের ২২ রেগুলেশন দ্বারা এ দেশে জারি করলেন। Rent Law Commissioner-দের রিপোর্টে প্রকাশ যে—"distraint is an off set of English Law, which was originaly introduced into this country by Regulation xxii of 1793, which empowered certain specified landlords to distrain and sell the crops and products of the earth of every description the grain, cattle, and all other personal property) whether found in the house or on the premises of the defaulter or any other person) belonging to the tenants. This continued to be the law until 1859 when the power of distraint was limited to the produce of the land on account of which the rent was due. এর থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে জমিদারের সুবিধার জন্য যা-কিছু আবশ্যক সবই করা হয়েছিল, প্রজার জন্য কিছুই করা হয় নি। এর পূর্ব্বের রেগুলেশন, অর্থাৎ—১৭৯৩ সালের ৭ রেগুলেশনটি আরও ভয়ানক—তার দ্বারা আদালতের সাহায্য না নিয়েই জমিদার প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করতে পারতেন এবং প্রজাকেও গ্রেফ্তার করতে পারতেন। প্রায় বিশ বৎসর প্রজা এই উৎকট আইনের যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। তারপর ১৮১২ সালের ৫ রেগুলেশনের দ্বারা গ্রেফ্তারের ক্ষমতা উঠিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সম্পত্তি ক্রোকের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ থাকল। রেণ্ট-ল-কমিশনারগণ

ক্রোকের ক্ষমতাটাও সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রবল জমিদারেরা প্রবল আপত্তি করলেন। আর প্রজার পক্ষে কথা কইবার একটি লোকও ছিল না। সে প্রস্তাব গ্রাহ্যই হল না। কমিশনের রিপোর্টে আছে—"The Rent Law Commission proposed to abolish the law of distraint altogether but to this strong objections were taken (Rent Law Commissioner's Report. Vol 1. p. 6).

চৌধুরী মহাশয় বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা emergency আইন। কিন্তু সে সময়ে কোন emergency ত দেখতে পাওয়া যায় না। ১৭৬৫ শালে কোম্পানী বাঙ্‌লা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী পান। সেই সময় থেকেই কিসে সহজে বিনা আয়াসে এই বিস্তীর্ণ দেশটার খাজানাটা কোম্পানীর ধনাগারে এসে পৌঁছয়, এই ছিল কোম্পানীর চিন্তার বিষয়। আটাশটি সুদীর্ঘ বৎসর এই চিন্তায় কেটে গেল। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জারি হল। আর যিনি জারি করলেন তিনি বললেন যে এ নিয়ে আর তর্কবিতর্ক তিনি চান না, অনুসন্ধানও চান না। Energency আইন হোক আর নাই হোক, আইনটি আর এ অবস্থায় থাকতে পারে না, এর আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন দরকার, তাতে লোকে Bolshevism ই বলুক আর যাই বলুক। সময় মত এই পরিবর্ত্তন ও সংশোধন হয় নি বলেই ত আজ রাশিয়ার দুর্ব্বল প্রজা বলসেবী হয়ে উঠেছে। যে সময়ে এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হল সেই সময়ে ফ্রান্সের দুর্ব্বল প্রজারাও বলসেবী হয়েছিল, তখন অবশ্য বলসেবী কথাটা জন্মায় নি। কিন্তু Bolshevic কথার উৎপত্তি হোক আর নাই হোক, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার

নামে অনেক অত্যাচার অনাচারই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তা হলেও ফরাসীবিপ্লবকে আজ আর কেউ অবিমিশ্র অমঙ্গলের হেতু মনে করে না। কিন্তু এদেশে কৃষকদের মধ্যে তার কোনো সম্ভাবনাই নাই। সে অর্দ্ধাশন ও রোগকে জীবনের চিরসহচর করে নিয়ে সমস্ত শরীর মনের বল হারিয়ে দারিদ্র্য-দুঃখকে অদৃষ্ট-দেবতার্পিত করে বসে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এবং তাঁর মত কৃষক-হিতৈষী যদি এই শাসন-প্রণালীর পুনর্গঠনের দিনে তার পক্ষ হয়ে দাঁড়ান, তা'হলে কৃষক কৃত-কৃতার্থ হবে। আরম্ভেই বলেছি, আমি কৃষক, আমার অভাব অভিযোগ দুঃখ ক্লেশ অনেক। আপনার যদি শোনবার সহিষ্ণুতা থাকে ত আরো ক্রমে বলব।

চাতরা, হাজারিবাগ,
১০ই বৈশাখ, ১৩২৭।

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

আর্য্য অনার্য্য।

——:•:——

১৩২৫ সনের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যার সবুজপত্রে "বাঙলা ভাষার কুলজী" ব'লে আমার এক প্রবন্ধ বা'র হয়। এই বছরের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের "প্রতিভা"তে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তার এক সমালোচনা ক'রে আমায় সম্মানিত ক'রেছেন। দেশে আর এখানে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এতদিন চন্দ মহাশয়ের সমালোচনা-টির উপর আমার বক্তব্য লিখে উঠ্‌তে পারি নি, তবে "Better late than never"—এ প্রবাদের নজীরে অল্প কিছু লিখে পাঠাচ্ছি। আমার প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সঙ্গে চন্দ মহাশয়ের মতের মিল নেই। তিনি মনে ক'রেছেন, তাঁর প্রতি আমি 'ঠেস দিয়ে কথা ব'লেছি,' তাঁকে উদ্দেশ ক'রে আমি শ্লেষ-বিদ্রূপ ক'রেছি, তাই তিনি একটু অসহিষ্ণু হ'য়েছেন মনে হয়। কিন্তু আমি কৈফিয়ৎ হিসেবে বল্‌ছি, প্রবন্ধ লেখবার সময় তাঁর কথা আমার আদৌ মনে হয় নি—তাঁর সমালোচনা পড়ে তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ ক'রেছেন

দেখে আমি বিশেষ অশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছি। জাতিতত্ব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি আমি নিতে পারি নে, কিন্তু "গৌড়রাজমালা" ও "Indo-Aryan Races"-এর লেখককে আমি যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখি। আমার প্রবন্ধ আমি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ ক'রে লিখি নি; চন্দ মহাশয় আমার মন্তব্যগুলিতে ক্ষুণ্ণ হওয়ায় আমি দুঃখিত।

কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারটা কিছুই নয়। বাঙালী জাতির আর আর বাঙলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন মত পোষণ করি। আমি আমার প্রবন্ধে ব'লেছি, বাঙালী জাতি হচ্ছে মূলত মিশ্র অন্-আর্য্য জাতি, আর্য্যভাষা আর আর্য্য সভ্যতা নিয়েছে মাত্র; তাও খুব প্রাচীন কালে নয়। বাঙলাভাষার রীতিনীতি হচ্ছে আর্য্যেতর; উপাদান, অর্থাৎ—ধাতু শব্দ প্রভৃতি আর্য্যভাষার, কাঠাম বা রূপ হচ্ছে অনার্য্য। বাঙলা ভাষার ঠিক ইতিহাসটি বা'র হ'লে যে-জাতের মধ্যে এ ভাষার উদ্ভব সেই বাঙালী জাতের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হবে। বাঙলার অনার্য্য ভাষীর মুখে মাগধী অপভ্রংশ ব'দলে বাঙলা ভাষায় পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। বাঙলা ভাষার চর্চ্চায় প্রাকৃত সংস্কৃত পড়া দরকার, কিন্তু কোল-দ্রাবিড়-বোড়োর চর্চ্চাও বাঙালীর ভাষার আর জাতীয় উৎপত্তির আলোচনার পক্ষে খুব বিশেষ ভাবে উপযোগী, এই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য। চন্দ মহাশয় এই মতের ঘোরতর বিরোধী। তাঁর মত হচ্ছে এই যে, ভারতের আর্য্যভাষীরা দু'দলের লোক ছিল, একদলের মধ্যে বৈদিক ভাষা আর সভ্যতার বিকাশ, এরা হ'চ্ছে "ভিতরী" দল, মধ্যদেশের অধিবাসী; আর একদল অবৈদিক আর্য্য-

ভাষী, এরা "বাইরী"-দল, মধ্যদেশের অধিবাসীদের চারদিকে উপনিবিষ্ট হয়। গুজরাত হ'য়ে মধ্যভারতের জঙ্গল দিয়ে 'দলে দলে' বাঙলায় আসে ;—জাতি, অর্থাৎ—race হিসেবে বৈদিক আর্য্য থেকে দ্বিতীয় দল আলাদা। বাঙালীর উৎপত্তি এই অবৈদিক আর্য্য থেকে, বাঙলা ভাষার মূলে এই অবৈদিক আর্য্য-ভাষা ;—অবৈদিক আর্য্যদের মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি ; এরা বর্ণাশ্রমের ধার ধারত না, পরে মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক ধর্ম্ম এসে এই অবৈদিক বাঙালী প্রভৃতি বাইরী-দলের আর্য্যদের বংশধরদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করে। বাঙলার অনার্য্য প্রভাবকে তিনি যেন আমল দিতে চান না।

চন্দ মহাশয় যে "ভিতরী-বাইরী" দুই প্রশাখার আর্য্য জাতি ও ভাষায় আস্থাবান, সেই দুই শাখার কল্পনা প্রথম করেন পরলোকগত পণ্ডিত হ্যর্ন্‌লে। ভারতের অধুনিক আর্য্য-ভাষাবিদ্‌গণের অগ্রণী স্যর জ্যরজ্ গ্রিয়ার্সনও এই দুই শাখার আর্য্যের তথা আর্য্যভাষার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন, ভাষা হিসেবে হিন্দী আর মধ্যদেশের অন্য উপভাষাগুলি একদিকে, আর অন্যদিকে পঞ্জাবী সিন্ধী গুজরাতী বিহারী বাঙলা মারাঠী ; অর্থাৎ—বাইরী-দলের ভাষাগুলির মধ্যে কতকগুলি ধ্বনি আর নাম ও ধাতুরূপ ঘটিত বিশেষত্ব সমভাবে বর্ত্তমান, যেগুলি লুপ্ত অবৈদিক আর্য্য থেকে পাওয়া, আর যেগুলি ভিতরী-দলের সংস্কৃতজ ভাষা হিন্দীতে মেলে না ; আর বাইরের ভাষাগুলির প্রকৃতি আর আচরণ, মধ্যদেশের হিন্দীর থেকে, মৌলিক পার্থক্য থাকার দরুণ, একেবারে পৃথক। এই মত অনুসারে ভারতের আর্য্যভাষার বংশতালিকা এই রকম দাঁড়ায় :—

আদি আর্য্য
ঈরাণী
দরদী বা পিশাচ শ্রেণীর ভাষা
অবৈদিক আর্য্য ('বাইরী')
?
কথিত বৈদিক ('ভিতরী')
পশ্চিম
পারসীক
ফারসী
পূর্ব্ব
আবস্তিক
উত্তর
প্রাচীন খোটানী
মধ্য এশিয়ার
ঘল্‌চা ভাষা
পশ্‌তো
বলোচী
চিত্রালী কাশ্মিরী
প্রভৃতি
উত্তর পশ্চিমের
প্রাকৃত,
টক্কী. মাদ্রী, ব্রাচড
ইত্যাদি
পঞ্জাবী. লহন্দী,
সিন্ধী
উত্তরের
প্রাকৃত
খশ
পাহাড়ী-
আবন্তিকা,
সৌরাষ্ট্রী
ইত্যাদি
রাজস্থানী,
গুজরাতী
মাহারাষ্ট্রী
মারাঠী
সংস্কৃত
মধ্যদেশের
প্রাকৃত,
শৌরসেনী
পশ্চিমা হিন্দী
পূবের প্রাকৃত
মাগধী
বাঙলা, ওড়িয়া,
বিহারী
অর্দ্ধমাগধী
পূর্ব্বী হিন্দী
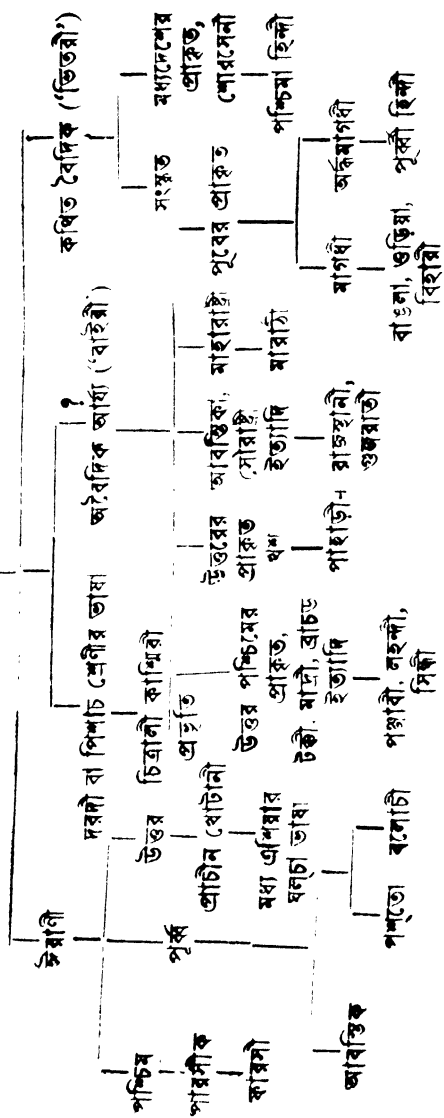
এই বংশলতিকায় দেখা যাচ্ছে যে, বাঙলা সিন্ধী মারাঠী, এরা হচ্ছে এক পুরুষ অন্তরিত—হিন্দী এদের থেকে আলাদা। সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে হিন্দীর মাতৃস্বস্-সম্পর্কের, বাঙলার সঙ্গে সে সম্পর্কটা অত ঘনিষ্ঠ নয়। এ ছাড়া, দরদী-ভাষার প্রভাব নোতুন ক'রে লহন্দী সিন্ধী রাজস্থানী গুজরাতীর উপর প'ড়েছে, অনুমান করা হয়। আবার কাশ্মিরী মূলে হচ্ছে 'বাইরী' শ্রেণীর দরদ-ভাষা, কিন্তু সংস্কৃতের আর প্রাকৃতগুলির প্রভাবে কাশ্মিরী অন্যরূপ ধ'রে ব'সেছে। মধ্যযুগে বৈদিক আর অবৈদিক বা 'ভিতর-বাইরী' বিভাগের প্রাকৃতগুলির মধ্যে পরস্পর খুব প্রভাব পড়ে; বিশেষত শৌরসেনী আশ-পাশের বাইরী-প্রাকৃতের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে তাদের রূপ একেবারেই ব'দলে দেয়। আর তা ছাড়া, 'ভিতরী'-আর্য্যদের মধ্যে উৎপন্ন সংস্কৃতভাষার প্রভাব, "ভিতরী-বাইরী" দু'দলের চেহারা অনেকটা ব'দলে দিয়েছে—বাইরী-দলের ভাষাকে যেন ভিতরীর সামিল ক'রে ফে'লেছে।

বিলেতে এসে গ্রিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে এই 'ভিতরী-বাইরী' বিষয়ে আলাপ হয়, কিছু পত্রব্যবহারও চলে। তিনি বলেন যে এই 'ভিতরী-বাইরী' মতটা একটা থিওরি বা অনুমান মাত্র; জোর ক'রে কিছু বলা চলে না। কখন, কিভাবে এই দু'দলে ভারতে আর্য্যভাষার প্রসার ক'রেছিল, আর পরস্পর সংঘাতে বা সম্মিলনে এসেছিল, সে সম্বন্ধে

কিছুই বলা যায় না। আর বাঙালী, কাশ্মিরী বা গুজরাতী একজাতির কিনা, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু ব'লতে পারেন না; তবে তাঁর মনে হয়, এরা এক জাতের নয়, যদিও খুব সম্ভব একই মূল থেকে এদের ভাষার পত্তন।

এই 'ভিতরী-বাইরী' থিওরি ভারতের আর্য্যভাষার ইতিহাসে একটা নোতুন সমস্যা এনে দিয়েছে। সকলেই জানে যে বেদের ভাষা হ'চ্ছে সাহিত্যের ভাষা—সাধু ভাষা; প্রাচীনকালে অনেক লৌকিক 'ভাখা' ছিল, যাদের থেকে প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি। এই সব লৌকিক ভাখায় এমন ধরণ কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল নিশ্চয়ই, যেগুলি আর্য আর শিষ্ট ভাষা, বৈদিক আর সংস্কৃতে ঠাঁই পায় নি। এখন লৌকিক বা প্রাকৃত বা কথ্য বৈদিক ভাখাগুলি কতটা একই গোষ্ঠীতে প'ড়ত, আর কতটাই বা একেবারে ভিন্ন গোষ্ঠীতে প'ড়তে পা'রত, তা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। অর্থাৎ—'ভিতরী-বাইরী' মতের অনুকূল বংশকল্পনা না হ'য়ে, এই রকমটা যে ছিল না, তা কেউ জোর ক'রে ব'লতে পারে না। পাঞ্জাব, মধ্যদেশ, প্রাচ্য—এইরূপে আর্য্য-ভাষার প্রসার; কাজেই যখন হয় ত মধ্যদেশে প্রাকৃতের কাছাকাছি ভাষা চ'লছে, তখন প্রাচ্যে আর্য্যভাষা আসেই নি, বা এসেছে মাত্র। সুতরাং সব জায়গায় প্রাকৃতের উৎপত্তি এক সময়ে হয় নি অনুমান করা যায়।
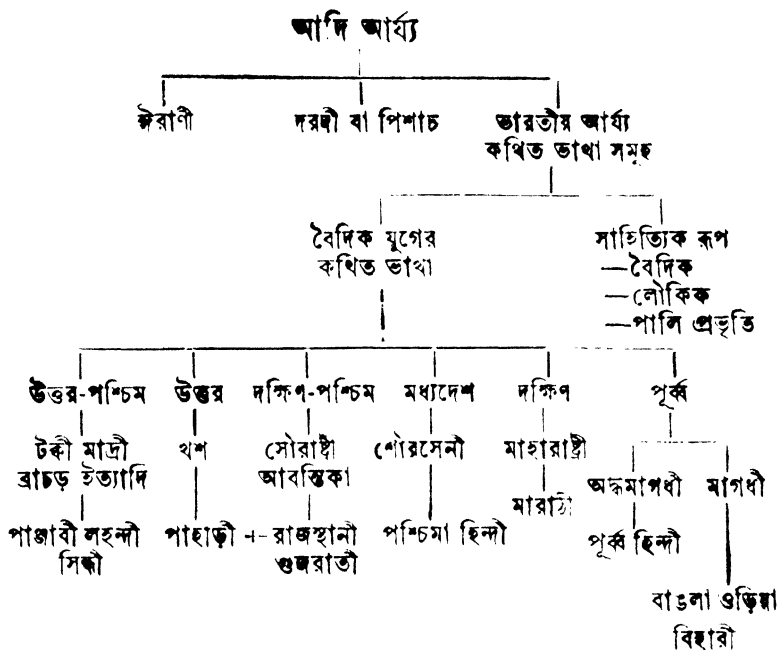
শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয়ের জাতি তত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার আলোচনা করবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি ও-বিদ্যার ব্যবসায়ী নই। যদিও তাঁর বাঙালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমান, আর হিন্দু শাক্ত বৈষ্ণব মতের ইতিহাস নির্ণয়ের চেষ্টা আমার, আর আরও অনেকের কাছে বিশেষ কাল্পনিক ব'লেই মনে হয়। তিনি আমাকে দুটো মস্ত অপ-সিদ্ধান্ত প্রচার করার জন্য দায়ী ক'রেছেন। একটা এই যে আমি মনে করি ভাষার দ্বারা জাতের পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটা আমি যে ভাবে ব'লেছি তা যিনি আমার প্রবন্ধ প'ড়েছেন তিনিই সহজে ধ'রতে পেরেছেন। মুস্কিল হ'য়েছে, এক 'জাতি' শব্দে বাঙলায় caste,

tribe, nation, race, সবই বোঝায়। আমি ব'লেছি, জাতীয় জীবনে, অর্থাৎ—national life-এ, ভাষাই প্রধান ; এর মানে এ নয় যে, ভাষা আর race একই জিনিস। কিন্তু এটা মানি যে ভাষার ইতিহাসে জাতের, অর্থাৎ—nation-এর সভ্যতার চিন্তার ইতিহাস নিহিত। যদি বাঙালীর ভাষার দ্রাবিড়-বোড়োর ছাপ থাকে, তা হ'লে দ্রাবিড়-বোড়োর প্রভাবের কথা মনে করা অসঙ্গত কি ? বাঙলা-ভাষার উৎপত্তির পূর্ব্বেই উত্তর ভারতে প্রাকৃত ভাষাতে দ্রাবিড় প্রভাব প'ড়ে তার আর্য্য বিশুদ্ধি নষ্ট ক'রে দিয়েছিল ; বৈদিকেও দ্রাবিড়-প্রভাব স্পষ্ট। উত্তর ভারত থেকেই আর্য্যভাষা আর আর্য্য-দ্রাবিড়-সভ্যতা গঙ্গা ব'য়ে বাঙলায় আসে—মধ্যভারতের জঙ্গল দিয়ে আসার কথা আমরা জানি নে। আর্য্যভাষী লোক বাঙলায় আসবার আগে এদেশে যে মানুষ ছিল তার প্রমাণ আছে। 'দলে দলে' লোক না এলেও, অল্প দু'চারিটি লোকের দ্বারা যে একটা ভাষার প্রচার হয় তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমাদের চোখের সামনে মধ্যভারতে, নেপালে এ ব্যাপার ঘট্‌ছে। মুষ্টিমেয় রোমান ঔপনিবেশিকদের ল্যাটিন ভাষা স্পেন, ফ্রান্স ডেশিয়ার প্রাচীন ভাষাগুলিকে লুপ্ত ক'রে দিয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিম আয়র্লাণ্ডে ইংরাজির প্রসার, পরাক্রান্ত জাতির ভাষা ব'লে, সভ্যজাতির ভাষা ব'লে, আইরিশদের মধ্যে সংহতিশক্তির অভাব ছিল ব'লে হয়েছে—'দলে দলে' ইংরেজ গিয়ে কখন ও-দেশ ছেয়ে ফেলে নি। কাগজের এককোণে আগুন ধরার মত এদেশে আর্য্যভাষার প্রচার ; 'জাত' আর্য্য বিজেতার আগমনে পাঞ্জাবে আর্য্যভাষার স্থাপন, তারপর মধ্যদেশে প্রচার ; সুদূর অতীতের অন্ধকারে বৈদিক যুগ বা তার পূর্ব্ব থেকেই উত্তর ভারতে আর্য্য দ্রাবিড়ের সংঘাত ও সম্মিলন। যেখানে

আর্য্যভাষা আর গাঙ্গ আর্য্যদ্রাবিড় সভ্যতার সামনে একটা সাত্মাভিমান কিছু খাড়া হ'য়েছে, সেখানেই আর্য্যভাষার অপ্রতিহত গতি খর্ব্ব হ'য়েছে ; সুসভ্য কন্নাড়ী, দ্রাবিড় আর অন্ধ্র জাতির ভাষার মূলোৎপাটন ক'রতে আর্য্য ভাষা সক্ষম হয় নি। যদিও অপেক্ষাকৃত সভ্য আর্য্য-দ্রাবিড় উত্তর ভারতের শিক্ষার ভাষা ও সভ্যতার বাহন ব'লে সংস্কৃতের প্রভাব প্রাচীন কাল থেকেই কন্নাড়ী, তেলুগু তামিলে পড়ে। অনার্য্যভাষী জাত যে বাঙলাময় ছিল, তা বাঙলা দেশের স্থানীয় নামে বেশ বোঝা যায়। আজকালকার বাঙলায় অনেক নাম আর্য্যরূপ নিয়েছে, অনেক নামের চেহারা ব'দলে গেছে ; কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মাঝেও যদি কেউ বাঙলার পরগণার, গাঁয়ের আর নদী প্রভৃতির নামের তালিকা ক'রত, তা হ'লে "আড্ডহাগস্তি," 'নাড্ডিনা,' 'মোলাড়ন্দী,' 'বাল্লহিট্টা,' 'সোববড়ি,' খণ্ডালি চম্যলা-জোলী,' জোগল্ল,' 'থৈসাডোষ্ডিচাক্কোজান,' 'দিজমক্কাজোলী,' 'লচ্ছুবড়া,' 'কোণ্টোহাড়া,' 'উনৈপোলা,' 'অঝড়াচোবোল' 'নামুণ্ডিকা,' 'নেক্কা-ডেব্বরী,' 'পিণ্ডারবিটি-জোটি(লি)কা,' প্রভৃতি নাম, যার কতকগুলি মাত্র বাঙলার পুরাতন তাম্রশাসন থেকে তুলে দিলুম। শত শত পাওয়া যেত। এরূপ নামগুলি যে কোনও আর্য্যভাষার, আর্য্যভাষী জাতের মধ্যে উদ্ভূত, তা প্রমাণ করা কঠিন মনে হয়। আর্য্যভাষী বাঙালীকে আমি অনার্য্য ব'লছি ; ভাষা আর জাতি race এক—এই অপসিদ্ধান্ত কি যুক্তিতে চন্দ মহাশয় আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন, বুঝতে পারছি নে।

দ্বিতীয় অপসিদ্ধান্ত যা আমি প্রচার ক'রেছি ব'লে চন্দ মহাশয় গম্ভীরভাবে সংশোধন করবার চেষ্টা ক'রেছেন, সেটা হচ্ছে এই যে,

আমি ব'লেছি 'বৈদিক থেকে প্রাকৃত, আর প্রাকৃত থেকে বাঙলা'। এখন আমার বলা উচিত ছিল যে 'বৈদিক যুগের কথিত ভাষা'—তা সেই কথিত ভাষা ভিতরীই হোক্ আর বাইরীই হোক্। আজকালকার চল্‌তি কথিত আর্য্যভাষা যে ধারাবাহিক ভাবে প্রাচীনকালের কথিত ভাষা থেকে উৎপন্ন, এ তথ্য নোতুন ক'রে প্রতি-পদে বুঝিয়ে দেবার আবশ্যকতা রাখে না। ভাষা বহতা স্রোত; আর্য্যভাষার নদী থেকে খাল কেটে সংস্কৃত আর তার পূর্ব্বের আর পরের সাহিত্যের ভাষা। আর্য্য ভাষার বহতা স্রোত অনার্য্যভাষার মরা গাঙের খাত দিয়ে চ'ল্‌ছে। ভারতের আর্য্যভাষার ইতিহাস আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়:—'প্রাচীন আর্য্য' Old Indo-Aryan; 'মধ্য আর্য্য' Middle Indo-Aryan; 'নবীন আর্য্য' New or Modern Indo-Aryan. সাধারণত এই তিনটি রস্ত যথাক্রমে 'বৈদিক' বা 'সংস্কৃত,' 'প্রাকৃত,' আর 'ভাষা'—এই তিন সংক্ষিপ্ত ও বিশিষ্ট নামে উল্লিখিত হ'য়ে থাকে, সুতরাং আমি বৈদিক থেকে প্রাকৃত বলায় যে ভয়ানক অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছি তা মনে হয় না। যদিও ঋগ্‌বেদের ভাষা বা পাণিনীর সংস্কৃত থেকে আধুনিক ভাষা বা প্রাচীন প্রাকৃতের উদ্ভব ব'ললে ঠিক অবস্থাটি বলা হয় না। আর আমি সে কথা কোথায়ও বলি নি।

আমার "বাঙলা ভাষার কুলজী" প্রবন্ধে আমি মিটানীয় ঈরাণী কুচারীর কথা, ভিতরী-বাইরী থিওরির কথা আনি নি; আর আমি ও-থিওরিতে বিশ্বাস করবার মত কোনও প্রমাণ এখনও পেয়েছি বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত ব'লে রাখি, ডক্টর সটেন্ কনোউ প্রমুখ দুই চারিজন, যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণাকারিদের মধ্যে অন্যতম, দরদী

প্রশাখার পৃথকত্বে বিশ্বাস করেনা; ডক্টর কনোউ মনে করেন পিশাচ বা দরদীশ্রেণী ঈরাণীর প্রশাখা মাত্র। বাঙলা (গুজরাতী, সিন্ধী, লহন্দার কথা আনতে চাই নে—কারণ ওই পশ্চিমা ভাষাগুলির ইতিহাস একটু অন্য ধরণের) ভাষাকে আমরা সরাসরি মাগধী-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে 'বৈদিক' বা কথিত Old Indo-Aryan-এ নিয়ে যেতে পারি। মাঝে থেকে কোনও বাইরী শ্রেণীর প্রাকৃতকে কল্পনা ক'রে আনবার কারণ দেখি নে। হয়ত যে ভাখা থেকে বাঙলার উৎপত্তি, তার দু'চারিটা বিশেষত্ব পশ্চিমের আর্য্য ভাষাগুলির মূল যে ভাখা তাতেও মেলে। কিন্তু বাঙলার উৎপত্তি, শৌরসেনীসম্ভূত পশ্চিমা হিন্দীর সঙ্গে এক গোষ্ঠিতে বলেই মনে হয়। সম্প্রতি লণ্ডনের "বুলেটিন অভ্ দি স্কুল অভ্ ওরিএণ্টাল ষ্টাডীজে" স্যর জ্যর্জ্ গ্রিয়ার্সন ভিতরী বাইরী দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রমাণ ক'রবার জন্য কতকগুলি ভাষাগত বস্তু বা fact এনেছেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তার অন্য, এবং সহজ ব্যাখ্যা হয়। স্যর জ্যর্জ্‌কে এ বিষয়ে চিঠি লেখায় তার উত্তরে তিনি ব'লেছেন যে বাঙলা কাশ্মিরী প্রভৃতির যে মিল, সেটা অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ঘটলেও, এই মিল হ'চ্ছে, তাঁর মতে, আদি বাইরী ভাষার থেকে কুলগত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতার (inherited tendency-র) ফল। তাঁর ব্যাখ্যা মোটেই সন্দেহ-নিরাসক নয়। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের কচকচি এনে সবুজপত্রের পাঠকদের উপর এখন উৎপীড়ন করতে চাই নে।

বাঙলাভাষা যে আর্য্যশ্রেণীর ভাষা, একথা সকলেই জানে; ভারতের আর্য্যভাষীরা যে দু'দলের দুই জাতের লোক ছিল, সে অনুমান এখনও সুদৃঢ় হয় নি—অন্তত পূর্ব্ব ভারতের পক্ষে সে

অনুমানের পক্ষে দৃঢ় প্রমাণ কিছুই নেই—অথর্ব্ব বেদের "ব্রাত্য", আর ব্রাহ্মণের "ব্রাত্য স্তোম", আর "দীক্ষিত বাক্", আর "হে অলব হে অলব" প্রভৃতি বচন নিয়ে খালি speculation বা জল্পনা চ'ল্‌ছে মাত্র। হ'তে পারে 'ভিতরী-বাইরী' মতই ঠিক—অবৈদিক আর্য্য-ভাষীর ভাষা থেকে বাঙলার উৎপত্তি—সংস্কৃতের সঙ্গে, হিন্দীর সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক এক-পুরুষে' সম্পর্ক নয়—দু-তিন-পুরুষে'; হ'তে পারে প্রাচীন ভারতে বেদবহির্ভূত আর্য্যেরা দলে বেশই ভারী ছিল, আর বেদ-স্রষ্টা আর্য্যের আগেই তারা পূর্ব্বভারতে এসেছিল। কিন্তু বাঙলার পক্ষে ব্যাপারটা দাঁড়ায় "আর্য্য-বনাম-অনার্য্য"—তা আর্য্যদের ভিতরী-বাইরী দু'ঘরে ফেলাই হোক বা 'বৈদিক' বা Old Indo-Aryan ব'লে এক কোঠায় ফেলাই হোক।

যুক্তিতর্কের উপর বিচার ক'রে যা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় সেই মত সকলের নেওয়া উচিত। 'আর্য্যামি' বা 'দ্রাবিড়ামি' বা অন্য কোনও গোঁড়ামির বশীভূত হ'য়ে বিশেষ এক মত খাড়া করবার চেষ্টা টিঁকবে না। আমাদের দেশের একটি বিশিষ্ট মত যা শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত অধিকাংশ লোককে অভিভূত ক'রে আছে সেটার নাম দেওয়া হ'য়েছে "আর্য্যামি"; এই জিনিসটি অতি হালের, গত শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ব আর প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় এর উদ্ভব, রাজার জাতের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব কল্পনার পুলকে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সাকুল্যলাভের আশায় এর প্রসার। আমাদের দেশের লোকের মনে আর্য্যামির যে কল্পনা বিদ্যমান, যথার্থ ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার দ্বারা প্রেরিত হওয়ায় চন্দ মহাশয় তার উর্দ্ধে উঠেছেন; তাঁর Indo-Aryan Races বই তার প্রমাণ। তাঁর বেদ-বহির্ভূত বাইরী-আর্য্যকে বাঙালীর পূর্ব্ব-

পুরুষ হিসেবে খাড়া ক'রলে দেশের প্রচলিত 'সনাতন' আর্য্যামি খুশী হবে না, এটা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। চন্দ মহাশয় সত্যের অনুসন্ধিৎসু ; তিনি যা লক্ষ্য ক'রে চ'লেছেন, তা আরও অনেকের লক্ষ্যস্থল। প্রাচীন ইতিহাসের সবই অন্ধতমসাচ্ছন্ন। নৃ-তত্ত্ব, নৃজাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, কেউ আলাদা আলাদা চ'লতে পারে না ; অন্যথা প্রাচীনের স্বরূপ জানবার চেষ্টা অন্ধের হাতী দেখার মত ব্যাপার হ'য়ে প'ড়বে। আমাদের হিন্দু সভ্যতাটা যে একটা মিশ্র ব্যাপার, তা সর্ব্ববাদিসম্মত। নামের মোহে প'ড়ে হিন্দু সভ্যতা গ'ড়তে অনার্য্যের সাহায্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা ক'রলে চ'লবে না। ৺রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা এই প্রকার বিচারের সারবত্তা যথার্থ উপলব্ধি ক'রেছেন। ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ আর্য্যভাষী লোকের আগমন থেকে, সত্যি : কিন্তু তার ইমারতের বুনিয়াদ হ'চ্ছে প্রাগ্-আর্য্য যুগে, ভারতের নিজস্ব দ্রাবিড়ের সভ্যতায় আদিকালের আর্য্য কখন কোন্ সময়ে নিজের ভাষা আর বিশিষ্ট সভ্যতা গ'ড়ে তোলে তা জানা যায় না। এই ভাষা, সভ্যতার স্রষ্টা ব'লে Proto-nordic, অর্থাৎ—আদি-উদীচ্য নাম দিয়ে একটা জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে বিশ্বাস করেন। আদি আর্য্যসভ্যতা যা এদের মধ্যে বিকশিত হ'য়েছিল, তা সমসাময়িক মিসর, বাবিলান, এজিয়ান সভ্যতার কাছে দাঁড়াতেই পারে না : অনার্য্য জাতির সংস্পর্শে আর সাহচর্য্যে অর্দ্ধবর্ব্বর, খুব সম্ভব মিশ্র আর্য্য,—গ্রীক, পারসীক, হিন্দু সভ্যতা গঠনে নিজের ভাষা দান ক'রে ধর্ম্মের কবিতার সূত্র কতকগুলি দিয়ে অংশ গ্রহণ করে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধর্ম্ম, চিন্তা ও সভ্যতার ইতিহাস, ভারতের আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষার

মুখ্যত এই আর্য্য অনার্য্যের সম্মিলনের ইতিহাস। সব বিষয়েরই 'অতি'র দিক আছে; চন্দ মহাশয়ের মতে 'দলে দলে' আর্য্যভাষীর প্রসারের সঙ্গে আর্য্যভাষার প্রচার; ওদিকে দক্ষিণী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পি, টি শ্রীনিবাসিয়েঙ্গার তাঁর "Life in Ancient India in the Age of the Mantras" নামক অতি উপাদেয় বইয়ে ব'লেছেন—The Aryan invasion of India is a theory invented by scholars to account for the existence of an Indo-Germanic language in North India In tracing the history of India after this theoretical event, scholars treat of India as if the previous inhabitants were so few and so devoid of stamina or of culture as to be practically effaced by the invaders or steadily driven to the east." তাঁর মনে হয় যে ভারতে আর্য্যভাষা আর্য্যসভ্যতা বাইরে থেকে এসেছিল peaceful overflow of language and culture হিসেবে।

উত্তর ভারতে আর্য্যভাষা প্রচলিত হ'য়েছে অতি প্রাচীন কাল থেকে, এটা একটা বাস্তব কথা; আর ভারতের চলতি আর্য্যভাষার সঙ্গে দেশের অনার্য্যভাষার, বিশেষ দ্রাবিড়, যতটা মিল—ধাতু বা শব্দগত নয়, অন্তর্নিহিত চিন্তা প্রণালীগত,—ততটা মিল বাইরের অন্য দেশের আর্য্যভাষার সঙ্গে নয়, এও একটা প্রমাণ-করা বাস্তব কথা। অনার্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ, আর তার গভীর প্রভাব ছাড়া এই সাদৃশ্যের কারণান্তর দেখা যায় না। আর্য্যভাষা বাঙলা দেশে আসবার আগে এদেশে দ্রাবিড়, কোল, মোন-খ্মের জাতের বাস ছিল, ভোট-

ব্রহ্ম জাতের শাখা বোড়ো জাতি উত্তর পূর্ব্বে ছিল। কোন্ সময়ে আর্য্যভাষা বাঙলা দেশে আসে তা নির্ণয় করা কঠিন। মগহী মৈথিলের সঙ্গে বাঙলা ওড়িয়ার মিল এত বেশি যে এই চার ভাষা একই মাগধী অপভ্রংশ থেকে উৎপন্ন ব'লে মনে করা হয়। এই মাগধী অপভ্রংশ বড় প্রাচীন যুগের ভাষা নয়, বুদ্ধদেবের আগে বাঙলায় আর্য্যভাষী জাতি ছিল কিনা প্রমাণ নেই। সিংহলজয়ী বিজয় সিংহকে বাঙলার অধিবাসী মনে ক'রে আমরা গৌরব করি, কিন্তু পালি বইয়ের "লাট" রাজ্য যে "রাঢ়" নয়, পশ্চিম ভারতের "লাট", সে পক্ষে যুক্তি আরও বেশি। মহারাজা অশোকের আগে এদেশে আর্য্যভাষী বড় একটা যে ছিল তার পক্ষে প্রমাণ নেই। অশোকের অনুশাসন পাওয়া গেছে উড়িষ্যায় পুরীজেলায় আর গঞ্জামে; তা থেকে প্রমাণ হয় না যে উড়িষ্যায় আর্য্যভাষা চ'লত; কারণ অনার্য্য-ভাষীর দেশে অশোকের অনুশাসন পাওয়া গেছে, আর উড়িষ্যা অশোকের বহু শতাব্দী পরে আর্য্যভাষা ও সভ্যতা পায়। হিউএন্‌ত্‌সাঙ্‌-এর সময়েও হয় ত সমস্ত বাঙলাদেশ আর্যভাষী হয় নি। বাঙলার অনার্য্যকে ভাষায় (আর সভ্যতায়) আর্য্যীকরণের প্রক্রিয়া এখনও চ'লছে, তবে খৃষ্টান মিশনারির আগমনে সে প্রক্রিয়া অনেকটা রুদ্ধ হ'য়ে আসছে; পশ্চিম বাঙলার আদি অনার্য্য রাঢ় চুহাড় জাতি, আর ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে নবাগত বহু সাওঁতাল, ভূমিজ—উত্তর বাঙলার নানা ভোট ব্রহ্মজাতি, এখন ত পূরো বাঙলাভাষী হিন্দু হ'য়ে গেছে, বোড়োভাষীরা অনেকেই ক্রমে বাঙালী বা আসামী ব'নে যাচ্ছে। এসব বিষয়ের দিকে না তাকালে বা এসব কথা ভুলে গেলে ত চ'ল্‌বে না; কারণ এ যে আমাদের জাতীয়

ইতিহাসের অংশ। চন্দ মহাশয় এসব কথা বিলক্ষণই জানেন; তিনিই ত উত্তর বঙ্গের কাম্বোজ বা ভোট-ব্রহ্ম রাজাদের রাজত্বের লুপ্ত ইতিহাসের কথার পুনরুদ্ধার ক'রেছেন। বাঙালীর মধ্যে অনার্য্য-উপাদানের কথায় তাঁর এতটা রাগের কারণ কি বুঝতে পারি নে। তিনি মাথা মাপামাপি নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু দীর্ঘকপাল, কি মধ্যকপাল, কি হ্রস্বকপালের বিচার কি অভ্রান্ত? নৃ-তত্ত্বের আলোক কি একেবারে স্থির আলোক? একাধিক ভিন্ন type থেকে কি একটা নোতুন type বিশিষ্টতা পেয়ে দাঁড়ায় না? নৃ-তত্ত্বের মত নৃজাতি-তত্ত্বের রীতি নীতি সভ্য সমাজের চর্চ্চাও কি জাতীয় ইতিহাসের পক্ষে উপযোগী নয়? খালি বেদ-ব্রাহ্মণ-সূত্র-পুরাণ-পিটক-তন্ত্র চর্চ্চা ক'রলে ত চ'লবে না; তার সঙ্গে জনসাধারণের বিশ্বাস আর আচার, জঙ্গলী সাঁওতাল ধাঙড় গারোর ধর্ম্মের আচারেরও চর্চ্চা দরকার। এক কথায়, ভারত খালি আর্য্যের নয়; আর্য্যের দত্ত ভাষার গৌরবে পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান হারা'লে, কি ভাষাতত্ত্ব, কি ইতিহাস, সমস্তরই আলোচনা অসম্পূর্ণ হবে—সত্যনির্দ্ধারণের প্রধান এক পথ রুদ্ধ হ'য়ে যাবে।

'ভিতরী-বাইরী' সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার বাসনা রইল।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

লণ্ডন,

২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯২০।

পাগল।

—*—

পাগল চলিল পথে!
সূর্য্য যখন বিদায় লভিল অস্তাচলের রথে।
অন্ধকারের ঘনঘোর কায়া
ছাইল নিখিল ভুবনের মায়া,
শ্রাবণ ধারার বন্যা ছুটিল অন্ধ আকাশ হ'তে,
পাগল চলিল পথে।

গুরু দেয়া গরজনে,
স্তব্ধ মেদিনী শিহরি উঠিল সহসা আপন মনে।
চপলা হাসিল চঞ্চল হাসি,
অসীমের পথে পবন উদাসী,
সৃষ্টিছাড়া সে পাগল মাতিল ধ্বংসের আগমনে
গুরু দেয়া গরজনে।

বিজন মাঠের মাঝে,
সর্ব্বনাশের পথে সে ধাইল সর্ব্বহারার সাজে!
জটাজাল উড়ে পবনের আগে
অগ্নির শিখা নয়নেতে জাগে
বিকট হাস্যে কাঁপাইল ধরা সেদিন প্রলয় সাঁঝে
বিজন মাঠের মাঝে।

অদূরে শ্মশান ঘাট,
ভূতভৈরব নর্ত্তন রত গৃধিনী শিবার হাট।
ক্ষুধাতুর চিতা অনল উগারি
নিবিড় শূন্য ফেলিছে বিদারি,
চারিদিকে ঘন, ধ্যান পরায়ণ তরুপ্রান্তর মাঠ,
অদূরে শ্মশান ঘাট।

আসিল আপনা হ'তে,
প্রকৃতি তখন উজলি উঠেছে সুধাকর-সুধা-স্রোতে,
শ্মশান মেলায় নির্জ্জন কোণে
দাঁড়াইল আসি পুলকিত মনে
একটি বিন্দু ঝরিল কেবল অশ্রুধারার পথে,
আসিল আপনা হ'তে।

দাহনকারীর দল
উন্মাদলীলা চাহিয়া দেখিল—বিস্মিত, অচপল।
সম্ভ্রমে ক্ষ্যাপা নোয়াইল শির,
স্পর্শিল ধূলি মৃত্যু ভূমির,
নির্ব্বাক সবে দাঁড়ায়ে রহিল—শান্ত অচঞ্চল
দাহনকারীর দল।

উঠিল সে সোজাসুজি,
বক্ষ তাহার ভাসিয়া গিয়াছে অশ্রুপ্লাবনে বুঝি !
গর্জ্জন-গানে ভরিল বিমান
ত্রস্ত, ব্যস্ত বিশ্ব-পরাণ
"রুদ্রের মাঝে মঙ্গল যিনি—তাঁহারেই আমি পূজি" ?
উঠিল সে সোজাসুজি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

পত্র।

—————৹৹—————

শ্রীযুক্ত 'সবুজপত্র' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

চাতরা (হাজারিবাগ) হ'তে শ্রীহৃষীকেশ সেন নামধেয় জনৈক ভদ্রলোক আমাকে যে পত্র লিখেছেন, সেখানি আপনার নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি "রায়তের কথা" লিখে যে হুজুগের সৃষ্টি করেছেন, পত্রলেখক তারই জের টেনে এনেছেন। আশা করি এ পত্র সবুজপত্রে স্থানলাভ ক'রবে। পত্র-লেখক মহাশয় দুটি জিনিস করতে জানেন এক পড়তে আর এক লিখতে। বইয়ের সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় আছে তার প্রমাণ তাঁর লেখার পত্রে পত্রে পাবেন, আর তিনি যে লিখতে জানেন তার প্রমাণ ছত্রে ছত্রে পাবেন। এ বাজারে ও-দুটি গুণের একাধারে সাক্ষাৎ লাভ নিত্য ঘটে না। নিত্য যা দেখা যায় সে হচ্ছে এই যে যিনি লেখেন তিনি পড়েন না, আর যিনি পড়েন তিনি লেখেন না। পত্রলেখক নিজেকে কৃষক বলে পরিচয় দিয়েছেন। এ হেন কৃষক-সংখ্যা বাঙলায় যদি বেশি থাকত তাহলে, আপনার স্থাপিত রায়তের মামলার একতরফা ডিক্রী হয়ে যেত,—কেননা ও-অবস্থায় জমিদার প্রতিবাদী কোনো জবাব দাখিল ক'রতে সাহসী হতেন না।

এখন নিজের কথায় আসা যাক্। ও-পত্র কেন যে আমাকে পাঠান হয়েছে তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। কোনো কোনো সমালোচক আমার লেখার ভিতর শিক্ষানবীশের হাত দেখতে পান, কিন্তু কোনো কোনো পাঠক তার ভিতর যে জমানবীশেরও হাত দেখতে পান, এ সন্দেহ ইতিপূর্ব্বে আমার মনে কখনো উদয় হয় নি। লেখকের বিশ্বাস আকবর বাদশার কার্য্যকলাপ আমার কাছে অবিদিত নয়, অতএব তাঁর কৃত বাঙলার জমিজমার বন্দোবস্তের খবর আমি নিশ্চয়ই রাখি। আকবর সাহেবের আমলের বিষয়ে যে আমি ওয়াকিবহাল এ কথা অস্বীকার করা আমার মুখে শোভা পায় না। যদি সে আমলের ইতিহাস শুনতে বাঙালীপাঠকের কৌতূহল থাকে ত আমি সে কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারি। যে রাজসভার সেক্রেটারি ছিলেন আবুল্ ফজল্, সভাকবি ছিলেন ফৈজী, বিদূষক ছিলেন, বীরবল, গায়ক ছিলেন তানসেন, চিত্রকর ছিলেন, আবদাস সামেদ, আকবর শাহের সে দরবারকে মোগল-বিক্রমাদিত্যের সভা বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এ সভার বাক্যচিত্র আঁকতে যার হাতে কলম আছে তার লোভ হওয়াও অত্যন্ত স্বাভাবিক। পাঠকসমাজ ফরমায়েস করলেই সে ছবি আমি আঁকতে বসে যাব। ইতিমধ্যে আমার বক্তব্য এই যে, সে যুগের জমিজমার বন্দোবস্তের সঙ্গে বীরবলের কোনোরূপ সংশ্রব ছিল না। বীরবল ছিলেন, আলোর উপাসক। আলো দেখলেই তিনি প্রণাম করতেন, তা সে আলো সূর্য্যেরই হোক্ আর প্রদীপেরই হোক্। মাটি নিয়ে যে তিনি কখনো মাথা বকিয়েছেন, তার প্রমাণ নাদারৎ। ক্ষিতি আর তেজ এ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধাতু, এর একটির মায়ায় যিনি আবদ্ধ অপরটির দিকে তিনি দৃকপাতই

করেন না। আকবর শাহের দরবারীদের মধ্যে মাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন টোডরমল, বীরবল নয়। বীরবল জানতেন আর যে কোনো বস্তু নিয়েই হোক্ না কেন, মাটি নিয়ে রসিকতা করা চলে না। জন্মভূমি মানুষের শুধু জননী নয়, আমরণ ক্ষীরধাত্রীও বটে। বীরবল যে কথাটা বুঝতেন সে কথা বাঙলার পলিটিসিয়ানরা বুঝলে আজকের দিনে জমিজমা নিয়ে দেশের লোকের সঙ্গে তাঁরা ইয়ারকি করতে উদ্যত হতেন না।

সে যাই হোক, পত্রলেখক মহাশয় তাঁর পত্রখানা যখন আমার বরাবর পাঠিয়েছেন তখন এ বিষয়ে দু'চার কথা বলতে আমি বাধ্য। এখন শুনুন আমার মত।

পত্রলেখক মহাশয় টোডরমলের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ কালের ভাষায় এবং এক কথায় বলতে হলে, সে বন্দোবস্ত ছিল "রায়ত-ওয়ারি", অর্থাৎ—উপরে রাজা ও নীচে রায়ত এই দুজনেই ছিল জমির সত্ব এবং উপসত্বের অধিকারী, মধ্যে কোনো নতুন মধ্যসত্বওয়ালাকে ঢুকতে দেওয়া দূরে থাক, যারা আগে ঢুকে গিয়েছিল তাদেরও বহিস্কৃত করে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র বীরবলের খাতিরে আকবর বাদশাহ্ এ নিয়ম ভঙ্গ করেন। বীরবল জায়গির পেয়েছিলেন তিন পরগণার, তার মধ্যে তিনি যেটি আমলে এনেছিলেন তার নাম কালঞ্জর। আকবরের পূর্ব্বের আমলে দিল্লীর বাদশাহরা আমির-ওম্‌রা চাকর-নফরকে মাইনে না দিয়ে জায়গির দিতেন, এবং সেই জায়গিরদারেরা ছিল একালের জমিদারদের প্রথম সংস্করণ। আকবর শাহ্ পাঠান বাদশাহ্দের কৃত এ বন্দোবস্ত উল্টে ফেলে সনাতন হিন্দু প্রথাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠ করলেন, যেমন তিনি আরো অনেক বিষয়ে করেছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মোটামুটি তিন যুগে বিভক্ত করা যায়, প্রথম হিন্দুযুগ, দ্বিতীয় মুসলমানযুগ, তৃতীয় ইংরেজযুগ। জমির সত্ত্ব সম্বন্ধে এ তিন যুগের তিন ধারণা।

হিন্দুযুগে জমি ছিল তার, যে তা চষে, অর্থাৎ—প্রজার। সে যুগে "ক্ষেত্রকর্ষক" এবং "ক্ষেত্রস্বামী" ছিল একই ব্যক্তি। এ সত্ত্বের মূলে ছিল লাঙ্গল।

মুসলমানযুগের সার কথা এই যে, জোর যার মুলুক তার। যে বাহুবলে দেশ জয় করে সেই তার মালিক, অর্থাৎ—রাজা। এ সত্ত্বের মূলে ছিল তলওয়ার।

ইংরাজযুগে জমির মালিক হচ্ছে সে, যে তার রাজস্ব আদায় করে, হয় দাখিলা দিয়ে, নয় নালিশ করে, অর্থাৎ—রাজাও নয় প্রজাও নয়—টেক্স কলেক্টর। এ সত্ত্বের মূলে লাঙ্গলও নেই তলওয়ারও নেই, আছে শুধু কাগজ।

জমির সত্ত্ব-স্বামীত্ব সম্বন্ধে এই তিনটি মূলসূত্র ধরিয়ে দিয়ে আমি খালাস। তারপর আপনারা যত পারেন এর টীকাভাষ্যকরুন। আপনাদের এই সব তর্ক বিতর্কের ফলে শেষটা এর একটা উত্তর মীমাংসা দাঁড়িয়ে যাবেই। দেখতে পাচ্ছি আপনি চেষ্টাকরেছেন এই তিন সূত্রের একটি সমন্বয় করা, ফলে কোনো পক্ষেই ষোলআনা আপনার স্বপক্ষ হবে না।

প্রজাপক্ষ বলবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যখন অনাদি নয়, তখন অনন্ত হতে পারে না।

জমিদার পক্ষ বলবেন, যার বিষয়ে কেতাবে লেখা আছে চিরস্থায়ী, বস্তুগত্যা তা অচিরস্থায়ী হতে পারে না।

মডারেট দল জমিদারের কথায় সায় দেবেন।

ন্যাসানালিষ্ট দল বলবেন, এখন ও-সব কথা তুলে কাজ নেই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রজার আত্মাকে উদ্বোধিত করা, তার জীবন-মরণের ভাবনা পরে ভাবা যাবে। দেশের লোকের যাতে পিঠে আর কিছু না সয় তার জন্য যা কিছু বলা-কওয়া দরকার সেই সব করা যাক, তাদের পেটে খাবার কথাটা লক্ষ্মী ভাই আমার, এ সময় আর তুলো না। আগে আমরা দেশউদ্ধার করি, পরে তোমরা পতিত উদ্ধার করো।

এ সব কথার উত্তরে আপনি অবশ্য সকল পক্ষকে পর পর এই সব কথা বলতে পারেন, যথা—

প্রজাপক্ষকে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনন্ত না হলেও কল্যান্ত হবে না। অনেক বস্তু চিরস্থায়ী না হলেও সুচিরস্থায়ী হতে পারে।

জমিদারকে—ইংরেজদের আইনের কেতাব আমাদের কোরাণ নয়; সুতরাং আমাদের হাতে পড়লে সে কেতাব আমরা আবার নতুন করে লিখতে পারি, অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অক্ষরে আছে বলে যে তা অক্ষয় হবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই।

মডারেটদের—কোনো বিষয়ে সায় দেওয়া আর রায় দেওয়া এক জিনিস নয়। আর আমরা যা চাই সে হচ্ছে মায় ফয়শালা রায়।

ন্যাসানালিষ্টদের—জনসাধারণের জীবনের অবস্থা যেমন আছে তেমনি রেখে তাদের মনের অবস্থা একদম বদলে দেওয়া অসম্ভব। তারা জীবনে থাকবে "দাস" আর মনে হবে "স্বরাট্", একথায় যে বিশ্বাস করতে পারে তার কোনো কথাতেই বিশ্বাস হয় না। পতিত-উদ্ধার না করতে পারলে দেশউদ্ধার কিছুতেই হবে না, কেন না দেশ হচ্ছে জড়পদার্থ আর দেশের লোক প্রাণী।

আপনি এই রকম অনেক কথা বলতে পারেন কিন্তু শোনে কে ? সে যাইহোক আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে, আগে আমাদের দেশ ছিল "সোনার বাঙলা", আপনি চেষ্টায় আছেন তাকে মাটী করতে। ধরুন আপনার সে চেষ্টা সফল হোল, তাহলে বলুন ত আমরা সাহিত্যিকরা—

কি করব ?

কি দেশ ধরব ?

কি ছাই লিখব ?

বাঁচব কি মরব দুঃখে ?

বীরবল।

নব-রূপকথা।*

—:০:—
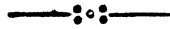
বীরবল বলেছেন—

"আমরা রূপকথা লিখতে বসলে, হয় তা কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে; কেননা রূপকথার জন্ম সত্যযুগে, আর রূপকের জন্ম সভ্যযুগে।" (শিশু সাহিত্য)

বীরবলের এমত গ্রাহ্য করতে আমাদের তিলমাত্র দ্বিধা হবে না, যদি রূপক বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে।

কোনো একটি ভাব, আইডিয়া কিম্বা দার্শনিক মতকে শরীরী করে তোলা, যা কেবল মনের পদার্থ, তাকে বস্তুর রূপ দিয়ে ইন্দ্রিয়গোচর করা, ভাষান্তরে যা abstract তাকে Concrete করাই হচ্ছে রূপকের উদ্দেশ্য। কতকগুলি ভাবের সমষ্টিকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট করে আমরা যেমন জড়পদার্থ দিয়ে দেব-দেবীর প্রতিমা গড়ি, সাহিত্যের জগতেও আমরা তেমনি আমাদের একটি বিশেষ মনোভাবকে তার বিভাব অনুভাব দিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ করে রূপক গড়ি। প্রতিক ও রূপক এ দু'য়েরই মূলে আছে মানুষের একই প্রবৃত্তি যার শুধু নাম আছে,

---

* শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, চন্দননগর 'প্রবর্ত্তক' কার্য্যালয় হইতে— "নব-রূপকথা" নামক সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপে লিখিত—সম্পাদক।

তাকে রূপ দেবার, যা অমূর্ত্ত তাকে মূর্ত্ত করবার প্রবৃত্তি। অতএব প্রতিকের সত্তা যেমন তার দেহে নেই, আছে তার অন্তরে—রূপকের সত্যও তেমনি তার পদার্থে নেই, আছে তার অর্থে। রূপকের সঙ্গে রূপ কথার মূল প্রভেদ এই যে, এর প্রথমটির পদার্থ হচ্ছে কৃত্রিম, দ্বিতীয়টির অলৌকিক।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে দুটি রূপকথা লিখেছেন, সে দু'টিই হচ্ছে মূলত রূপক। এ দু'টি কথার কথাবস্তু উপলক্ষ্য মাত্র, বক্তার আসল লক্ষ্য হচ্ছে তর্কযুক্তির বলে নয়, গল্পচ্ছলে একটি বিশেষ মনোভাবকে সাকার করা এবং সেই সাকার ভাবকে শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা। বীরবল ঠিকই বলেছেন, "সভ্যযুগে রূপকথা জন্মায় না, জন্মায় শুধু রূপক"।

(২)

এখন দেখা যাক, তথাকথিত এই রূপকথা দুটির মনের গুপ্ত কথা কি? লেখকের আসল বক্তব্য এই যে, "জগৎ মিথ্যা"—এ কথাটা মিথ্যা কথা। সকলেই জানেন যে, জগৎ যে মিথ্যা এটি হচ্ছে একটি দার্শনিক মত, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মত। আমি এস্থলে অদ্বৈতবাদীর নাম বিশেষ করে উল্লেখ করলুম এইজন্য যে, শঙ্করমত ও বেদান্তমত একবস্তু নয়। বেদান্তের বহুভাষ্যকার এবং বেশির ভাগ ভাষ্যকার শঙ্করমত খণ্ডন করে গেছেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও মায়াবাদ ওরফে বিবর্ত্তবাদের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছেন; কিন্তু তা দার্শনিক হিসেবে নয়। তিনি শঙ্করের লজিকের ভুল ধরতে বসেন নি। তাঁর অন্তরাত্মা মায়াবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে,

কেননা তাঁর বিশ্বাস জীবনের উপর উক্ত দর্শনের প্রভাব অতি মারাত্মক। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই মায়াবাদ মনের ভিতর একবার শিকড় গাড়লে মানুষকে অশক্ত অকর্ম্মণ্য নিরানন্দ ও নির্জ্জীব করে ফেলে। মানুষ তখন একেবারে জড়ভরত হয়ে পড়ে। লেখকের কল্পিত বৃদ্ধগৃধ্র হচ্ছে একটি আদর্শ, অর্থাৎ—চূড়ান্ত মায়াবাদী। তিনি ক্ষুদ্র দোয়েলকে বলেছিলেন—

"মনে রাখিও বৎস, ভগবান নিরাকারেই সত্য সাকারে ভুল; নিরাকারে তিনি আনন্দময়, সাকারে তিনি দুঃখময়।··· ··· ··· আরো জানিও বৎস, জীবনে যাহা সহজ, যাহা সরল, যাহা স্বত তাহাই ভগবানের পথে অন্তরায়! জীবনে যাহা প্রেয় বলিয়া মনে হইবে তাহাকেই বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে, কারণ ভগবান যিনি তিনি শ্রেয়, প্রেয় নহেন।"

এরূপ দার্শনিক মত সেই গ্রাহ্য করতে পারে, যার বুকের রক্ত একেবারে জল হয়ে গিয়েছে। কেননা দার্শনিক-চিন্তা জীবনের সকল সত্য থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না হলে এহেন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। মানুষের প্রকৃতিতে যা সহজ, যা সরল, যা স্বত তাকে অগ্রাহ্য করায় মানুষ তার মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করে। সুতরাং যার অন্তরে প্রাণের শক্তি আছে, অস্তিত্বের আনন্দ আছে, সে যদি তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে ফুটিয়ে তোলবার আনন্দলাভ করতে চায় তাহলে "জগৎ মিথ্যা" এ কথাটা সে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য। মানবাত্মা সহজভাবে সরলভাবে স্বতপ্রণোদিত হয়ে ও-কথায় কখনই সায় দিতে পারে না, কেন না ও-মত গ্রাহ্য করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। আর এক কথা, জগৎকে মিথ্যা বললে সে মিথ্যা ত হয়ে যায়ই

না বরং উল্টে সাংঘাতিক সত্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির উপর আত্ম-শক্তির বলে আমরা যদি প্রভুত্ব না করি তাহলে আমরা প্রকৃতির দাস হয়ে পড়ি—বস্তুগত্যা আজকের দিনে আমরা যা হয়ে পড়েছি।

এস্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, মানব জীবনের অনুকূল কি প্রতিকূল, সেই হিসেবেই কি সত্যকে জানতে হবে, না মানতে হবে? আমাদের জ্ঞানচক্ষুতে যদি ধরা পড়ে যে, এ জগৎ যথার্থই মিথ্যা তাহলেও কি মানুষের সুখলোভী মনকে প্রবোধ দেবার জন্য বলতে হবে, এ জগত সত্য? এ প্রশ্নের উত্তরে সুরেশচন্দ্র বলবেন যে, এ সৃষ্টি যদি সত্য সত্যই একটি রূপকথা হয় তাহলেও সে রূপ আমরা চোখ ভরে দেখব, সে কথা আমরা কান ভরে শুনব, কেন না এই রূপকথার রস উপভোগ করবার জন্যই আমরা হয়েছি ও আছি। এই Concrete জগতের প্রতি লেখকের স্বভাবজ নাড়ীর টান আছে।

(৬)

একদল লোকের বিশ্বাস যে, বাঙলা হচ্ছে সংস্কৃতের অপভ্রংশ অতএব বাঙলা, ভাষা হিসেবে ইতর। এ অপবাদ অমূলক। অপভ্রষ্ট হলে অনেক সময়ে যে ভাষার মর্য্যাদা বাড়ে তার প্রমাণ সংস্কৃতের উপকথা বাঙালীর মুখে হয়ে উঠেছে রূপকথা। উপকথা রূপহীন হতে পারে, কিন্তু রূপকথার বিশেষত্বই এই যে, সে কথার গায়ে রূপ আছে।

রূপকথা আর রূপক যে এক বস্তু নয়, সে বিষয়ে বীরবলের মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত করেছি। তিনি আরো বলেন—

"এই রূপকের মধ্যেই হাজারে একখানা ছেলেদের কাছে নব রূপকথা হয়ে দাঁড়ায়, যথা—Don Quixote, Gulliver's Travels ইত্যাদি।"—

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বীরবলের মতে রূপকের মধ্যে হাজারে ন'শ নিরানব্বইখানা রূপকথা নয়। আমি তাঁর চেয়ে একটু বেশি যাই। আমার মতে রূপকের মধ্যে হাজারে ন'শ নিরানব্বইখানা অতি বিরূপকথা। পূর্ব্বেই বলেছি যে, মনোভাবকে ইন্দ্রিয় গোচর, দেহী করে তোলাই হচ্ছে রূপকের উদ্দেশ্য। এ চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন অযথা, তেমনি নিস্ফল।

ভাবেরও একটা দেহ আছে এবং সে দেহ গড়ে তুলতে হয়, ভাবের সঙ্গে ভাব যোগ করে। নানারূপ আইডিয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমরা একটা দার্শনিক মতেরও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি গড়ে তুলতে পারি, যদি আমরা জানি কোন্ ভাবের সঙ্গে কোন্ ভাব খাপ খায়, আর যদি আমরা নানা ভাবকে একত্র করে তাদের যথাযথ বিন্যাস করে পরস্পারের সঙ্গে পরস্পরকে খাপে খাপে মিলিয়ে গেঁথে এক করে দিতে পারি। শঙ্করদর্শন লোককে এত যে মুগ্ধ করে তার কারণ, তিনি দর্শনের রাজ্যে লজিকের সব চাইতে বড় কারিগর। দার্শনিক তিনি মোটেই ছিলেন না কেননা প্রকৃতির, কি বাইরের কি অন্তরের, কোনো সত্যের তিনি যে কখনো দর্শন লাভ করেছিলেন তাঁর লেখায় তার কোনো পরিচয় নেই। এ সত্ত্বেও তিনি যে বড় দার্শনিক বলে

গণ্য, তার একমাত্র কারণ, তাঁর লজিকের হাত ছিল অসাধারণ তৈরী। বাজিকর যখন তার মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বেমালুম উড়িয়ে দেয় তখন কি আমরা সে টাকার শোকে অভিভূত হই, না তার হাত সাফাই দেখে অবাক হই এবং সেই সঙ্গে মহা আনন্দ অনুভব করি? টাকার ভাবনা যে তখন আমরা ভাবি নে, তার কারণ আমরা জানি সে টাকা আছে, পরে আবার ফিরে পাব। তেমনি শঙ্কর যখন এ জগৎটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে বেমালুম উড়িয়ে দেন তখন আমরা তাঁর হাত সাফাই দেখে অবাক হই এবং সেই সঙ্গে মহা আনন্দ অনুভব করি, জগৎ খোয়া গেল বলে কাঁদতে বসিনে, কারণ মনে মনে জানি জগৎটা আছে; বই বন্ধ করলেই আবার সেটি ফিরে পাব। সে যাই হোক, ভাবের দেহ বস্তু দিয়ে গড়বার চেষ্টায় তার ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়, অতএব ও চেষ্টা অযথা।

তারপর এ চেষ্টা হাজারে ন'শ' নিরানব্বই ক্ষেত্রে নিষ্ফল। রূপক যদি ভাবের তর্ক দেহকে রেখায় রেখায় অনুসরণ করে তাহলে যা সৃষ্ট হয়, তা একটা কিম্ভূত-কিমাকার কঙ্কাল মাত্র। সে বস্তু জীবন্ত ত নয়ই, তার গায়ে রক্তমাংসের সম্পর্ক পর্য্যন্তও থাকে না। মূর্ত্তি গড়তে গিয়ে তার কঙ্কাল গড়ায় মানুষে কৃতিত্বের পরিচয় দেয় না, আর দ্রষ্টার চোখে সে কীর্ত্তি হয় অসহ্য। এক জ্ঞানী ছাড়া অপর সকলের চোখেই কঙ্কাল হচ্ছে একটি বিশ্রী জিনিস; এই কারণেই সাহিত্য জগতে রূপক হচ্ছে একটি বিশ্রী জিনিস।

তবে বীরবল বলেছেন যে, রূপকের মধ্যে হাজারে একখানা যথার্থ রূপকথা হয়ে দাঁড়ায়। সুরেশচন্দ্রের হাতে দুটি রূপকই রূপ-

কথা হয়ে উঠেছে। এ দুটির ভিতর আর যে বস্তুর অভাব থাক, রূপের অভাব নেই।

(৪)

রূপক তাঁর হাতেই রূপকথা হয়ে ওঠে, যাঁর কাছে তার ভাববস্তুটা গৌণ হয়ে কথাবস্তুটা মুখ্য হয়ে ওঠে, যিনি ভাবের মূর্ত্তি গড়তে বসে কিসের মূর্ত্তি গড়তে বসেছেন সে কথা ভুলে গিয়ে মূর্ত্তি গড়বার আনন্দে মত্ত হয়ে ওঠেন। তিনিই তাঁর রচনাকে অপরের ইন্দ্রিয়গোচর করতে পারেন, যাঁর সকল ইন্দ্রিয় সজীব ও সজাগ। আর তিনিই কল্পনাকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন যাঁর জীবজগতের সঙ্গে পরিচয় আছে, আর যিনি জীবনকে সকল মন-প্রাণ দিয়ে সানন্দে আঁকড়ে ধরতে পারেন। এই রূপকথার লেখক এই রূপরসগন্ধস্পর্শময় জগতের ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে বিভোর। তারপর জীবের অন্তরে যে-আশা আকাঙ্খা, যে-আনন্দ, যে-উদ্যম, যে-শক্তি ও যে-গতি আছে, লেখকের কাছে সেই সবই হচ্ছে মানবপ্রকৃতির সার সত্য। এই কারণেই তিনি মায়াবাদের প্রতিবাদী এবং এই কারণেই তিনি তাঁর প্রতিবাদকে রক্ত-মাংসের দেহ দিতে এবং তার অন্তরে প্রাণসঞ্চার করতে কৃতকার্য্য হয়েছেন। সুরেশচন্দ্র লিখতে বসেছিলেন রূপক ; কিন্তু লিখে উঠেছেন রূপকথা।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, রূপকথা অলৌকিক কথা। সুরেশচন্দ্র “নব রূপকথায়” ভারতের অতীত সভ্যতার যে ছবি এঁকেছেন, সে ছবি খুব সম্ভবত প্রকৃত নয়। তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি আমাদের ইতিহাস শেখাতে বসেন নি, তিনি কল্পনার চক্ষে যে ছবি

দেখেছেন সেই ছবিই আমাদের চোখের সুমুখে ধরে দিতে চেয়েছেন এবং তাতে যে কৃতকার্য্য হয়েছেন তার কারণ তাঁর কল্পনা ঐতিহাসিকের নয়, চিত্রকরের কল্পনা। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁর কাছে হচ্ছে একটি বিরাট চিত্রশালা। সাহিত্যে তিনি সেই চিত্রশালারই বর্ণনা করতে ব্রতী হয়েছেন। সুরেশচন্দ্রের কল্পনার বিশেষত্বটুকু তুলনার সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করব। Venice-এর চিত্রকরগণ যে চোখ দিয়ে তাঁদের সমসাময়িক স্বনগরীকে দেখেছিলেন, সুরেশচন্দ্র সেই চোখ দিয়েই স্বদেশের অতীতকে দেখেছেন। ভাসের নাটকে পড়েছি, একব্যক্তি একটি ছবি দেখে আনন্দে এই বলে চীৎকার করে-উঠেছিলেন—"অহো কি বর্ণাঢ্যতা!" Venetian চিত্রকরদের আঁকা-ছবি দেখলে সকলের মুখ দিয়েই স্বতই উচ্চারিত হয়, "অহো কি বর্ণাঢ্যতা!" তাদের আর্টের সমস্ত ঝোঁকটা ছিল বর্ণের উপর, আকারের উপর নয়। যা-কিছু উজ্জ্বল, যা-বর্ণাঢ্য তাঁদের চোখ স্বভাবতই তার উপরে পড়েছে, আর তাঁদের রঙের তুলি তাই চির-দিনের জন্য পটস্থ করে রেখেছে! সুরেশচন্দ্রের রূপকথা পড়বার সময় আমার চোখের সুমুখে Tintoretto-র এক একখানি ছবি ফুটে ওঠে। এ চিত্রকরের কাছে মানুষের জীবনযাত্রা হচ্ছে আদ্যোপান্ত একটি শোভাযাত্রা, তাই তিনি Venice-এর উৎসবের ছবি সব এঁকে গিয়েছেন, এবং সে সব ছবি মানবের নয়নের চির-উৎসব। নরনারীর উন্নত পরিণত দেহ, উজ্জ্বল রূপ, প্রফুল্ল যৌবন, নানাবর্ণের বিচিত্র বেশ, দীপ্ত রত্ন-আভরণ, এই সকলের একত্র সমাবেশে সে চিত্র ঐশ্বর্য্যবান। তার উপর Venetian চিত্রকরেরা আলো ভালবাসতেন তাই সুরেশচন্দ্রের ভাষায় বলা চলে যে, সে চিত্র "আলোর স্পর্শে

আনন্দের আতিশয্য সহ্য করিতে না পারিয়া গালভরা হাসি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।" সুরেশচন্দ্রের চোখে আমাদের অতীতের যে মূর্তি ধরা পড়েছে সে মূর্তিও উৎসবের ঐশ্বর্য্যময় আনন্দময় মূর্তি। তাঁর কল্পনা পুষ্টিমার্গের পথিক।

সুরেশচন্দ্রের আত্মা হচ্ছে ঐশ্বর্য্যভক্ত। এস্থলে "ঐশ্বর্য্য" শব্দ আমি তার সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করছি। যে-কর্ম্ম, যে-ব্যবহার, যে-কীর্ত্তির ভিতর মানুষ এই সত্যের পরিচয় দেয়, যে তার অন্তরে ঈশ্বরের বিভূতি আছে, সুরেশচন্দ্রের মন-প্রাণ তাতেই মেতে ওঠে। যার ভিতর দীনতা, হীনতা, কৃপণতা, কাপুরুষতার পরিচয় পাওয়া যায় সুরেশচন্দ্রের আত্মা তার প্রতি স্বতই বিমুখ। আমাদের এই বর্ত্তমান বিরাট জাতীয় দৈন্যের মধ্যে যদি কোনো স্বপ্ন দেখতে হয় ত এই ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নই দেখা কর্ত্তব্য। যিনি সে স্বপ্ন দেখতে পারেন তিনি ত আমাদের সুমুখে জীবনের নতুন আদর্শ খাড়া করে দেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলেন। এ আদর্শকে আমি নূতন আদর্শ বলছি এই কারণে যে মানুষে অতীতের মায়াদর্পণে অধিকাংশ সময়ে শুধু ভবিষ্যতেরি চেহারা দেখে।

(৫)

যাঁর মনে যে-ভাবই থাক, সে তা প্রকাশ করতে না পারলে তার কথা সাহিত্য হয় না। সাহিত্যের গুণ ভাষার রূপের উপরই প্রধানত নির্ভর করে। সুতরাং এখন সুরেশচন্দ্রের ভাষার বিশেষত্বের পরিচয়

বোঝবার চেষ্টা করা যাক। সুরেশচন্দ্রের ভাষা বর্ণাঢ্য। তিনি বাক্যের গঠনের উপর ততটা ঝোঁক দেন না, যতটা দেন পদের বর্ণের উপর। তিনি সেই শব্দ বেশি ব্যবহার করেন, যা শুনলে আমাদের চোখের সুমুখে ছবি ফুটে ওঠে। তাঁর ভাষার দ্বিতীয় গুণ তার ঐশ্বর্য্য। ভাষা প্রয়োগে তাঁর কোনোরূপ কার্পণ্য নেই। তাঁর রচনার ভিতর কথা সব ভিড় করে আসে, পরস্পর ঠেলাঠেলি করে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে যায়। কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি ইচ্ছা করে এতকথা জড় করেন না। তাঁর ভাষার এই আতিশয্যের মূল হচ্ছে তাঁর মন। ভাব তাঁর মনের ভিতর টগবগ করে, তারপর সেই ভাব শব্দের আকার ধরে উছলে পড়ে। তাই তাঁর সকল লেখার মধ্যেই আত্মপ্রকাশের আনন্দ-ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দের দ্বিত্ব তাঁর অতিশয় প্রিয়। "পত্রে পত্রে" এমন কি "ছত্রে ছত্রে," "বনে বনে," "ফুলে ফুলে," "গাছে গাছে," "কুলে কুলে" প্রভৃতি ডবল শব্দ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমে মনে হয়, এ হচ্ছে তাঁর রচনারীতির একটা মুদ্রাদোষ, ইংরেজীতে যাকে বলে mannerism. তবে একটু নিরীক্ষণ করে দেখলেই দেখা যায় যে, এ দ্বিত্ব তাঁর ভাষার একটা কৃত্রিম অলঙ্কার নয়। অলঙ্কারের নিয়মভঙ্গ করেই তিনি এই দ্বিত্বের সৃষ্টি করেন। এর কারণ, এক কথায় একটা ভাব প্রকাশ করায় তাঁর মনস্তুষ্টি হয় না, কেননা তাঁর মনের আবেগ তিনি কিছুতেই স্বল্প কথার গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে চানও না, পারেনও না। তাঁর ভয় যে, বেশি চাপাচাপি করলে তাঁর ভাষা হয়ত প্রাণহীন হয়ে পড়বে; কিন্তু তিনি চান যে তাঁর ভাষা সর্ব্বাগ্রে প্রাণবন্ত হোক। তাঁর এ ইচ্ছাও পূর্ণ হয়েচে। তাঁর ভাষা সাবেগ

কিন্তু অসংযত নয়, প্রচুর কিন্তু প্রগল্‌ভ নয়। তাঁর লেখায় ভিতর প্রাণের উচ্ছ্বাস, গতি, লীলা ভঙ্গী সবই আছে। এই রূপ কথা দুটি, একটি জ্যান্ত মানুষের জ্যান্ত মনের জ্যান্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ অতএব যথার্থ সাহিত্য।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ওমর খৈয়াম।

——:*:——

["সওগাত" নামক যে একখানি বাঙলা মাসিক পত্র আছে এ কথা সম্ভবত অধিকাংশ বাঙালী পাঠকই জানেন না; অন্তত দু'দিন আগে আমি যে জানতুম না একথা নিশ্চয়। আমার কোনো বন্ধুর প্রসাদে এ পত্রের সঙ্গে হালে আমার পরিচয় ঘটেছে। উক্ত পত্র হতে ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ সবুজপত্রে পুন প্রকাশিত করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলুম না। এই প্রবন্ধটি যিনি পাঠ করবেন তিনিই প্রমাণ পাবেন যে বাঙলা ভাষা শুধু আমাদের নয়, বাঙলার মুসলমানদেরও মাতৃভাষা। এ শ্রেণীর লেখা দেখে মনে হয় যে, বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের দানের মূল্য কোনো অংশে কম হবে না। উদ্ধৃত প্রবন্ধের বিশেষ মর্য্যাদা এই যে, এর লেখক একজন ফারসি-নবীশ। ওমরের কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইংরাজি-অনুবাদের মারফৎ। মূলের সঙ্গে অনুবাদের যে সম্পূর্ণ মিল নেই—ফিট্জ্-জেরাল্ডের হাতে পড়ে ওমর যে শুধু ইংরাজি পোষাক নয় সেই সঙ্গে বিলেতি মূর্ত্তিও ধারণ করেছেন, এ গুজব আমরা বহুদিন থেকে শুনে আসছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ফারসি ভাষা না জানার দরুণ ইংরাজি অনুবাদে ওমরের কবিতা যে কতদূর রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে তা বলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। বহু ইংরাজ সমালোচকের মতে ওমরের কবিতা মূলে কাচ, ফিট্জ্-জেরাল্ডের স্পর্শে তা মণি হয়ে উঠেছে। এ মত যে কতদূর সঙ্গত তার প্রমাণ পাঠকমাত্রেই উদ্ধৃত প্রবন্ধ হতে পাবেন।

আমি পূর্ব্বে আভাস দিয়েছি যে, এই মুসলমান লেখকের বাঙলা খাঁটি-বাঙলা। কিন্তু তাঁর ভাষার এই একমাত্র গুণ নয়। তাঁর লেখা পড়ে মনে

হয় যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে, কেননা তাঁর রচনার ভিতর ঠিক ঠিক সংস্কৃত কথাগুলি ঠিক্ ঠিক জায়গায় বসে গিয়েছে। আর এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, সংস্কৃত শব্দের অযথা প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ থেকে রচনাকে মুক্ত রাখতে হলে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে লেখকের পরিচয় থাকা আবশ্যক। এই লেখা পড়ে আমার আর একটি কথা মনে হয়েছে যে, এ প্রবন্ধ বাঙালী ছাড়া আর কোনো ভারতবাসী লিখতে পারত না। আমাদের বাঙলা সাহিত্যের একটা বিশেষত্ব আছে, যা পরকে বোঝানো কঠিন কিন্তু নিজে বোঝা শক্ত নয়। যদিও লেখক ধর্ম্মে মুসলমান তবুও তিনি যে জাতিতে বাঙালী তার পরিচয় তাঁর লেখায় আগাগোড়া পাওয়া যায়। আজ-কাল এ দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা নিত্য শোনা যায়। কিন্তু আমাদের পরস্পরের যথার্থ মিলন হবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কেননা মনোজগতের মিলই হচ্ছে মনের মিল, সে মিল কোনো সাংসারিক উদ্দেশ্য-মূলক নয়, অতএব তার আর কোনো মার নেই। আমার আশা, বাঙলা সাহিত্যই হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিচারে বাঙলার লোককে একজাত করে তুলবে।

সম্পাদক।

* * * *

সত্য বটে ওমর খৈয়ামের কবিতা পারস্যদেশে অথবা ভারতবর্ষে সমাদরে গৃহীত হয় নাই এবং ওমর খৈয়ামের যে আজ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তাহা যে ইউরোপের অনুগ্রহে ইহাও সত্য। ওমরের সহিত আমাদের প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় ফিজ্ জিরেল্ডের দৌত্যের গুণে। কিন্তু মূল পার্‌শী পড়িয়া আমার মনে হয় যে, ফিজ্-জিরেল্ড এই দৌত্য কার্য্যে প্রকৃত ওমর খৈয়ামের মনের ভাবের উপর নিজের মনের ভাবের ছাপটা দিয়াছেন, এত অধিক পরিমাণে আজ যে ওমর আমাদের

নিকট পরিচিত—সে প্রকৃত ওমর নহে,—ওমরের ছদ্মবেশধারী ফিজ্‌-জিরেল্ড। কান্তি বাবু মূলের সহিত পরিচিত কিনা আমি সঠিক জানিনা, কিন্তু তাঁহার অনুবাদ পড়িয়া মনে হয় যে তিনি ফিজ্‌-জিরেল্ডকেই মূল ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন এবং সেই জন্য তাঁহার প্রদর্শিত ওমর খৈয়ামও প্রকৃত ওমর খৈয়াম নহে।

কান্তি বাবুর পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। তিনি 'ফার্সি আমরা জানি নে' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত জলধর সেন কান্তি বাবুর পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন 'মূল ফরাসীতে (ফার্সিতে ?) কি আছে জানি না'। তাঁহারা উভয়েই খৈয়ামের কবিতার দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন এবং মূলের সহিত পরিচিত না থাকায় তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন,—

"ওমারের সকল কবিতার ভিতর দিয়ে যা ফুটে উঠ্‌ছে, সে হচ্ছে মানুষের মনের চিরন্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন :—

"কোথায় ছিলাম, কেনই আসা, এই কথাটা জান্‌তে চাই"

* * * *

যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে? * *

এ প্রশ্নের জবাবে ওমর খৈয়াম বলেন :—

"সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি, সত্য-মিথ্যা কিছুই নাই।"—

ওমর যে সেকালের মুসলমানসমাজে উপেক্ষিত হয়েছিলেন, এবং

একালের ইউরোপীয় সমাজে আদৃত হয়েছেন, তার কারণ তাঁর এই জবাব। যাঁরা মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁদের এ মত শুধু অগ্রাহ্য নয়—একেবারে অসহ্য; কেননা এ কথা ধর্ম্মমাত্রেরই মূলে কুঠারাঘাত করে। অপর পক্ষে এ বাণী মেনে নেবার জন্য এ যুগের ইউরোপের মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ইউরোপের মন একান্ত বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে, খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর তার প্রাচীন বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কোনো নূতন বিশ্বাস খুঁজে পায় নি। সুতরাং ওমরের কবিতায় বর্ত্তমান ইউরোপ তার নিজের মনের ছবিই দেখতে পেয়েছিল। এই হচ্ছে প্রথম কারণ—যার দরুণ ওমরের বাণী ইউরোপের মনকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছিল।

* * * *

তিনি আবিষ্কার করেছেন যে—

"সত্য ফলের আশায় মোরা মরছি খেটে রাত্রি দিন
মরণ-পারের ভাবনা ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন।
মৃত্যু-আঁধার মিনার হতে মুয়েজ্জিনের কণ্ঠ পাই—
মূর্খ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই।"

* * * *

ওমর খৈয়ামের মতে......আসল সত্য এই যে, জগৎও মিথ্যা, ব্রহ্মও মিথ্যা।"

* * * *

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। * * ব্রহ্ম মিথ্যা একথা ওমর কখনই বলেন নাই। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য,

এবং আর সমস্তই মিথ্যা, এই কথাই তিনি বারম্বার তাঁহার কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম আছে; নিশ্চয় আছে; ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যত সংশয়, যত প্রশ্ন, যত কলহ এই ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া মাত্র। ওমর লিখিয়াছেন,—

> কত্‌রা বেগ্‌রিস্ত কে আজ বহর জুদায়েম হামা।
> বহর বর্ কত্‌রা বেখন্দিদ কে মায়েম হামা।
> দর হকিকৎ দিগরে নিস্ত—খোদায়েম হামা।
> লায়েক আজ গরদশে এক নোক্তা জুদায়েম হামা॥

বিন্দু কাঁদিয়া কহিল, "হায়! আমি জলধি হইতে পৃথক হইলাম"। জলধি হাসিয়া কহিল, "আমি সর্ব্বব্যাপি"॥ সত্যই আর কিছুই নাই—শুধু আছেন খোদা। ঠিক যেন একটী বিন্দু বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এবং বস্তুতর বিন্দুর ন্যায় দেখাইতেছে॥

> গাহ্ গশ্‌তা নেহাঁ রু বাকসে না মুমায়ী।
> গাহ্ দর সুরে কৌন ও মকান পয়দায়ী॥
> ইঁ জলওয়াগরী বা খেশতন বেন্‌মায়ী।
> খুদ্ আইনে আইয়ানী ওখুদ্ বিনায়ী॥

মাঝে মাঝে তুমি বদনমণ্ডল সকল-চক্ষুর অন্তরাল কর। মাঝে মাঝে তুমি বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ কর॥ এই রহস্যের স্রষ্টাও তুমি দ্রষ্টাও তুমি। তুমিই দৃষ্টবস্তু, তুমিই দর্শন॥

ওমরের এইরূপ আরও অনেক রোবাইয়াৎ* আছে—যাহা হইতে

* হুইনফিল্ডের ওমর খৈয়ামের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৬৯, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৯০, ৪০২ প্রভৃতি সংখ্যক চতুষ্পদী।

স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ব্রহ্মের সত্ত্বা সম্বন্ধে ওমরের মনে কখনও কোন প্রশ্নের উদয় হয় নাই। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে ওমর খৈয়ামের কবিতা পারস্যে এবং ভারতবর্ষে অনাদৃত হওয়ার কারণ কি এবং তাঁহার কবিতার প্রতি অক্ষরে যে প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে সে প্রশ্ন কি? উত্তর হইতেছে এই যে, ওমর খৈয়াম জন্মিয়াছিলেন একাদশ শতাব্দীতে কিন্তু মনটী ছিল তাঁহার বিংশ শতাব্দীর। সেই জন্যই তিনি সেকালের লোকের নিকট উপযুক্ত সম্মান পান নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহ আমাদের চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাইতেছি। যাহারা আপনাদের সমসাময়িক সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া দূর ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় তাহাদিগকে হয় সমসাময়িকেরা পশ্চাতে টানিয়া ধরিয়া রাখে, না হয় তাহাদিগকে দলছাড়া একঘরে করিয়া নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখে। ওমর খৈয়াম বাস করিতেন নিশাপুরে। তথায় শাস্ত্রকারদিগের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে অনেককেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করিবার অভিযোগে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। ৪৮৯ হিজরিতে নিশাপুরে ধর্ম্ম লইয়া একটী ভীষণ অন্তর্বিগ্রহ হয়। বলা বাহুল্য যে যাঁহারা লোকের অন্ধ বিশ্বাস লইয়া ব্যবসা করেন, তাঁহারা খৈয়ামের মত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে আমল দিবেন না ইহা সুনিশ্চিত। ফলে ঘটিয়াও ছিল তাহাই। স্বল্প সংখ্যক গুণগ্রাহী সুধীজন ব্যতীত ওমরের কবিতাকে কেহ পছন্দ করিত না। এবং পরবর্ত্তী যুগ সমূহে এসিয়ার রাজনৈতিক গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সাহিত্য-জগতও ঘোর ঘনঘটায় আবৃত হইয়াছিল; কাজেই এসিয়াবাসী কেহ সাহিত্য-গগনের এই লুপ্ত তারকাটীকে খুঁজিয়া বাহির করে নাই—ইহাকে আবিষ্কার করিবার

গৌরব, অন্যান্য গৌরবের সহিত ইউরোপের ভাগ্যেই পড়িয়াছে। এই স্থলে ন্যায়ের অনুরোধে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এক পক্ষে শাস্ত্রকারগণ যেরূপ ওমরের প্রতি বিরাগী ছিলেন, ওমরও তাহাদিগকে তেমনি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ওমর অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ একটী উদ্ধৃত করা গেল :—

শেখে বা জনে ফাহেশা গোফ্‌তা—মস্তী।
হরলহজা বা দামে দীগর পা বস্তি॥
গোফতা, শেখা হর্ আঁচে গোফতি হস্তম্।
আম্মা তু চুঁনাঁকে মি নোমায়ী হস্তী?

বারনারীকে দেখিয়া শেখ বলিলেন, "তুই মাতাল। অনুক্ষণ তুই পরপুরুষ সহবাস করিস"॥ উত্তর করিল। হে শেখ! তুমি যাহা কিছু বলিলে সমস্তই সত্য। কিন্তু তুমি বাহিরে দেখিতে যেরূপ অন্তরেও কি তদ্রূপ?" ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অনেক ভণ্ডই এ পৃথিবীতে যশঃ মান খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করে।

এই শ্রেণীর আর একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আয় রফ্‌তা ও বাজ আমদা ও খম্ গশ্‌তা।
নামৎ জে মিয়ানে মর্দ্দমান গুম্ গশ্‌তা॥
খুর হামা জমা আমদা ও দুম্ গশ্‌তা।
রেশ আজ পসে কৌন আমদা ও দুম্ গশ্‌তা॥

তুমি প্রস্থান করিয়াছিলে এবং পুনরায় আসিয়াছ—চতুষ্পদ রূপ ধারণ করিয়া। মানব জাতির মধ্য হইতে তোমার নাম লুপ্ত হইয়াছে।

তোমার নখ জমাট হইয়া খুর হইয়াছে। তোমার শ্মশ্রু পশ্চাতে গিয়া লাঙ্গুলের আকার ধারণ করিয়াছে।

কথিত আছে খৈয়াম একটী গৰ্দ্দভ দেখিয়া এই কবিতাটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন। গৰ্দ্দভ নাকি পূর্ব্বজন্মে একটা মোল্লা ছিল—খৈয়াম তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, ওমর কোন্ সমস্যার অর্থ বোধ করিতে গিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিয়াছিলেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে সংশয়ের লেশমাত্রও ছিল না। কিন্তু এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি; এই জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি; আমরা কোথা হইতে আসি; কোথায় যাই; কেনই বা আসি; কেনই বা যাই; কেহ বা ভাগ্যবান হয় কেন; কেহ চোখের জলে বসন তিতাইয়া একটা দীর্ঘ হতাশের বোঝা বহিতে বহিতে মরে কেন, এ দু'দণ্ডের জীবনের অর্থ কি; ইহার মূল কি?—এই সকল প্রশ্ন ওমরের চিত্তে সর্ব্বদা জাগিত। এবং এই সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া তাঁহার কবিচিত্ত তাঁহার বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করিয়া বাহির হইবার জন্য সর্ব্বদা আকুলি বিকুলি করিত।

সয়ের আমদম্ আয় খোদা আজ পস্তিয়ে খেশ।
আজ তঙ্গ্ দেলি ও আজ তিহি দস্তিয়ে খেশ॥
আজ নিস্ত্ চুঁহস্ত্ মিকুনি বেরুঁ আর।
জিঁ নীস্তেম বা-হুর্‌মতে হস্তিয়ে খেশ।

"হে প্রভু! আমার এই হীন অবস্থায় আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই দুর্ভাগ্য, এই দারিদ্র্য॥ তুমি নাস্তি হইতে অস্তি সৃষ্টি

কর। তুমি আমাকে আনয়ন কর,—এই মায়াময় নাস্তি হইতে তোমার সত্তা অস্তির মধ্যে॥”

ব্রহ্মের স্বরূপ কি, ওমর কেন, সকল জিজ্ঞাসু হৃদয়েই এই প্রশ্নের উদয় হয়। আমাদের সৌভাগ্যই হউক, আর দুর্ভাগ্যই হউক আমরা সকলেই জন্মগ্রহণ করি হয় মুসলমান, না হয় খৃষ্টান, না হয় হিন্দু, না হয় বৌদ্ধ, না হয় আর কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া; অর্থাৎ আমাদের জন্মগত সংস্কারের সহিত কোন না কোন ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট থাকে।

তাহার পর আসে পারিবারিক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত সংস্কার। এবং এই সকলের সহিত থাকে ব্যবহারগত সংস্কার। এই সমস্ত সংস্কার মিলিয়া আমাদিগকে এক রকম করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহারা দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে এই সকল সংস্কারকে গ্রহণ করিতে পারে তাহারা শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে; আর যাহারা তাহা পারে না তাহাদের ওমরের মত দুর্গতি হয়। তাহাদের মনের মানুষটী বাহিরের মামুলি পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট না হইয়া জগতের অন্তরের প্রকৃত রহস্যের নগ্ন মূর্ত্তিটার অনুসন্ধানে বহির্গত হয় এবং তাহাদের লাভ হয় শুধু ব্যর্থ প্রয়াসের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। আর ওমরের মত কবির সেই শ্বাস বাহির হয় করুণ মর্ম্মভেদী কবিতার আকারে। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? তিনি কি কোরাণবর্ণিত আল্লা, না বাইবেল বর্ণিত গড, না ইহুদি-ধর্ম্মগ্রন্থ বর্ণিত জিহোভা? কবি লিখিতেছেন :—

বুৎখানা ও কাবা খানায়ে বন্দগীস্ত।
নাকুস জদন্ তরানায়ে বন্দগীস্ত॥
জন্নার ও কলীসায় ও তসবিহ্ ও সলিব।
হক্কা কে হামা নেশানায়ে বন্দগীস্ত॥

মন্দির এবং মস্‌জিদ উভয় উপাসনা গৃহ, গির্জ্জার ঘণ্টার শব্দ উপাসনা করিতেই আহ্বান করে, গির্জ্জা এবং মস্‌জিদ, তস্‌বি এবং জপমালা, প্রকৃতপক্ষে সমস্তই তাঁহারি আরাধনার জন্য।

সত্য সত্যই কি পাপী নরক ভোগ করিবে এবং পুণ্যাত্মা স্বর্গবাসী হইবে?

দর স্থমা' ও মাদ্রাসা ও দায়ের ও কনিশ্‌ত।
তরসন্দা জে দোজখন্দ ও জোয়েয়ায়ে বেহিশ্‌ত॥
আঁকস্‌ কে জে আসরারে খোদা বা খবর আস্ত্‌।
জিঁ তোখম দর আন্দরূণে খুদ হিচ নাকিশ্‌ত॥

ইহুদি, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মমন্দিরে ও বিদ্যালয়ে, মানুষ স্বর্গের সুখ লাভ এবং নরক-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের পন্থা অন্বেষণ করে। কিন্তু যে খোদার রহস্য ভেদ করিয়াছে, সে এই সকল মূর্খতা হইতে আপনাকে রক্ষা করে।

মুসলমানধর্ম্ম বলিতেছে এই ধর্ম্ম সত্য অন্য ধর্ম্ম মিথ্যা। আবার খৃষ্টানেরা বলিতেছে খৃষ্টধর্ম্ম একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম নরকের পথ প্রদর্শন করে। যাঁহারা অগ্নি উপাসক তাহাদের ব্রহ্মই বা কিরূপ? আবার যাহারা পুতুল পূজা করে তাহাদের ব্রহ্মের সহিতই বা সত্য পরমব্রহ্মের সম্পার্ক কি? ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যর্থ, তাহা আদিমকাল হইতে মানুষ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। ওমর সে কথা জানিতেন।

দর্‌ পর্দ্দায়ে আস্‌রার কসে রা রাহ্‌ নিস্ত্‌।
জীঁ তা'বিয়া জানে হিচ কস্‌ আগা নিস্ত্‌॥
জুজ্‌ দর দেলে থাকে তিরা মনজেল গাহ্‌ নিস্ত্‌।
আফসোস্‌ কে ইঁ ফসনহা কোতা নিস্ত্‌॥

এই পর্দ্দার অন্তরালে কাহারও গতিবিধি নাই। মর্ত্ত্য মানব কেহই এই রহস্য অবগত নহে॥ মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকার গৃহে মানবের শেষ গতি।—হায়! হায়! এই দুঃখের কাহিনীর অন্ত নাই॥

কিন্তু এ জ্ঞান থাকিয়াও মানব অজ্ঞান। ভালবাসা যেমন মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও তেমনি। ভালবাসিয়া নিরাশার ফসল অর্জ্জন ব্যতীত আর কিছু লাভ হইবে না জানিয়াও যেমন শত শত গুণী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভালবাসায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তেমনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যর্থ জানিয়াও সহস্র সহস্র মানব এই চিন্তায় অহরহ জর্জ্জরিত ও ক্লিষ্ট হইয়াও এই চিন্তা হইতে বিরত হইতেছে না। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আর এক নাম হইতেছে বিশ্বসৃষ্টির গূঢ় রহস্য কি তাহা উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা। এই রহস্য যুগে যুগে, সকল জাতির, সকল মানবের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এই দুটী প্রশ্ন যেমন একাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি ওমরের মনে জাগিত, তেমনি বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি টেনিসনের মনেও উদয় হইয়াছিল। টেনিসন তাঁহার In Memoriam-এ লিখিয়াছেন:—

O life as futile then, as frail !
O for thy voice to soothe and bless !
What hope of answer or redress ?
Behind the veil, behind the veil,

ওমর লিখিয়াছেনঃ—

আস্‌রারে আজল রা না তু দানি ও না মন্।
ও ইঁ হর্‌ফে মোয়েম্মা না তু খানি ও না মন্॥

হস্ত আজ পসে পর্দ্দা গোফ্‌তো গুয়ে মন ও তু।
চু পর্দ্দা বেরাফ্‌তন্দ না তু মানিও ন মন॥

ফিজ্‌ জিরেল্ড অনুবাদ করিয়াছেন :—

There was a door to which
I found no key
There was a veil past which
I could not see!
Some little talk awhile
of Me and Thee
Thou seemest—and then no
more of thee and me,

কান্তি বাবু অনুবাদ করিয়াছেন :—

রুদ্ধ-দুয়ার জীবন ঘরের কুঞ্জিকাটির নাইকো খোঁজ,
দেখ্‌তে না পাই ভাগ্য-বধূর ঘোমটা-ঢাকা মুখ-সরোজ ;
বারেক দুবার কণ্ঠে কাহার শুন্‌ছি শুধু নামটা মোর—
কয়দিনই বা ?—সাঙ্গ তো হয় সর্ব্বনামের নেশার ঘোর !

কিন্তু টেনিসন এই behind the veil এই পর্দ্দার অন্তরালটাকে settled fact চূড়ান্ত নিষ্পত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। আর ওমর ইহাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার হতাশ রোদনধ্বনি এখনও মানবের কর্ণে পশিয়া তাহার হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

ওমরের কবিতায় কেহ কেহ কেবল মদিরার গন্ধ আর রূপসীর পাৎলা ঠোঁটের জিয়ান-রসের স্বাদ পাইয়াছেন, কিন্তু ওমর খৈয়াম যেমন 'ব্রহ্ম মিথ্যা' কখনও বলেন নাই, তেমন শুধু নাচ, গান, পান করার তথ্য প্রচার করার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইত তাহা হইলে তাঁহার কবিতা ব্যর্থ হইত ও নিকৃষ্টতর হইত। প্রকৃত পক্ষে এ কবিতাগুলি অভিমানের ও বিদ্রোহের কবিতা। কবি বলিতেছেন, "হে শাস্ত্রকার, তুমি আমাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারিবেনা অথচ আমাকে শত সহস্র 'না'র মধ্যে জড়াইয়া আমার জীবনটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে—তাহা হইবে না। আমি তোমার কথা মানিব না। হে আমার চিত্ত! তুমি কেন বৃথা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়া কষ্ট পাইতেছ? এস বিশ্রাম কর। অর্থহীন তর্ক ছাড়িয়া দিয়া চল আমরা নিভৃতে গিয়া কোনও তরুণীর অধর সুধা পান করিয়া শ্রান্তি দূর করি।"

কিন্তু ওমরের চিত্ত কি এই আহ্বান শুনিয়াছিল? ওমর কি আপন ইন্দ্রিয়ের সেবায় মগ্ন হইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বিস্মরণ হইয়াছিলেন?—না, তাহা নহে। এ ক্ষণিকের বিদ্রোহের পরেই আবার মন সেই পুরাতন চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইত। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত তখন এক একবার হৃদয়ে বিরক্তির উদয় হইত এবং তখনই এই শ্রেণীর কবিতার জন্ম হইত।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন ধর্ম্মমতের বিরোধী ওমরের জীবনের প্রধানতম সমস্যা ছিল। এই বিরোধের মধ্যে সত্যিকার ব্রহ্মের স্থান কোথায়? এক স্থানে কবি লিখিতেছেন:—

বুৎ গোফ্‌ত বা বুৎ পরস্ত্‌ কা'য়ে আবেদে মা।
দানি জে চেরুয়ে গশ্‌তাই সাজেদে মা॥
বর মা বাজমালে খুদ্‌ তজল্লি করদস্ত্‌।
আঁকস্‌কে জে তুস্ত নাজের আয় সাহেদেমা॥

মূর্ত্তি তাহার উপাসককে জিজ্ঞাসা করিল, "হে আমার উপাসক! তুমি জান কি, কেমন করিয়া তুমি আমার উপাসক হইলে? ইহার রহস্য হইতেছে এই যে যিনি তোমার নয়নের ভিতর দিয়া আমায় দেখিতেছেন, একদিন তিনি আমায় তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছটায় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

অপর এক স্থানে কবি লিখিতেছেন,—

"বাতু বাখারাবাত আগর গোয়েম রাজ।
বেহ্‌ জাঁকে কুনম্‌ বেতু বামেহ্‌রাব নমাজ॥
আয় আউয়াল ও আখেরে হামা খলকান তু।
খাহি তু মরা বেসোজ ও খাহি বেনওয়াজ্‌।

"এই তো জানি বন্ধু আমার—সত্য জ্যোতির প্রকাশটুক্‌
—রাগেই কিম্বা প্রেমেই ফুটে—ভরায় যা মোর আঁধার বুক,
নিমেষ তরে পাই যদি তার আভাসটা মোর পান্‌শালায়
আঁধার-ঘেরা মন্দিরেতে কেনই যাব—কোন্‌ জ্বালায়!"

ওমর চাহিয়াছিলেন ধর্ম্মের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যের সাক্ষাৎ পাইতে। সে সাক্ষাৎকার লাভ তাঁহার ঘটে নাই;—ঘটা সম্ভবও ছিল না, কেননা সে সত্য এতই উজ্জ্বল এতই তেজোময় যে

পয়গম্বর মুসার চক্ষুও উহা দেখিতে গিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তুর পর্ব্বতও উহাকে সহ্য করিতে না পারিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

নিয়তি এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার চিরন্তন দ্বন্দ্বও ওমরকে সতত ত্যক্ত করিত। তিনি লিখিতেছেন ;—

আয় রফ্‌তা বাচৌগানে কজা হামচুঁ গো।
চপ্‌ মি খুরদ্‌ ও রাস্ত রও হিচ মগো॥
কাঁকস্‌কে তোরা আফগন্দ আন্দর-তগ্‌ ও পো।
উদানদ্‌ উদানদ্‌ উদানদ্‌ উ॥

"নাইকো পাশার ইচ্ছাস্বাধীন—যেই নিয়েছে খেলায় তার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেলছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য-খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু,—জয় পরাজয় তাঁরই হাত।"

তবে স্বর্গ নরক কেন? তবে তিরস্কার পুরস্কার কেন? তবে মানুষকে কৃতকর্ম্মের জন্য বিচারের কষ্টভোগ করিতে হইবে কেন?

বস্তুতঃ ওমরের দর্শন—ব্রহ্মমিথ্যা, ইন্দ্রিয়গোচর অনিত্যকে যথাসম্ভব উপভোগ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য—এই শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ওমর কোনও মত প্রচার করিবার জন্য কবিতা লিখেন নাই। তাঁহার কবিতা তাঁহার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সকল কবিতা তাঁহার ব্যর্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার তপ্ত-দীর্ঘশ্বাস মাত্র। কিন্তু এ জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নহে, এ জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে।

উপসংহারে আমি সাহিত্যামোদী সকলকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন ওমরের এই অমর কবিতাবলী একবার পাঠ করেন। যাঁহারা মূল পার্‌শি পাঠে অপারগ তাঁহারা যেন কান্তি বাবুর অনুবাদখানি পড়েন। যাঁহারা মূল পার্‌শি পড়িতে পারেন তাঁহারাও যেন কান্তি বাবুর অনুবাদখানি পড়িতে না ভুলেন। এবং যাঁহারা মূল না পড়িয়াও ওমরের কবিতা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা যেন ই, এইচ হুইনফিল্ডের ওমর খৈয়ামের ভূমিকা পড়িয়া দেখেন।

তরিকুল আলম।

টীকা ও টিপ্পনি।

——:o:——

আমার লেখার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে তথা-কথিত সাধুভাষার বিরুদ্ধে আমার একটি বিশেষ অভিযোগ এই যে, সে ভাষা অশুদ্ধ। সাধু লেখনীর দৌরাত্ম্যে সংস্কৃত শব্দসকল এত পীড়িত হয় যে সে সকল শব্দ যদি মৃত না হত ত পাঠকেরা এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। সংস্কৃত শব্দের অপ-প্রয়োগ ও দুষ্ট-প্রয়োগ আমার কাছে এতই বিরক্তিকর যে এ বিষয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমপ্রমাদও আমি আর্ষপ্রয়োগ বলে শিরোধার্য্য করে নিতে পারি নি। ভাষা সম্বন্ধে আমি একজন শুচিবাতিক গ্রস্ত লোক।

সমাজের পক্ষে কোনোরূপ বাতিকেরই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কেননা বাতিকগ্রস্ত লোক প্রায়ই একদেশদর্শী হয়ে ওঠেন। যে বিষয়ে মানুষের বাতিক আছে সে বিষয়ের একটা দিকে তার চোখ এত বেশি করে পড়ে যে তার যে আর একটা দিক আছে তা সে দেখতেই পায় না। যাকে আমরা তীক্ষ্ণদৃষ্টি বলি আসলে তা সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি। অতএব যিনি আমাদের এ বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে পারেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিতে আমরা বাধ্য।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেন :—

"যখন কেহ বলে 'সংস্কৃতভাষায় এরূপ প্রয়োগ কখনো দেখি নাই' তখন সে 'সংস্কৃত সাহিত্য' অর্থেই 'সংস্কৃতভাষা' প্রয়োগ করে। এরূপ প্রয়োগ যে খুব সাধু নহে তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু কোনও সজীব ভাষায় বহুলোক যদি পুনঃ পুনঃ একটি শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করে তবে ক্রমশঃ ঐ অর্থে উক্ত শব্দের সহিতে প্রয়োগের অধিকার লব্ধ হয়। কথাটা শুনিতে হয়ত হেঁয়ালির মত শুনাইবে, তথাপি ইহা ঠিক যে, ভ্রম, প্রমাদ ও আলস্যেও ভাষার পুষ্টি হয়।"

(ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, মাঘ—১৩২৬ পৃ, ১৬৮)।

* * * * *

উপরোক্ত কথা কটি যে সত্য সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। একই শব্দের যে বাঙলা ও সংস্কৃত অর্থ বিভিন্ন, এর ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ দেখানো যায়। এবং এর মধ্যে বহু শব্দ যে তাদের সংস্কৃত অর্থ বর্জ্জন করে বাঙলা অর্থ অর্জ্জন করেছে তার মূলে আছে ভ্রম, প্রমাদ ও আলস্য। চরিত্র না বদলালে চেহারা বজায় রেখে সে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙলাভাষায় স্থান পেত না। এক ভাষার পক্ষে অপর ভাষার কথা ধার করা যত সহজ, এক জাতির পক্ষে আর জাতির মনোভাব চুরি করা তত সহজ নয়। এবং এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে পরভাষার শব্দের অর্থ আপনার মনের মত করে বদলে নিতে না পারলে সে শব্দ কোনোজাতিই আত্মসাৎ করতে পারেন না। আর যা আমরা আত্মসাৎ করতে পারি নে তা নিজস্ব হয় না, পরস্বই থেকে যায়।

কবিরত্ন মহাশয়ের মত গ্রাহ্য করি বলে আমি আমার নিজের মত ত্যাগ করতে বাধ্য নই। কেন ?—তা বোঝাবার চেষ্টা করছি।

কবিরত্ন মহাশয় বলেছেন যে "সাহিত্য" অর্থে "ভাষা" ও "ভাষা" অর্থে "সাহিত্য" শব্দের প্রয়োগ সাধু নয়। তাঁর এই মতের উপরই তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদের প্রতিষ্ঠা করছি। স্বীকার করলুম যে ভ্রম প্রমাদ ও আলস্যেও ভাষার পুষ্টি হয়; কিন্তু তাই বলে এ কথা স্বীকার করতে পারি নে যে ভ্রম প্রমাদ ও আলস্যে সাহিত্যের পুষ্টি হয়। ভাষা গড়ে ওঠে বহুযুগ ধরে বহুলোকের মুখে, কিন্তু সাহিত্য গড়ে তোলে একটি সময়ে একটি লোকে। ভাষাসৃষ্টি করে জাতি আর সাহিত্যসৃষ্টি করে ব্যক্তি। এ দুই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও উপায় বিভিন্ন। সকলের কাছে ভাষা জীবনযাত্রার সহায় বলেই মূল্যবান, সাহিত্যে তা ভাবের প্রকাশক বলেই মূল্যবান। লৌকিকভাষা কর্ম্মকাণ্ডের, আর সাহিত্যের ভাষা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভূত। সাহিত্য রচনা করতে হয় সজ্ঞানে, ভ্রম প্রমাদ আলস্য সে রচনার পুষ্টি সাধন করতে পারে না। সুতরাং সংস্কৃত শব্দের অপ-প্রয়োগ দুষ্ট-প্রয়োগ প্রভৃতি বাঙলা সাহিত্যে অমার্জ্জনীয়। এ উপায়ে কোনো লেখক সাহিত্যের ভাষার কিছুতেই পুষ্টিসাধন করতে পারেন না, কেননা তাঁর ভ্রম অপরে আত্মসাৎ করবে না। মেধাতিথি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, সাহিত্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। তাঁর মতে—"একের ভ্রান্তি জগৎভ্রান্ত করতে পারে না"। সাধুভাষার লেখকেরা এই বাক্যটি স্মরণ রাখলে বাঙলা সাহিত্য পড়ে আমাদের আর খুঁত খুঁত করতে হবে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

উপকথা।

—:*:—

বৃদ্ধ জেলে আর তার ছোট্ট ছেলে ভেলায় চড়ে' রোজ রাত্তিরে সমুদ্রে যায় মাছ ধরতে। ভেলার গলুয়ের কাছে বসে' জেলে তার জাল ফেলে আর মনে মনে ভাবে—কত না মাছ আজ সে ধরবে—কত রকমের—আর তাই সে বাজারে বেচ্‌বে কত চড়া দামে। ছেলেটা ভেলার পিছনে বসে' থাকে হাল ধরে'—আর তার দৃষ্টি থাকে সেখানে যেখানে ঢেউগুলো উঠছে পড়ছে এঁকৃছে বেঁকৃছে—আঁধার রাতে যখন পুঞ্জ ফেনার লম্বা রেখা উজ্জ্বল নীল আলো গায়ে জড়িয়ে অনেক দুর থেকে ছল্ ছল্ ছল্ ছল্ করে' দৌড়ে এসে ভেলার গায়ে ছনাৎ করে' ভেঙে পড়ে'—যেন রাশি রাশি চূর্ণ হীরা চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, তখন সে ভাবে এসব কি? যখন চাঁদ্‌নী রাতে ফণার মত ঢেউয়ের মাথাগুলো চিকমিকিয়ে ওঠে—যেন ছোট ছোট পরীর মেয়েরা রূপোলি আঁচলে বুক ঢেকে হেসে কুটি কুটি হ'য়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, তখন ছোট ছেলেটা ভাবে, এই ত আসল।

এমনি ক'রে দিন কাটে। ছোট্ট ছেলেটি বড় হ'তে থাকে আর সেই সঙ্গে তার নিজের চোখের আলোও নিভে আসতে থাকে। চাঁদ্‌নী রাতে সে ঝাপসা দেখতে সুরু করে, আঁধার রাত তার কাছে

কেবল নিবিড় কালো হ'য়ে ধরা দেয়। দিনের আলো ছাড়া আর তার কাছে আলো নেই। সেই দিনের আলোর মাঝে সমস্ত বস্তু তার বস্তুত্বের পরিসমাপ্তি নিয়ে তার চোখের আগে ধরা দেয়। ছোট্ট ছেলেটি কেমন একটা অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে, মনে করে' কি যেন সে হারাতে হারাতে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। এই হারানো থেকে কি কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না? ক্রমে ক্রমে সে আরও বড় হয়ে ওঠে, হাল ছেড়ে সে জাল ফেলতে লেগে যায়, আবার সেও তেমনি করে ভাবতে সুরু করে—কত মাছই না সে ধরবে—কত রকমের, আর তাই সে বাজারে বেচবে কত চড়া দামে। তার চোখের সামনে সব কেমন বাস্তব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন সে ভাবে ছেলে বেলায় সে কি স্বপ্ন দেখেই না সময় নষ্ট করেছে। ধীরে ধীরে তার মনে মাছের হিসেবই বেশি চলে, তার মনের এপিঠ-ওপিঠ আনাচে-কানাচে কড়ির হিসেব দিয়ে ভরে যায়, তখন আর তার সে ছেলেবেলাকার স্বপ্নের কথা মনেই আসে না।

কিন্তু ঐ যে তার নিজের ছোট্ট ছেলেটি আবার আজ ভেলার পিছনে হাল ধরে বসে' তার নতুন চোখের তরুণ দৃষ্টির সামনে সাগরের নীল জল শাঁদা ফেনা চাঁদ্‌নী রাতের সোহাগ আবার তেমনি স্বপ্নের জাল মেলে দিয়েছে। ভেলার সামনে কড়ির হিসেব, ভেলার পিছনে বে-হিসেবী স্বপ্ন।

আবার এই ছোট্ট ছেলেটিও বড় হ'য়ে মাছের হিসেব করতে বসে যায়। আবার তার ছোট্ট ছেলেটি স্বপ্নের উদ্দেশ করতে জেগে ওঠে। ভেলার সামনেকার কড়ির হিসেব থামে না, তার পিছনের বে-হিসেবী স্বপ্নের জালেরও শেষ পাওয়া যায় না।

সাগরবুকে আবহমানকাল এমনি খেলা চলছে। আর তীরের ঝাপসা গাছেরা তাদের মাথা হেলিয়ে আবহমানকাল ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, ওগো কোন্‌টা সত্যি—এ দু'য়ের কোন্‌টা অশান্ত সাগর আবহমানকাল পৃথিবীর পায়ে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বলছে—সত্যি! ওগো ও-দুই-ই সত্যি—ও-দুই-ই!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মন বদলানো।

—•:•—

বীরবল উপদেশ দিয়াছেন—"আমরা যদি সত্য সত্যই স্বজাতিকে "স্বরাট" করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হবে নিজের নিজের মন বদলানো, চরিত্র বদলানো এবং তার জন্য চাই বহু পূর্ব্ব-সংস্কার, বহু অভ্যস্ত মত, বহু সঙ্কীর্ণ ধারণা বর্জ্জন করা"।

তা যদি হয় তাহলে বাঙলা মাসিকপত্রে হালে যে একটা ফ্যাশান দাঁড়াইয়াছে, সময়ে অসময়ে "East is east" কোট করিয়া কিপ্‌লিং-কে গালমন্দ বলা, সেই অভ্যাসটিও আমাদের বদলাতে হয়।

কারণ কিপ্‌লিং কি কেবলমাত্র Rudyard Kipling? ইংরাজ নামক যে এক আশ্চর্য্য মানবসংঘ কোন্‌ তিমির হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া শতাব্দীতে শতাব্দীতে আপনার পাপ্‌ড়িগুলি দিকে দিগন্তে ছড়াইয়া দিল, যার হৃন্মর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া এক বিশেষ সৌগন্ধ মানবের চিরন্তন ভাণ্ডারে জমা হইয়া গেল, বিশ্বমানবের দরবারে যার বক্তব্য শেষ হইতে হয় ত এখনো বাকী আছে। হইতে পারে অদ্য তার মঙ্গলশঙ্খ "ধূলায় পড়ে," এবং বীণা নীরব হইয়া গেছে, হইতে পারে কিপ্‌লিং তার জয়ঢাক—কিন্তু যে বাঁচিয়া আছে তার হাতে জয়ঢাকে কি করিয়া মৃদঙ্গের বোল উঠিতে পার তার প্রমাণ "Reces-soinal"

*   *   *   *

"If drunk with sight of power, we loose
Wild tongues that have not thee in awe,—
Such boasting as the gentiles use,
Or lesser breeds within the Law,—
Lord God of Hosts, be with us yet,
Lest we forget—lest we forget!

For heathen heart that puts her trust
In reeking tube and iron shard,—
All valiant dust that builds on dust,
And guarding, calls not thee to guard,—
For frantic boast and foolish word,
Thy mercy on thy people, Lord!

Amen."

(২)

আসল কথা যে-মন জীবিত, সে যেমন বলের সঙ্গে কাড়ে, তেমনি বলের সঙ্গে ছাড়ে। শান্ত নির্ম্মল ঊষা যেমন করিয়া ধীরে রৌদ্র-করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নের মধ্যে পরিণতি লাভ করে, সত্ব তেমনি অলক্ষিতে রজে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। আকাশের বিপুল অবকাশের মধ্যে যে রশ্মি স্নিগ্ধ জ্বালাহীন, তা-ই ধরণীতে নামিয়া খরতাপ শোষক। জীবিত ভারতবর্ষে তাই ত্যাগ সত্য, রাজ্যেশ্বর যার পদানত সে বসনহীন

সন্ন্যাসী। তামসিকতার রিক্ততা লুব্ধ কুণ্ঠিত, "কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়"; শাকান্নের জন্য দ্বার হইতে দ্বারে বিতাড়িত, দারিদ্র্য ও অপমান স্বেচ্ছাবৃত নয়, ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষিপ্ত ও পুঞ্জে পুঞ্জে স্তূপীকৃত। তার প্রণিপাত একদিকে Lord of Ghosts-কে, অপরদিকে host of পাইক-বরকন্দাজকে। সে যেমন একদিকে আধ্যাত্মিকতার মদে মত্ত, অপরদিকে সব-চেয়ে দেহাত্মবাদী; "কামান-ধূম্র এবং রাষ্ট্র গৌরবের" পরে তার শ্রদ্ধা সব চেয়ে বেশি।

মনোরাজ্যে সমুদয় আবর্জ্জনাকে পরম সম্পত্তি বলিয়া ধারণা ও ধারণ করিবার যে প্রবৃত্তি তাই হচ্ছে চরম conservatism—এবং বীরবল ইহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন।

(৩)

"Vested Interest" হইতেছে নবীনের প্রধান ও প্রথম বাধা।

সেদিন শোনা গেল একদল রায়ত তাদের জমিদারকে যাইয়া বলিল, সদর-খাজনা যা পাঠান, তা আমরাই নিজ হাতে সরকারকে দিচ্ছি। কি ধর্ম্মে কি রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই মধ্যবর্ত্তী জনগণ মনঃপরিবর্ত্তনের প্রবল বিরোধী। কেননা তারও ত বাঁচা চাই—অনধিকারীর অনধিকার ও নাবালকের বয়ঃকনিষ্ঠতা তার অস্তিত্বের ওজর। পুরুত আসলে জমিদারের প্রধান পাইক—কেননা পুরুতের রাজ্য মানুষের মনে। এই কারণে সব দেশে সব কালে জমিদার পুরুতকে হাতে রাখিয়াছে। এবং বৈদেশিক ব্যুরোক্রাসি তাজমহলে হস্তক্ষেপ করিলেও কালীঘাটে করে নাই—কেননা কালীঘাট ফোর্ট উইলিয়মের

চেয়ে তার কম বড় দুর্গ নয়। Toleration নাস্তিকেও করে, এবং শ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা দুই-ই সমভাবেই তার কারণ হইতে পারে, এবং ও হচ্ছে পলিশির সেরা পলিশি।

এখন অদৃষ্টের বিধানে এই মধ্যবর্ত্তীদের হাতে সমুদয় ক্ষমতা রহিয়াছে—এবং তাদের প্রধান খুঁটা রহিয়াছে মানবমনের একটি অতি সাধারণ সত্যের উপর—সে হচ্ছে নতুনের প্রতি একটা সংস্কার-গত অবিশ্বাস। শিশুটি অপরিচিতের কোলে যাইবে না। যুগে যুগে বহু মানবের পায়ে পায়ে, "line of least resistance" ধরিয়া, যে পথ তৈরি হইয়াছে তাই সব চেয়ে সুবিধাজনক পথ হইবার সম্ভব, তাকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? নিজেকে সে পথে খাপ খাওয়াইতে না পারিলে কেবল আপনারই অক্ষমতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রমাণ করা হয়। এবং সে অবস্থাতে দশজনের মত হইয়া চলিতে শেখা-ই জীবনের সাধনা হওয়া উচিত। অনেক লোকে যেখানে একমত সেখানেই ত বিজ্ঞতা।

(৪)

এদেশে অন্ত যদি কোনো একটা সত্যকে আর একটার চেয়ে বেশি করিয়া প্রচার করিবার দরকার উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তা এই যে, wisdom আর truth আলাহিদা পদার্থ, এবং আয়তন ও সংখ্যার হিসাবে সত্যের মাপ হয় না। সত্য হচ্ছে একটি স্ফুলিঙ্গ যার কার্য্যাবলী আদপেই বুদ্ধিমানের মত নয়, এবং যার চেহারাও নেহাইৎ-ই দোহারা। তবু,

"মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।"

"ন যদিদম্ ইমে উপাসতে," জনবর্গের সুমুখে যা বাস্তবিকরূপে গোচর, তা-ই সত্য না-ও হইতে পারে। সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়াও আরব্য উপন্যাসের "সাগরের বুড়ো"। তাকে মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ করা চলিবে না। সে জীবনের মত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক। সে ভিতর হইতে আপনার জড়-কায়াকে চিরকাল নির্ম্মাণ করিতে করিতে চলিয়াছে—সে এক মুহূর্ত্ত থামিলে "উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর" ভারে। এদেশে সেই বস্তুপুঞ্জই পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে। কে না জানে ভারতবর্ষের সভ্যতা আজ এক সুবিপুল debris—সে তার ঐতিহাসিকতাতে চমৎকারী হইতে পারে, আসলে কিন্তু প্রাণহীন আচারপরম্পরা।

(৫)

"অনেকদিন পরাণহীন ধরণী"। ফাল্গুনে সত্যের আগমনে যদি ধরণীর নাড়ীর মধ্যে জীবনের স্পন্দন সুরু হইতে পারে, তবে এ জাতের Inertia কি ভাঙিবে না? চাই গতির প্রেরণা। কিন্তু ধাক্কা কোথায় প্রথম পড়িবে, সেই হচ্ছে প্রশ্ন।

ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির পিঞ্জর-মুক্তি যেন ঘটিল এবং সকলেই জানেন intellectual awakening এদেশে ঘটিয়াছে। এবং সম্ভবত এদেশের

বুদ্ধি কোনো কালেই অসাড় হইয়া ঘুমাইয়া ছিল না। আসল ব্যাধি মনের নয়, চরিত্রের। "ন চ মে প্রবৃত্তিঃ"-ই যে এ-দেশের ইতিহাসের ট্র্যাজেডি-র গোড়া, এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহমাত্র নাই। "প্রবৃত্তি"-র গোড়ায় আছে "নিবৃত্তিঃ"—সংহতি এবং প্রসার যেমন জড়িত—এবং নিবৃত্ত হইতে চাহিলেও কেন যে নিবৃত্ত হইতে আসলে পারা যায় না, সেটা হচ্ছে মানুষের নৈতিক জীবনের প্রশ্ন। অন্য সকল প্রশ্নের সার প্রশ্ন এই যে, মানবজীবনের ও-প্রশ্ন কেবলমাত্র destructive উপায়ে, কেবলমাত্র সংস্কারবর্জ্জন করিয়া সমাহিত হইবে কি না? কোনো নব সংস্কার অর্জ্জনের দরকার আছে কি না? এদেশের রাজ-নীতির হিসাবে অগ্রগামী-দলের কার্য্যকলাপের সম্বন্ধে অপবাদ এই যে তাঁরা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চলেন সুমুখের পানে, সমাজের ক্ষেত্রে বিদেহী আত্মাদের মত উল্‌টা দিকে, পিছনে। আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ আসলে বই-এর একই পাতারই দুই পৃষ্ঠা, ঠেলা-ই কি প্রকারে টানার চেহারা লয় তা জড় বিজ্ঞানের এক মূলসূত্র। সমাজের মন্দিরে ব্যক্তিকে বলি দেওয়ার মনোভাব, এবং India—Right or wrong এর মটো'র প্রেরণার মধ্যে তফাৎ কোনখানে? ভারতবর্ষ যদি বাঁচিয়া থাকে তবে মরিতে নয়, কিন্তু কোটী কল্প নরকে বাস করিতে প্রস্তুত। আর, হিন্দুসমাজ যদি বাঁচিয়া থাকে তবে বিধবা কাঁদুক, জ্ঞানের ক্ষুধায় অস্থির যুবক সমাজ কারাগারে আবদ্ধ থাকুক, জীবনের সকল প্রিয় ইচ্ছা গভীর কামনা রক্তজবার মত' শাস্ত্রের প্রস্তর বেদীর উপর অবলুণ্ঠিত হোক! মানুষকে নিষ্ঠাবান সমাজধর্ম্মপরায়ণ করিয়া দেখা আর পেট্রিয়ট্ করিয়া দেখা—এই উভয় দেখাই মানুষকে "উপায়" স্বরূপে দেখা। এই জন্যই এক জনের আয়োজন মানুষকে অতি-

বিশদজটিল তন্ত্রমন্ত্রের সুতায় পুঁৎলা নাচাইবার, আর এক জনের আয়োজন কুচ্‌কাওয়াজের গুঁতায় মানুষ-মারা যন্ত্র বানাইবার। নিষ্ঠার প্যারাডক্স্‌ এই যে তার সমুদয় দোহাই আধ্যাত্মিকতার, অথচ সে দাঁড়াইয়া আছে দেহাত্মবাদের উপরে, কেননা সত্যের প্রাণের সঙ্গে তার অপরিচয়, বস্তুর আয়তন লইয়াই তার যত কারবার।

এই সত্য জানাই সব চেয়ে বেশি দরকার হইয়াছে যে, মানুষ "উপায়" নয় কিন্তু নিজেই এক উদ্দেশ্য। "Know ye the truth, and the truth shall make you free." "আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা।" যুগ-যুগান্তর হইতে লক্ষযোজন দূরের তারকা যে কিরণের দূত পাঠাইয়া দিয়াছে, সে এই মাটির পৃথিবীতে নামিবে আমারই চোখে অঞ্জন পরাইবে বলিয়া। "কত কালের সকাল সাঁঝে" লোকে লোকান্তরে কত সুখে দুঃখে, কত বেদনায় ভুবনপ্লাবী জীবধারায় প্রতি নিমিষের বক্ষঃস্পন্দনের মধ্যে যে "চরণ ধ্বনি" বাজিয়াছে সে আমারই "বিজন ঘরের" দিকে এক নিভৃত সমারোহের দীর্ঘ অভিযান। সমস্ত ইতিহাস কিসের শাঁখ বাজাইতেছে? সমস্ত মানবের পরম সুখের বেদনা ও পরম দুঃখের সাধনা যদি না আমার জন্যই সঞ্চিত হইয়া রহিল, তবে এই দু'দণ্ডের নাট্যলীলার নিজের মধ্যে নিজের কোনো মানে নাই।

ভারতবর্ষে এক সময়ে প্রতি-মানবের এই চরম destiny-র বোধ জাগ্রত হইল বলিয়া, জীবনী-শক্তি যেমন করিয়া দেহকে ভিতর হইতে অভিব্যক্ত করিয়া তোলে এক অবিভ্যক্ত সমগ্রতার মধ্যে, যেখানে— গানের মধ্যে সুরগুলি যেমন সমঞ্জসীকৃত, তেমনি—প্রত্যেক আলাদা অঙ্গ আপন আপন ক্রিয়াগুলিকে স্বত-ই এক অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের দিকে

অভিমুখীন করিয়া রাখিয়াছে,—ঠিক তেমনি ভারত-মনীষার গর্ভের মধ্য হইতে, হঠাৎ একদিন নয় কিন্তু কালে কালে, এক বিচিত্র সমাজ-ব্যবস্থা জন্মলাভ করিল। বর্ণাশ্রম তাই তখন স্থিতিস্থাপক ছিল—উদ্দেশ্য তখন জাগ্রত ছিল বলিয়া উদ্দেশ্যে পৌঁছানটাই সব চেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল—মৃত্যুর লক্ষণই হইতেছে, অ-নমনীয়তা, rigidity.

অতএব যদি ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও জাতির জীবনের সমস্যা গোড়াতে এক হয়, তবে এমন একজন বা একদল ব্যক্তির দরকার যিনি বা যাঁরা, আমাদের নেতাদের মত' দোদুল্যমান pendant নন। কিম্বা ব্যক্তির জীবনের গভীরতর সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনমাত্র নন, কিন্তু এ দুয়ের সমাধানের প্রয়াসে সমস্ত জীবন-মন নিয়োগ করিতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষের আসল সমস্যা, বাঙলায় বলিতে গেলে, ধর্ম্মের সমস্যা। ও শব্দটি ব্যবহারের মুস্কিল এই যে বঙ্গভাষার অপর অনেক শব্দের মত ও-শব্দটিও অতিব্যবহারের দরুণ লুপ্তার্থ। অনন্তকোটী নক্ষত্রের মাঝখানে পর্য্যায়ক্রমে রৌদ্রে ছায়ায় ঘেরাও এক মৃৎ-গোলকের উপরে ও ইতর জন্তু-পুঞ্জের মাঝখানে মননশীল মানুষ অকস্মাৎ আপনাকে নিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইল—এখন সে কি করিবে, এ সকলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং কামের তাগিদ মিটাইয়া দিয়াও জগৎ এবং মানবসমাজ ব্যক্তির মনের এই দুর্নিবার জিজ্ঞাসাকে নিরস্ত করিতে অপারগ হওয়াতে, জগৎ এবং মানব সম্বন্ধে সে থিওরি পাকাইতে বসিল। এবং মানবের সমুদয় ইতিহাস হইতেছে এই থিওরি পাকানোর ইতিহাস, এবং কে না জানে ইউরোপের বিগত এই বিপুল যুদ্ধ হইতেছে গণতন্ত্র ও একতন্ত্রের থিওরির-ই experiment মাত্র! এখন, যে-থিওরি সমুদয় দেশেকালে

খণ্ডিত থিওরিকে আত্মসাৎ করিয়া অখণ্ড, সে হচ্ছে সত্য, সে হচ্ছে জীবন-তত্ত্ব, সে-ই সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে ধারণ করিতেছে বলিয়া তার নাম ধর্ম্ম।

দেখা গেছে ধর্ম্মের ক্ষুধা মানুষের জীবনের মধ্যে সত্য ক্ষুধা। আমার দেশকে "স্বরাট" করিবার আমার গরজ কি? ভাল খাইব পড়িব বলিয়া? ছেলেপুলেরা ভাল খাইবে পরিবে বলিয়া? অবশ্য তাহা হইলে, দেশের জন্য আত্মবলিদানের মানে বোঝা যায় না। অবশ্য ছাপার হরফে নাম লিখিত হইবার সম্ভাবনা মানুষকে যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করাইতে পারে, তা কারও অগোচর নাই, তথাপি একথা কখনো মিথ্যা নয় যে, "man does not live by bread alone,"—কেবলমাত্র খাওয়া-পরার মধ্যে সেই উন্মাদনা নাই যা মানুষকে খাওয়া-পরার উপাদানস্বরূপ যে দেহ, তার বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত করাইতে পারে। ভবিষ্যদ্‌বংশীয়বর্গের কল্যাণ—এ হচ্ছে একটা আইডিয়া এবং বৃহৎ ভাবের প্রতি মানুষের আকর্ষণের প্রচণ্ডতার মানেই হচ্ছে মানুষের ভিতরকার ভূমাতত্ত্ব। দেশ সেবার নিজের মধ্যে নিজের কোনো মানে নাই—যেমন অর্থসঞ্চয় স্পৃহার নিজের মধ্যে নিজের কোনো মানে নাই, মানুষ নিজের মধ্যে যে একের সন্ধান পাইয়াছে তা সে বাইরেও দেখিতে চায়, তা-ই তার Science সেই একতে সে প্রাত্যাহিক জীবনের সুবিধার মধ্যে দেখিতে চায়—অর্থই মানুষকে আলাদা আলাদা করিয়া জীবনযাত্রার উপকরণজাল সংগ্রহ করিবার উৎপাৎ হইতে বাঁচায়; কিন্তু সেই অর্থের লিপ্সা যেমন মানবের মূল-তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি হারাইয়া আপনিই একান্ত হইয়া উঠিলে মানবের

অকল্যাণ, তেমনি যে দেশসেবার আসল মানে মানুষের চেতনার মনের প্রসার। সে যখন একান্ত হইয়া আপনিই end in itself হইয়া উঠে, তখনই হয় "বন্দেমাতরম্-এর সৃষ্টি এবং আজকের দিনে উক্ত মন্ত্রের ক্রিয়া যে কি তা দেশে এবং বিদেশে সকলের কাছেই সুস্পষ্ট। মানুষ আপনাকে বড় করিবে, সে জগৎ এবং মানব-সমাজের মধ্যে যে অসীম-তত্ত্বকে আবিষ্কার করিল, সে দেখিল যে সে কেবল তত্ত্ব নয়, সে তার বন্ধু, সেজন্যই সীমায় তার লজ্জার আর অবধি নাই—যাকে ডাক দিয়াছেন "অনন্তং ব্রহ্ম", এই মানবত্বের মহলে।

ভারতবর্ষের অন্তরের কাতর প্রশ্ন আজ এই যে, কোথায় সেই মায়াকাঠি যার স্পর্শমাত্রে এই বিপুল ধ্বংস স্তূপের ছড়ানো ইঁট-পাথর কড়ি-বরগা এক নিমেষে যে-যার জায়গায় ছুটিয়া গিয়া বিশ্বের বিস্ময় শিল্প-প্রাসাদটিকে আর একবার দাঁড় করাইবে ?

আমাদের জীবনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগ্রত হইলে আমাদের সাহিত্যে তার ছাপ পড়িতে বিলম্ব হইবে না। ততক্ষণ এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ উত্থাপনের প্রয়োজন আছে। কেননা, আমরা আসলে কি চাই, তা আমরা-ই কি জানি ? তাই জপের প্রয়োজন।

(৭)

যতক্ষণ আমাদের চরিত্র বদ্‌লানোর সূত্র বাহির না হইতেছে, ততক্ষণ আমাদের সাহিত্যের কার্য্য। কারণ, সাহিত্য will-কে তাড়া দিতে না পারিলেও মনকে নাড়া দিতে পারে। ইংরাজি সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরাজ-মন আমাদের মনকে যে নাড়া দিয়াছে, দেশের

মধ্যে লক্ষ লক্ষ টিকির সহসা খাড়া হইয়া ওঠা কি তারই পরিচয় নয়? তৈলাক্ত টিকি মেকি আধ্যাত্মিকতায় যতই ঝিকিমিকি করিতেছে, আমরা ততই জানিতেছি "Recessional"-এর মধ্যে ইংরাজ-ইতিহাস তথা ইংরাজ-চরিত্রের যে গভীর বাণী আছে, সেই বাণীর জন্য আমাদের পক্ষে উক্ত তথাকথিত "জড়বাদী"-দের মনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যত দরকার, আমেরিকায় সন্ন্যাসী পাঠানোর তত নাই।

শ্রীমণি গুপ্ত

পলাশ।

—:০:—

আমি সে পলাশ, জন্ম লভিনু

খর নিদাঘের রুদ্রতাপে !

মধু-মাধবের বাসর অন্তে,

না জানি কাহার কঠিন শাপে।

অন্তিম শ্বাস ফেলি বসন্ত

চলি গেল যবে সুদূর পুরে,

বন-বীথিকার উৎসব মাঝে

উৎসের ধারা সরায়ে দূরে,—

ঘুমের জড়িমা ছাইয়া আসিল

দিগ্বধূদের নয়ন পরে,

ধরণী-আনন ম্লান হয়ে গেল

নব-বিরহের বিষাদ ভরে—

সেইক্ষণে আমি জন্ম লভিনু,

সদ্যশোকের তড়িৎশিখা !

গত রজনীর ফুল্ল আসরে—

নিখিল বেদন ললাটে লিখা।

চিরদহনের জীবন আমার

দীপ্তি লভিল দৈন্ত মাঝে !

বিশ্বের দুখ বক্ষে বরিয়া,

ফুটিয়া উঠিনু মলিন সাঁঝে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

মাভৈঃ।

—:০:—

কিসের শঙ্কা দয়িত তাহার,
কিসের ভয় গো আর,
তোমার বাণীটি শুনেছে যে জন
কোথা তার সংসার!

কোথা তার কাছে বন্ধু স্বজন,
গুরুজন গৃহজ্বালা,
বিত্তের রাশি মিথ্যার বোঝা—
চিত্তের দাহ-ঢালা!

ফেনিল-মত্ত খ্যাতির তীব্র
সুধা-হলাহল ধারা
বিজলি চমকে করে না তাহারে
অন্ধ লক্ষ্যহারা।

দিশাহীন-গতি ক্ষুব্ধ বাসনা
গর্জ্জে না চিতে তার—
বৃথা ক্রন্দন গুমরি উঠে না
দুঃখ-সজল ধার।

নৃত্য-দোদুল চিত্ত তাহার
দ্বন্দ্বের দেশছাড়া,
মুক্ত স্বাধীন বিরাট পরাণ
সকল শঙ্কাহারা!

নিশিদিন ধরে হৃদয়ে তাহার
বাজে রে মোহন বাঁশি—
বিশ্ব ভরিয়া উঠে গো মন্ত্র—
"ভালবাস, ভালবাসি"।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

স্বাভাবিক নেতা।

——ঃ*ঃ——
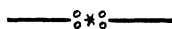
ভাষান্তরিত করলে বাক্যের রসভঙ্গ হয়, অনেক সময়ে অর্থভঙ্গও হয়। সেইজন্য আদিতে বাক্যটা যে ভাষায় ছিল, সেই ভাষাটা উদ্ধৃত করে দিলে বোঝবার সুবিধা হয়। এই প্রবন্ধের নামকরণে যে কথা দুটি ব্যবহার করছি, তার আদি ভাষাটা সেইজন্য এখানে দেওয়া অনাবশ্যক মনে করছি না। সেটা হচ্ছে "natural leader." অনুবাদ ঠিক হয় নি সন্দেহ হওয়াতেই বাক্যটার আদি ইংরেজী রূপ দিলাম।

আমাদের দেশের জমিদার মহাশয়রা এবং তাঁদের পক্ষসমর্থনকারীরা আমাদিগকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, তাঁরাই আমাদের "স্বাভাবিক নেতা", এবং ইচ্ছা করছেন যে আমরা যেমন তাঁদের কর্তৃত্বাধীন আছি তেমনি তাঁদের নেতৃত্বাধীন হই। কথা দুটির সামান্য অর্থ এই যে, তাঁরা আর আমরা (কৃষকেরা) এক দেশে একসঙ্গে জন্মেছি, এবং জন্ম থেকেই তাঁরা আমাদের সকল কাজে পরামর্শ দিয়ে এবং অন্য সকল রকমে সহায়তা করে আমাদের হিতসাধন করে থাকেন। কিন্তু কথাটা কি ঠিক?—প্রাচীন কালে যে, জমিদার নামে কোন পদার্থ ছিল, তার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে তৃণশষ্পযুক্ত উর্ব্বর জমির বন পরিষ্কার করে কৃষকেরা ক্ষেত করেছেন, গ্রাম স্থাপন করেছেন, এমন কথা দেশের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক

পাওয়া যায়। তারপর বন্য জন্তু, ঘরের শত্রু, বাইরের শত্রু প্রভৃতি থেকে ক্ষেত্রের শস্য রক্ষা করতে, গোরুবাছুর রক্ষা করতে, গ্রাম রক্ষা করতে এবং এই সকল কাজের জন্য রাজার যা প্রাপ্য তা আদায় করতে রাজা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করতেন। কর্ম্মচারীরা বেতন পেত। প্রজার সঙ্গে শঠতা করলে, প্রবঞ্চনা করলে, রাজা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতেন। মনুর ব্যবস্থা—"তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্।" তখন রাজা এবং প্রজার মধ্যবর্ত্তী জমির উপস্বত্ব বা তার অংশভাগী কেউ ছিল না। পৌরাণিক যুগেও এই ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান রাজারাও প্রথম প্রথম এর কিছু পরিবর্ত্তন করেন নি। তার অনেক পরে যখন বাঙলার নবাবেরা অধঃপাতের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে জড়িয়ে পড়ে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী তাঁদিকে দিলেন, তখন প্রজার দেয় খাজনা আদায়ের ঠিকাদারস্বরূপ (revenue farmer) জমিদারের সৃষ্টি হল। তাঁরা প্রজার পূর্ব্ব-জও নন্, সহ-জও নন্। অনেক স্থলে তাঁদের সৃষ্টি হয়েছে কালেক্টারীর নিলামঘরে। থর্ন্টন নামে একজন ইংরেজ কলিকাতা রিভিউ পত্রে এর একটি বেশ সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন। কালেক্টার সাহেব (এখনকার নয়, দেওয়ানী পাবার কিছু দিন পরে যখন রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রথম কালেক্টার নিযুক্ত হলেন) আফিসে আসীন। তাঁর দক্ষিণহস্তরূপে কানুনগো নিকটেই উপবিষ্ট। বন্দোবস্তের জন্য একটা জমিদারীর কাগজ পেশ হল। পূর্ব্ব বন্দোবস্তের কাগজপত্র পড়া হল। কালেক্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, সে জমিদারীর জমিদারের নাম কি?—কানুনগো নাম বললেন। তার পর টাকার

কথা। এ বিষয়েও কানুনগোর কথাই কালেক্টার সাহেবের প্রধান নির্ভর। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার আরও কিছু বেশী দিতে চায় কি না, তা অবশ্য দেখা হল। তারপর দরদস্তুর করে এক জনের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেল। এই জমিদার সৃষ্টি-তত্ত্ব পৌরাণিক বিশ্বসৃষ্টি-তত্ত্বের মত উপকথা নয়। এর কাগজ-পত্র দলিল-দস্তাবেজ আছে, এবং জমিদারেরা তা বেশ জানেন। তা ছাড়া অনেক জমিদার আছেন যাঁদের কোন আদিপুরুষ বুদ্ধিবলে, বা কলমের বলে, অথবা বাহুবলে, জমিদারী করেছেন। এঁদের যে কেবল এই দেশেই আবির্ভাব, তা নয়। বিলেতের জমিদার সম্বন্ধে Hyndman বলেন, "the handful of marauders who now hold possession (of the land), have and can have no right save brute force against the tens of millions whom they wrong."

তারপর প্রজার সঙ্গে এঁরা কিরূপ ব্যবহার করেন, সেটা একবার দেখা যাক। সকলেই জানে যে তাঁরা খাজনা আদায়ের ঠিকাদার, শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁদিকে জমিদার বলা হয়। সে হিসেবে তাঁদের কাজ কেবল প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কি আদায় করেন? সরকারী রিপোর্টে তার উত্তর এই— "The modern zamindar taxes his raiyats for every extravagance or necessity that circumstances may suggest, as his predecessors taxed them in the past. He will tax them for the support of his agents of various kinds and degrees, for the payment of his income tax and his postal cess, for the purchase of an

elephant for his own use, for the cost of the stationery of his establishment, for the cost of printing the forms of his rent receipts, for the payment of his lawyers. The milkman gives his milk, the oilman his oil, the weaver his clothes, the confectioner his sweetmeats, the fisherman his fish. The zamindar levies benevolences from his raiyats for a festival, for a religious ceremony, for a birth, for a marriage ; he exacts fees from them on all changes of their holding, on the exchange of leases and agreements, and on all transfers and sales ; he imposes a fine on them when he settles their petty disputes, and when the police or the magistrate visits his estates ; he levies blackmail on them when social scandals transpire, or when an affray or an offence is committed. He establishes his private pound near his cutchery, and realizes a fine for every head of cattle that is caught trespassing on the raiyat's crops. The abwab, as these illegal cesses are called, pervade the whole zamindari system. In every zamindari there is a naib, and under the naib there are gumastas ; under the gumastas there are piyadas or peons. The naib occasionally indulges in an ominous raid in the mofussil : one rupee is exacted

from every raiyat who has a rental, as he comes to proffer his respects. Collecting peons, when they are sent to summon raiyats to the landholders' cutchary, exact from them daily four or five annas as summons fees. (Administration Report, Bengal, 1872-73, page 23). অর্থাৎ—"অবস্থার তাড়নায় বা বিলাসিতার জন্য, অতীতে তাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা যেমন করতেন, এখনকার জমিদারও তেমনি, প্রজার কাছে নানারকম অবৈধ কর আদায় করেন। আমলার ভরণ পোষণের জন্য কিছু, আয়করের জন্য কিছু, ডাক-করের জন্য কিছু, নিজের ব্যবহারের জন্য একটা হাতী কেনা হয়েছে তার জন্য কিছু, তাঁর কাছারীর কাগজ কলমের জন্য কিছু, খাজনার রসিদের ফরম্ ছাপাবার জন্য কিছু, মোকদ্দমা-মামলার খরচের জন্য কিছু, প্রজার কাছ থেকে আদায় করা হয়। দুধ-ওয়ালা তাঁকে দুধ দেয়, তেলী তেল দেয়, তাঁতী কাপড় দেয়, ময়রা মিষ্টান্ন দেয়, জেলে মাছ দেয়। পর্ব্ব, পূজা, ব্রত, উৎসব, ছেলের জন্ম, বিবাহাদিতে প্রজাকে কিছু দিতে হয়। যোত-জমা হস্তান্তর করতে হলে, পাট্টা কবুলিয়ৎ বদলাতে হলে কিছু দিতে হয়। পুলিস বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জমিদারীর মধ্যে এলে কিছু দিতে হয়। প্রজাদের মধ্যে সামান্য সামান্য বিবাদ বিসম্বাদ মেটাতে হলে কিছু দিতে হয়। পারিবারিক বা সামাজিক কোন কলঙ্কের কথা প্রকাশ হলে কিছু দিতে হয়। একটা মারামারি বা অন্য কোন ঘটনা হলে কিছু দিতে হয়। কাছারীর কাছে পাউণ্ড আছে, কারো গরু বাছুর কারো কিছু অনিষ্ট করলে জরিমানা দিতে হয়। এই সকলের নাম "আবওয়াব"। এই আব-

ওয়াব” ছাড়া জমিদারীর কোন কাজই নেই। সকল জমিদারেরই নায়েব আছেন, নায়েবের অধীনে গোমস্তা আছেন, গোমস্তার অধীনে পেয়াদা আছেন। নায়েব মহাশয় কখনো কখনো মফস্বলে অভিযান করেন, প্রজাকে অমনি একটি টাকা নজর দিতে হয়। কোনো কারণে কাছারীতে প্রজার ডাক হল, পেয়াদা ডাকতে গেল, অমনি তলব আনা স্বরূপ পেয়াদাকে দৈনিক চার আনা কি পাঁচ আনা দিতে হয়।” এ সকল কথা কল্পিত নয়। সরকারী রিপোর্টে আছে। আর জমিদারের সেরেস্তা খুঁজলে হিসাবের কাগজপত্রের মধ্যেও এর অনেক পাওয়া যেতে পারে। তবে সকল জমিদারই এর সকলগুলিই সকল প্রজার কাছ থেকে যে আদায় করেন, তা নয়। কিন্তু অনেকেই যে অনেক প্রজার কাছ থেকে এর অনেকগুলি আদায় করেন, তাতেও সন্দেহ নেই।

অনেক জমিদার আছেন যাঁরা খাজনা, আবওয়াব প্রভৃতি আদায় করবার কষ্ট স্বীকার করতে নিতান্ত নারাজ। তাঁরা কিছু লাভ রেখে তাঁদের ঠিকার অধীন ঠিকা দেন। এই অধীন ঠিকাদার বা পত্তনীদার আবার দর-পত্তনী দেন। দর-পত্তনীদার আবার সে-পত্তনী দেন, তিনি আবার তস্য অধীন পত্তনী দেন। সকলেই কিছু কিছু লাভ রেখে থাকেন। এত লোককে লাভ দিতে দিতে, থাকে না কেবল লাভ প্রজার। Baden-Powell বলেন—“This rent is calculated so as to leave a margin of profit, and above the sum payable to the zamindar and the revenue payable to Government, a margin which it depends on the lessee's skill and ability to make more

and more * * In some places there are as many as a dozen gradations between the zamindar at the top and the cultivator of the soil at the bottom." সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই যে—উপরে জমিদার আর নীচে কৃষক, এর মধ্যে পত্তনীদার, দর-পত্তনীদার প্রভৃতি অনেকগুলি থাকেন, এবং সকলেই বুদ্ধি ও নিপুণতার সহিত এমন হিসাব করে খাজনা আদায় করেন, যে জমিদারকে তাঁর খাজনা এবং গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের রাজস্ব দিয়েও সকলেরই যথেষ্ট লাভ থাকে। Baden Powell এই পত্তনীদার সম্বন্ধে বলেন যে, এই সুচতুর ব্যক্তিটির জমিদারীতে এইমাত্র স্বার্থ যে, তিনি যত পারেন নিজের লাভ করে নেন। তাঁর মনে এ কথা উদয়ই হয় না যে, তাঁর চোষণের পরে যা থাকবে তা শুকনো, নীরস। ব্যাডেন-পাওএলের ভাষায় "Such a person had no other interest but to amass the largest profit to himself, regardless whether on going out he left behind him an estate sucked dry and tenants verging on misery." ১৮৪৩ সালে এই পত্তনী-প্রথা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল "Striking its roots all over the country and grinding down the poorer classes to bare subsistence." (Land Systems of British India,—page 638).

তবেই দেখা যাচ্ছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে—একশ' বৎসরের কিছু বেশি হল—এই জমিদার সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়েছেন। বন্দোবস্তটা চিরস্থায়ী হলেও, ছল-বল-কৌশল-খরিদ-বিক্রী-দান-প্রভৃতি দ্বারা অনেক জমিদারী

হস্তান্তরিত হয়েছে এবং নতুন জমিদারের সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা সকলেই পত্তনীদার দরপত্তনীদার সমেত, আমাদের "স্বাভাবিক নেতা", অর্থাৎ—"natural leaders." উত্তরাধিকার-সূত্রটা, যেটা natural leader-এর প্রধান অবলম্বন, যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে, তখন এঁদিকে natural leader না বলে ex-officio leader বললে কেমন হয়? Ex-officio-কে ভাষান্তরিত করে আর বাক্যের রসভঙ্গ করব না।

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

সত্য-দৃষ্টি।

——:•:——

চিত্ত মোর দগ্ধ কর নিত্য দুঃখ-দানে,
নিরানন্দ শান্তিহারা হোক্ এ জীবন,
ক্ষতি তাহে নাহি নাথ,—শুধু মোর প্রাণে
দিয়োনা জড়ায়ে যেন মোহ-আবরণ।
সত্যের জ্বলন্ত মূর্ত্তি কর প্রজ্জ্বলিত,
মিথ্যা মোহ দূরে যাক্ ; সেও মোর ভালো
যদি প্রাণ হয় তাহে দুঃখে জর্জ্জরিত,
ব্যথাবিদ্ধ ;—নাহি চাই আলেয়ার আলো।
জানি তুমি মোর ভাগ্যে লেখ নাই সুখ,
নয়নের স্নিগ্ধ হাসি, স্নেহ ভালবাসা ;
হোক তাই, তার লাগি হব না বিমুখ।
শুধু মোর প্রাণে জাগে এইটুকু আশা,
উচ্চশিরে বলে যাব, চলে যাব যবে—
সত্যের দেখেছি শক্তি জীবন-আহবে।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

স্মৃতির ক্ষণিকতা।

ভুলে যাও, ভুলে যাও, সবে মোরে বলে,
ভুলে যাও দুঃখ তার, সব তার স্মৃতি,
মালাও ত্যজিতে হয় পুষ্প শুষ্ক হলে,
ভুলে পুরাতন আজি গাও নব গীতি।
ভোলা যে সহজ, তাহা খুবই আমি জানি-
এ জগতে কিবা মোরা নিমেষে না ভুলি ?
একান্ত যাহারে মোরা আপনার মানি,
ক্রমে ম্লান হয়ে আসে তারও স্মৃতিগুলি।
তাই বলি, থাক্ স্মৃতি থাকে যত দিন,
মনোমাঝে থাকে থাক্ নিদারুণ ব্যথা—
সান্ধ্যমেঘে আভা সম বিষণ্ন মলিন,
থাকুক্ জাগিয়া মনে যত তার কথা!
তার পর যদি ধীরে নামে অন্ধকার,
আপনিই লুপ্ত হবে শেষ-আলো তার!

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

মোস্‌লেম ভারত।*

—০ঃ০—

আমি "সওগাত" থেকে ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করে দিয়েছি, তার ভূমিকায় স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, বঙ্গভাষা শুধু আমাদের নয়, মুসলমানদেরও মাতৃভাষা। এ জ্ঞান যে বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মনেও দিব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় পেয়ে যারপর নাই সুখী হলুম। সদ্যপ্রকাশিত মাসিকপত্র "মোস্‌লেম ভারত"-এর মুখপত্রে সম্পাদক মহাশয় "আমাদের কথা" বলে যে ক'টি কথা বলেছেন, সে ক'টি আমাদেরও কথা। সম্পাদক মহাশয়ের কথা এই ঃ—

"বর্ত্তমানে আমাদের "সাহিত্যিক সমাজ" বলিলে কেবল মুসলমান সমাজকেই বুঝাইবে না। পরন্তু বঙ্গদেশবাসী বঙ্গভাষাভাষী হিন্দু মুসলমান মানবসঙ্ঘকেই বুঝাইবে। হউক হিন্দুর ধর্ম্ম ভিন্ন, আর মুসলমানের ধর্ম্ম অন্য, কিন্তু জন্মভূমিগত এবং ভাষাগত হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক,—উভয়েই এক প্রকৃতির নিয়মনিগড়ে নিবদ্ধ। * * আজ মুসলমানগণ বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন, এমন কি অন্দরমহলের ভিতরেও বঙ্গভাষার স্বর্ণ-সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ মুসলমানগণ মনে-প্রাণে বুঝিয়াছেন যে, হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে হইলে বাঙলা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।"

---

* সচিত্র মাসিক পত্র, বার্ষিক মূল্য চারি টাকা। কলিকাতা, ৩ কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, মোসলেম পাব্‌লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক মৌলভী মোজাম্মেল হক্‌।

এ কথা কটি যেমন স্পষ্ট তেমনি সত্য।

পূর্ব্বোক্ত ভূমিকা আমি এই বলে শেষ করি যে, হিন্দু মুসলমানের যে মিলনের চেষ্টা আজ রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র লক্ষিত হচ্ছে, সে মিলন প্রকৃতপক্ষে সাধিত হবে বঙ্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রে। দেখতে পাচ্ছি "মোসলেম ভারত"-এর সম্পাদক মহাশয়ও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি বলেন :—

"আমাদের মনে হয়, যদি কোনদিন বঙ্গজননীর যুগল সন্তান, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী সম্মিলন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে এই বাঙ্গালা সাহিত্যের এই মহা মিলনের ক্ষেত্রেই তাহার আশা করা যাইতে পারে"।

এ আশা ভিত্তিহীন নয়। যে লেখার ভিতর প্রচলিত সামাজিক মনোভাবের অতিরিক্ত কিছু নেই, সে লেখা সাহিত্য নয়—তাই একথা জোর করে বলা চলে যে, সাহিত্যরাজ্যে হিন্দু শুধু হিন্দু নন, তার অতিরিক্ত কিছু; এবং মুসলমানও শুধু মুসলমান নন, তার অতিরিক্ত কিছু। এই অতির দেশই সকল সাহিত্যিকের স্বদেশ।

সাহিত্য বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে, "মোস্‌লেম ভারতে" একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের "সাহিত্যিকের সাধনা"র মহা গুণ এই যে, উক্ত প্রবন্ধে বিষয়টিকে নানাদিক থেকে দেখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিচার করাও হয়েছে। এহেন সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাঙলা মাসিকপত্রে নিত্য চোখে পড়ে না। সাহিত্য যাঁরা ভালবাসেন, এ লেখাটি তাঁদের আমি পড়তে অনুরোধ করি। এস্থলে আমি এ কথাটি বলা আবশ্যক মনে করি যে, প্রবন্ধ লেখকের বেশির ভাগ মত আমি খাঁটি বলে মেনে নিই।

বাঙলা ভাষার উপর কাজীসাহেবের কতদূর অধিকার আছে, তার

প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ইংরাজি পদের ভাষার অনুবাদে। "সমূহতন্ত্র" কি socialism-এর মন্দ তরজমা? তারপর "ভাব-বিলাস" যে sentimentalism-এর অতি চমৎকার তরজমা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। Sentimentalism যে এতটা হেয়, তার কারণ ও-বস্তু হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ। আর বিলাসী-দেহের চেয়ে বিলাসী-মন যে মানুষের পক্ষে বেশি মারাত্মক, এ কথা দেহাত্ম-বাদী ছাড়া অপর সকলেই মানতে বাধ্য।

আমি মনোবাক্যে "মোস্‌লেম ভারত"-এর শুভকামনা করি। আমার মনে এ আশাও আছে যে, মুসমমান সাহিত্যিকদের হাতে বাঙলা গদ্য সরল ও তরল হয়ে উঠবে। কারণ আমাদের মত সংস্কৃতের গুরুভার তাঁদের বহন করে চলতে হয় না। আর সংস্কৃত ভাষার আর যতই গুণ থাক, ক্ষিপ্রতা নামক ধর্ম্ম তার শরীরে নেই। আর এ কথাও শুনতে পাই যে, ফার্‌সি ভাষার আর যে ত্রুটিই থাকুক, সে ভাষা স্থূলকায় নয়। সুতরাং ফার্‌সি-নবীশদের হাতে বাঙলা ভাষার ফূর্ত্তি যে নষ্ট হবে না, এ আশা কি অসঙ্গত?

আকবর বাদশাহ্‌র দরবারে দুটি গুণী চিত্রকর ছিলেন। আকবর শাহ্ তাঁদের একজনের নাম দিয়েছিলেন "জরীন্-কলম", আর একজনের "শিরীন্-কলম"। আশা করি মুসলমান লেখকদের হাতে আমরা আবার "জরীর কলম" ও "চিনির কলমের" সাক্ষাৎ পাব।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

আষাঢ়ে গল্প।

—:*:—

কিসে যে কি হ'ল, আঠার বছর বয়সের রাজপুত্র চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, একদিন মাকে এসে বললেন—"মা, আমি রাজ্যও করব না, সংসারও করব না।"

প্রৌঢ় রাজমহিষী সামনে একখানা আরশি ধরে সিঁথিতে মোটা করে একটা সিঁদুরের রেখা টানতে যাচ্ছিলেন, রাজপুত্রের কথা শুনে তাঁর হাত কেঁপে উঠল, সিঁদুরের রেখাটা বেঁকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন—"রাজ্যও করবি নে, সংসারও করবি নে, তবে কি করবি?"

রাজপুত্র উত্তর দিলেন—"একদিক বলে' বেরিয়ে যাব মা।"

মা জিজ্ঞেস করলেন—"সে দিকটা কোন্ দিক?"

ছেলে উত্তর দিলেন—"সে-দিকটা কোনো একটা দিক নয় মা, সে দিকটা সকল দিক।"

রাজরাণী অনুনয়ের স্বরে বললেন—"এ কি পাগলামি বাবা, রাজ্যও করবি নে, সংসারও করবি নে, এ রাজ্য দেখবে কে? প্রজা-পালন করবে কে?"

রাজপুত্র উত্তর করলেন—"কে করবে জানি নে মা, শুধু এই জানি যে, আমি এখানে হাঁপিয়ে উঠেছি। এই সাতমহলা পুরী, দ্বারে দ্বারে দ্বারী, উঠতে বসতে কায়দা-কানুন, খেতে-শুতে দণ্ড প্রহর গণা,

দু'পা যেতে সঙ্গে সাত শ' লোকের হৈ হৈ রৈ রৈ, একবার মুখ খুললে দশবার "যুবরাজের জয় হোক" শোনা! জীবনের প্রবাহ থেকে সব রস শুকিয়ে ফেলে যেন শক্ত পাথর দিয়ে ভরে' দিয়েছে। এ থেকে আমি একবার ছুটী চাই, কেবল ছুট্‌তে, খোলা আকাশের তলে মুক্ত বাতাসের মাঝে, সামনে পিছনে ডানে বাঁয়ে কোনো শৃঙ্খল নেই, কেবল ছুট্‌তে, বন্ধনহীন শৃঙ্খলহীন কেবল ছুট্‌তে, আর ছুট্‌তে আর ছুট্‌তে; ব্রহ্মাণ্ডের আকাশটাকে চোখ ভরে' দেখে নিতে, দিগন্তের বাতাসটাকে বুকে পুরে টেনে নিতে; একবার, একবার আমি ছুটী চাই।"

রাজরাণী মনে করলেন রাজপুত্র পাগল হ'ল না কি। তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে খবর পাঠালেন।

রাজা এলেন। বৃদ্ধ রাজা, মাথার চুল সাদা, ভুরু সাদা, চোখের পাতা পর্য্যন্ত পেকে গেছে। যুবরাজ পিতৃচরণ বন্দনা করলেন। তারপর বললেন—"মহারাজ আপনার দাসানুদাস একবার মুক্তি চায়।" রাজরাজেশ্বর পরাজয় মানল, বৃদ্ধ পিতা তার সন্তানের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"এখানে কিসের অভাব বাবা, যে বনবাসী হবে, কোন্ দুঃখে এ সংসার ছেড়ে যাবে?"

যুবরাজ উত্তর করলেন—"মহারাজ! এখানে সব চাইতে বড় অভাব যে কোনো অভাব নেই। মহারাজ, আমি ঠিক জানিনে কোন্ দুঃখ বড়—অভাবের, না অভাবহীনতার। যেখানে মনে ইচ্ছার উদয় হতে না হতেই তা প্রতিপালিত হচ্ছে সেখানে মানুষ থাকে কি করে', কোন্ অবলম্বনকে ধরে' মানুষ সেখানে বাঁচবে? তার চাইতে মহারাজ, আমার মনে হয় পথের মুটেটা পর্য্যন্ত সুখী, তার সামর্থ্যের চাইতে

যে তার আকাঙ্খা বড়, তাই তার বাঁচবার মধ্যে একটা চিরন্তনের কৌতুক, চিরন্তনের রহস্য আছে যা কোনোদিনই নষ্ট হয় না। মানুষের জীবনে একটা চিরন্তনের চেষ্টার দিক আছে বলেই সে-জীবনকে মানুষ সত্য করে পায়। যে জীবনে এই চেষ্টার দিকের আয়োজন নেই, আকাঙ্খা করবার কিছু নেই, সে জীবন মৃত্যুরই সামিল। সে জীবন স্বাস্থ্যবান দেহ-মন-প্রাণের পক্ষে বিষ। মহারাজ, এই মৃত্যু থেকে, এই বিষের সংস্পর্শ থেকে আমি ছুটী চাই। অন্তত আমার দেহটাকে একবার ছুটিয়ে দিয়ে দেখতে চাই—মহারাজ অনুমতি দিন।"

বৃদ্ধ রাজা একবার মুহূর্ত্তের জন্যে অতিপ্রয়াস করে মেরুদণ্ডটাকে ঋজু করে দাঁড়ালেন, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"আমার অবসর গ্রহণের কাল উপস্থিত, রাজ্যের ভার তোমার, সেই রাজকার্য্যে অবহেলা করে' কর্ত্তব্যের অবমাননা করবে? শাস্ত্রবিরোধী ধর্ম্ম আচরণ করবে?"

যুবরাজ উত্তর করলেন—"রাজরাজেশ্বর! রাজধর্ম্মের চাইতে মানুষের ধর্ম্ম বড়, মানুষের ধর্ম্ম যেখানে রাজার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেই সফল হ'তে চায় সেখানে তাই-ই তার সত্য, তাই-ই তার শাস্ত্র। মানুষ রাজসিংহাসনে বসে গৌরব অনুভব করুক কিন্তু মানুষ রাজার চাইতে চিরকালের বড়। মহারাজ, আপনার পুত্রদের মধ্যে যারা রাজসিংহাসন আকাঙ্খা করে তারা রাজ্যশাসন করুক প্রজাপলন করুক, আমাকে এই বর্ণহান বৈচিত্র্যহীন অভ্যাসের জঠর-চক্র থেকে মুক্তি দিন। আমি ঘুরতে চাই; কিন্তু তা চক্রে নয়—দিগন্তের পানে, আর নিজের ইচ্ছায়।"

কিছুতেই কিছু হ'ল না। পাটরাণীর চোখের জল, বৃদ্ধ রাজার

কাতর বচন, বুড়ো মন্ত্রীর অনুনয় বিনয় অনুরোধ উপরোধ কত বুঝোনো কত পড়ানো কিছুতেই কিছু হ'ল না। রাজপুত্রের কেবল এক কথা—মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।

মন্দ সংবাদ বাতাসের আগে ধায়। সূর্য্যদেব আকাশের এক পোয়া-পথ যেতে না যেতে সারা রাজধানীতে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, যে যুবরাজ মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে চলে' যাবেন।

দেখতে দেখতে সেই আনন্দ-কোলাহলময়ী রাজধানী থমকে-থাকা অশ্রুভরা আঁখির মত ভার হয়ে উঠল, বিষণ্ণ হয়ে উঠল। যুবরাজ—যাঁর চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, সেই যুবরাজ মনের দুঃখে কিনা বনবাসী হবেন! দোকানী দোকান পাট বন্ধ করল, ব্যবসায়ী তার আড়ত বন্ধ করল, ভিক্ষুক তার ভিক্ষা বন্ধ করল, নাগরিকেরা তাদের গৃহ হতে তাদের কর্ম্মস্থান হ'তে দলে দলে বেরিয়ে পড়ল। দলে দলে লোক রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটতে লাগল। ধনী দরিদ্র উচ্চ-নীচ স্ত্রী-পুরুষ যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-বৈশ্য রাজপুরীর সামনে ক্রমে ক্রমে কোটী লোক জমা হ'ল। সকলেরই এক প্রতিজ্ঞা—আমরা যুবরাজকে যেতে দেব না। কোন্ দুঃখে কিসের অভাবে যুবরাজ এমন সোনার রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হবেন? আমাদের যুবরাজ—যাঁর চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, তাঁর দুঃখ কিসের? কি অভাব? আমাদের জানান সে অভাব, প্রাণ দিয়ে আমরা সে অভাব পূরণ করব, না পারি তাতে জীবন দেব; কিন্তু যুবরাজকে কখনো ছাড়ব না।

রাজপ্রাসাদের সামনে লোক গিস্ গিস্ করতে লাগল। কেবল

মাথা আর মাথা আর মাথা—একটা মাথার বিরাট অরণ্য। সেই বিশাল জনারণ্য থেকে বিরাট গম্ভীর জলধি-কল্লোলের মত কোটী কণ্ঠে এক সঙ্গে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"জয় যুবরাজের জয়", "অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-মিথিলা-কাশী-কাঞ্চীর যুবরাজ জয় তরুণাদিত্যের জয়।"

সেই কোটী কণ্ঠের বজ্র-নির্ঘোষনাদে সাতমহলা রাজপুরীর সাত মহল কেঁপে উঠল, মহলে মহলে সব খাট পালঙ্ক আচম্‌কা নড়ে উঠল, সাত মহলে শত রাণীর পোষাপাখীর দল তাঁদের খাঁচার ভিতরে ভীষণ চাঞ্চল্যের সঙ্গে এধার ওধার করে' অর্থহীনভাবে উড়ে বেড়াতে লাগল, টিয়ে পাখীরা দাঁড়ে বসে' ভীষণ ব্যস্ততা সহকারে তাদের পায়ের শিকল কাটবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগল, ময়ূরের দল মেঘ ডাকছে মনে করে' তাদের পেখম খুলে দাঁড়াল।

বজ্র-নিনাদে কোটী কণ্ঠ থেকে আবার ধ্বনি উঠল—"জয় যুবরাজের জয়", "অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-মিথিলা-কাশী-কাঞ্চীর যুবরাজ জয় তরুণাদিত্যের জয়।"

বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন, "যুবরাজ, পৌরজনের জনপদবাসীর এই স্নেহ এই অনুরক্তি অবহেলা করবার বিষয় নয়। সমস্ত সাম্রাজ্যের স্নেহ ভালবাসা উপেক্ষা করে' সংসারে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে' একা একা থাকলে কোন্ উদ্দেশ্য সফল হবে যুবরাজ?"

যুবরাজ উত্তর করলেন, "সংসারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে কে চায় মন্ত্রী? কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-মিথিলা-কাশী-কাঞ্চীতে, এই বিশাল সাম্রাজ্যে সবার চাইতে বিচ্ছিন্ন কি, সবার চাইতে বিচ্ছিন্ন কে মন্ত্রী? এই সাম্রাজ্যের রাজসিংহাসন, এই সাম্রাজ্যের রাজা—নয় কি? এই বিরাট বিচ্ছিন্নতা যে আমাদের চোখে পড়ে না, তার কারণ সে

শূন্য জায়গাটাকে যে আমরা অসংখ্য অসংখ্য আসবাব দিয়ে ভরে' দিয়েছি—এই বিচ্ছিন্নতা ঢাকবার জন্যেই এই বিচ্ছিন্নতাকে ভুলিয়ে দেবার জন্যেই সে-সব আসবাবের এত আড়ম্বর, রাজা যত বড় তাঁর প্রজামণ্ডলী থেকে তার পারিপার্শিক থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতাও তত সম্পূর্ণ আর তাঁর আসবাব পত্রের আড়ম্বরও তত বেশি। বহু শতাব্দী বহু পুরুষ এই আড়ম্বর এই জাঁকজমকে আমরা ভুলে ছিলেম। মন্ত্রী, আর সম্ভব নয়, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, আমি থাকতে চাই সংসারে সহজ হয়ে, সংসারের নিবিড়তম সংস্পর্শে। তাই আমি রাজসিংহাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি চাই।”

মন্ত্রী বললেন, “যুবরাজ এই সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রজামণ্ডলীর দাবী অগ্রাহ্য হবে? উপেক্ষিত হবে?”

রাজপুত্র উত্তর করলেন, “মন্ত্রী, প্রজামণ্ডলীর দাবী রক্ষা করতে আমি তখনই পারব যখন আমার দাবীও সেই সঙ্গে সঙ্গে সফল হয়ে উঠবে। আমার মিথ্যা দিয়ে প্রজামণ্ডলীকে সত্য উপহার কেমন করে' দেব? তাতে যে সার্থক কেউ-ই হ'য়ে উঠবে না।”

কিছুতেই কিছু হোল না। প্রজামণ্ডলীর মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি, চতুর মন্ত্রীর যুক্তিতর্ক, বৃদ্ধ রাজার কাতর ভাব, কিছুতেই কিছু হোল না। রাজপুত্রের কেবল এক কথা, আমি ছুটতে চাই, ছুটতে চাই, ছুটতে চাই, উদার আকাশের তলে অন্তহীন দিগন্তের পানে।

বিশাল সাত মহলা রাজপুরী—কত হাসি কত গান কত আমোদ কত উৎসব কত কলরব, সব এক বিরাট নৈরাশ্যের ছায়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। নহবতে নহবতে রসুনচৌকির সুর আর ফুটল না, ঘোড়াশালে লক্ষ ঘোড়া তাদের খাওয়া বন্ধ করল, হাতীশালে হাজার হাতীর চোখ

দিয়ে টস্ টস্ করে' জল পড়তে লাগল, ময়ূরের দল আর নাচল না, শারী শুকেরা ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে কাঁদতে বসল, হায়! যুবরাজ, যাঁর চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, তিনি কি না এমন সোনার সংসার ছেড়ে চলে যাবেন! আনন্দের পুরী অশ্রুতে অশ্রুতে ভরে' উঠল।

কিছুতেই যখন কিছু হোল না তখন রাজা সর্ব্ববিঘ্ননাশন এক যজ্ঞ করতে আদেশ করলেন।

প্রকাণ্ড এক যজ্ঞমণ্ডপ উঠল। যজ্ঞমণ্ডপ আগাগোড়া শুভ্র বস্ত্রমণ্ডিত হ'য়ে সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মত শোভা পেতে লাগল। দেশ বিদেশ থেকে কত ব্রাহ্মণ কত পণ্ডিত এলেন, কাশী কাঞ্চী মগধ মিথিলা কোশল পাঞ্চাল, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, কত কত দিক দেশ থেকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সব এসে যজ্ঞমণ্ডপ জুড়ে' বসলেন। যজ্ঞমণ্ডপ একেবারে গম্ গম্ করতে লাগল। কত পুরোহিত ঋত্বিক। বৈদিক মন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনিতে যজ্ঞমণ্ডপ গুম্ গুম্ করে' উঠল। হোমের আগুন লক্ লক্ জিহ্বা মেলে দিয়ে আকাশপানে দব্ দব্ করে' জ্বলে উঠল। অঞ্জলি অঞ্জলি আজ্যের সঙ্গে স্বাহা স্বাহা ধ্বনিতে সমস্ত ঘর ধ্বনিত হয়ে উঠল। যজ্ঞ শেষ হয়ে গেল। রাজপুত্র যজ্ঞভস্মের ফোঁটা কপালে এঁকে লক্ষ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ সঙ্গে নিয়ে প্রকাণ্ড এক সাদা ঘোড়ায় সোয়ার হলেন। রাজা এসে বললেন—"কুমার, আবার যেন ফিরে এসো।" রাণী এসে বললেন—"বাবা, আবার যেন ফিরো।" মন্ত্রী এসে বললেন—"যুবরাজ, আবার যেন ফিরে আসেন।" মন্ত্রীপুত্র কোটালের পুত্র এসে বললেন—"বন্ধু, দেখো যেন চিরকাল ভুলে থেকো না—আবার ফিরে এসো।" রাজপুত্র

হাসি মুখে সবাইকে বিদায় দিয়ে, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

(২)

প্রকাণ্ড ঘোড়া—দুধের মত রঙ্, রাজহংসীর মত গ্রীবা, রেশমের মত গা, বায়ুবেগে ছুটে চলল। রোদ পড়ে' তার সাদা রেশমী গা চিক্ মিক্ করতে লাগল, খোলা আকাশের মুক্ত বাতাস তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে' যেন তাকে উন্মত্ত করে' তুলল, ঘোড়া যেন পাখা লাগিয়ে বাতাসের আগে উড়ে চলল। রাজপুত্র ছুটে চললেন যেদিকে দু'চোখ যায়। এ রাজার মুল্লুক ছেড়ে ও-রাজার মুল্লুকে, ও-রাজার মুল্লুক ছেড়ে সে-রাজার মুল্লুকে, সে-রাজার মুল্লুক ছেড়ে আর রাজার মুল্লুকে, এমনি করে ছুটে চললেন। কত নদ নদী পর্ব্বত পল্লী নগর কত কানন প্রান্তর পার হয়ে রাজপুত্র ছুটে চললেন, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই। যে রাজ্যের ভিতর দিয়ে যান সেখানেই পুরুষরা বলাবলি করে—"আঃ, কে এমন ভাগ্যবান যে এমন পুত্রের জন্ম দিয়েছে। কুলাঙ্গনারা বলে, "উঃ, কেমন নিষ্ঠুর মা যে এমন ছেলেকে ছেড়ে জীবনধারণ করছে।" রাজপুত্র কত রাজ্য ছাড়িয়ে গেলেন। অঙ্গ বঙ্গ, মগধ মিথিলা, কোশল পাঞ্চাল, চোল চালুক্য, পল্লভ পাণ্ড্য, অবন্তী দ্বারকা—কত কত রাজ্য। এর পর ছুটতে ছুটতে একেবারে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছিলেন। আর চলবার উপায় নেই। সামনে ডা'নে বায়ে কেবল জল আর জল আর জল, কেবল নীল আর নীল আর নীল। সেই নীল জলের বুকে সাদা ফেনার মুকুট মাথায় দিয়ে লক্ষ উর্ম্মিবালারা সব হেলছে দুলছে উঠছে পড়ছে হাসছে,

নাচছে। নৃত্যেরও বিরাম নেই, মুখরতারও ক্লান্তি নেই। এখানে ছল্ ছল্ ছল্ ছল্ ছলাৎ, ওখানে চল্ চল্ চলাৎ; এমনি করে' সব লুটো-পুটি খাচ্ছে। পিছনের সমস্ত পৃথিবীর কল কোলাহল এখানে এসে থমকে গেছে, সমস্ত সংগ্রাম এখানে এসে লজ্জায় অবশ হ'য়ে গিয়েছে। এখানে কেবল একটা বিরাট নির্লিপ্ততা, সকল প্রকার সংকীর্ণতাকে যা মুক্তি দিয়েছে, সকল প্রকার বিরোধকে যা অসত্য করে' তুলেছে।

নোনাজলের গন্ধ পেয়ে রাজপুত্রের ঘোড়া আনন্দে চিঁহিঁহিঁ করে' উঠল। রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তার পর লাগাম ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ফেলে দিয়ে সমুদ্রের শুভ্র সৈকতে চিক্কণ বালির উপরে বসে পড়লেন। রাজপুত্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়ে গেল সেইখানে যেখানে সমস্ত আকাশটা নাচু হ'য়ে নেমে এসে সমস্ত সাগরটাকে আপনার বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

তখন সন্ধ্যা লেগে এসেছে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া রাজপুত্রের সারা শরীরে স্নিগ্ধ আদর ঢেলে দিতে লাগল। সে স্নিগ্ধ আদরের স্পর্শে রাজপুত্রের চোখ দুটো অম্নি বুঁজে বুঁজে আসতে লাগল। রাজপুত্র আর বসে' থাকতে পারলেন না, ধীরে ধীরে তন্দ্রামগ্ন হ'য়ে শুভ্র বালুশয্যায় ঢলে' পড়লেন।

সেই আধ-জাগা আধ-ঘুমের অবস্থায় রাজপুত্রের মনে হ'ল যেন হঠাৎ তার দু'কানের উপর থেকে দুটো পরদা খসে গেল। আর ঐ যে সমুদ্রের বিরামহীন মুখরতা, ও ত কেবল অর্থহীন কল্ কল্ ছল্ ছল্ ছলাৎ নয়। ঐ যে সমুদ্র আবহমানকাল ধরে' স্পষ্ট ভাষায় গান গাচ্ছে! আধ-ঘুমে রাজপুত্র শুনলেন সমুদ্র গাচ্ছে—

দুল্‌বি ওরে দুলবি যদি আমার সুনীল দোলাতে
নাম্‌রে আসি' আমার বুকের জীবন-মরণ-খেলাতে।
দিগন্তে যে বইছে বায়
অনন্তে যে স্বপ্ন ছায়
অস্তিমেতে পারব আমি তোদের সে-সব মিলাতে।

কূলের মায়া করিস্‌ কে রে? অকূলে কার নাইরে টান?
একটি বারে সাহস করি' শোন্‌রে আমার বুকের গান।
পলে পলে নৃত্য করি'
হিয়ায় পুলক উঠ্‌বে ভরি'
ছুটবে তরী আকুল বায়ে লক্ষ করি' শ্রেষ্ঠ দান।

আমার বুকেই মুক্তি পেল ওই রে তোদের জাহ্নবী।
আমার বুকের নেয় নি স্নেহ কোন্‌ কবি সে কোন্‌ কবি?
আমার বুকেই চন্দ্র-তারা
সারা নিশীথ তন্দ্রাহারা
এই বুকেরই পাঁজ্‌রা থেকে উষায় জাগে হেম রবি।

এই বুকেতেই গুপ্ত ছিল সুর-অসুরের সুধা রে
এই বুকেতেই মুক্ত চির মর্ত্ত্য-মনের ক্ষুধা রে।
এই হিয়ারই তলে তলে
শুক্তিবুকে মুক্তা ফলে
ঊর্ম্মিমালার সঙ্গে চলে মর্ত্ত্য-মনের সুধা রে।

এই বুকেরই 'পরে আকাশ নামায় অসীম তার কায়া
মুক্ত ওরে কুণ্ঠাবিহীন হেথায় মাটীর সব মায়া।
বদ্ধ মাটীর ক্ষুদ্র প্রাণী
আমার বুকের নিশাস্ টানি'
দেখ্‌লে প্রাণে তার গোপনে লুকিয়ে অসীম কোন্ ছায়া!

রাজপুত্র ফিরে ফিরে যেন কেবলই শুনতে লাগলেন—

দুল্‌বি ওরে দুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে

শুনতে শুনতে যেন সুনীল দোলায় দোল খেতে খেতে রাজপুত্র একেবারে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজপুত্রের যখন ঘুম ভাঙল তখন আকাশগায়ে অপসরীদের জোছনার আলপনা দেওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। আঁধার কেটে চারিদিক একটা অস্পষ্টতার মাধুর্য্যে ভ'রে গিয়েছে। রাজপুত্র এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন—হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল তাঁর ডান দিকে কিছু দূরে একেবারে সমুদ্রের বুক থেকে একটা ছোট্ট কালো পাহাড় উঠেছে আর সেই কালো পাহাড়ের উপরে একটা কি সাদা ধব্ ধব্ করছে। রাজপুত্র উঠে সেই দিকে যাত্রা করলেন।

রাজপুত্র পাহাড়ে উঠে দেখলেন এক প্রকাণ্ড রাজপুরী শঙ্খে-গড়া। শঙ্খের দরজা শঙ্খের জান্‌লা শঙ্খের ঘর শঙ্খের দেয়াল শঙ্খের সিঁড়ি, আগাগোড়া শঙ্খে গড়া। কিন্তু জনপ্রাণী শূন্য। শঙ্খের প্রকাণ্ড সিংহদরজা খোলা, শান্ত্রী নেই প্রহরী নেই, নবৎখানায় রসুনচৌকি নেই। রাজপুত্র সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে' অশ্বশালে গেলেন।

দেখলেন অশ্বশালে অশ্ব নেই, অশ্বপাল নেই, সব শূন্য। সেইখানে আপন ঘোড়া বেঁধে দানা-জল দিয়ে রাজপুত্র রাজপ্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

রাজপ্রাসাদে জনপ্রাণী বলতে কেউ নেই। চারদিকে থম্ থম্ করছে। শঙ্খে-গড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামে জ্যোছনা পড়ে' চক্ চক্ করছে, খোলা জান্‌লা দিয়ে জ্যোছনা এসে শঙ্খে-গড়া মেঝেয় পড়ে' তা ধব্ ধব্ করছে। মহলে মহলে জ্যোছনার আলো আর ঘরের ছায়া জড়িয়ে চারদিক যেন আরও নিবিড় আরও গভীর হয়ে উঠেছে। রাজপুত্র এ ঘর থেকে সে-ঘর, এ-কক্ষ থেকে সে-কক্ষ, এ-মহল থেকে সে-মহল করে' ফিরলেন। কোথাও একটু মানুষের ভাঁজ নেই। যেন সাগর-পারের কোন্ মায়াবিনী সাগর বুকের কোটী শঙ্খ কুড়িয়ে অমনি অমনি এক রাজপুরী তৈরি করে' রেখেছে।

শাদা ধব্ ধবে শঙ্খের সিঁড়ি। তাই বেয়ে রাজপুত্র দ্বিতলে উঠলেন। কক্ষে কক্ষে কত আসবাব-পত্র। শয়ন কক্ষে শঙ্খের পালঙ্ক পাতা, ভোজন কক্ষে শঙ্খের গালিচা বিছানো, স্নানের ঘরে সব আড়-দেওয়া শঙ্খের চৌবাচ্চা, কেবল জনপ্রাণী বলতে কেউ নেই। আর সার সার শঙ্খের পিঁজরে ঝুলছে সব শূন্য, একটাও পাখী নেই। সার দেওয়া টিয়েপাখীর দাঁড় ঝুলছে, সব শূন্য একটা টিয়ে নেই। এমনি সুন্দর সে রাজপুরী আর এমনি নিস্তব্ধ, যেন তা এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা কিন্তু রূপোর কাঠি ছোঁয়ান। কোথায় সে সোনার কাঠি যে কাঠিতে রাজকন্যা জাগবে। কোন্ সে রাজপুত্র যে সোনার কাঠি খুঁজে আনবে! রাজপুত্র এ-ঘর ও-ঘর আর কত করবেন, তাঁর দু'পা ধরে' গেল। ক্লান্ত দেহে তখন তিনি গিয়ে একটা পালঙ্কে

বসে' পড়লেন। অমনি যেন পালঙ্ক ধীরে ধীরে দুলতে লাগল রাজপুত্রের চোখ বুঁজে বুঁজে আসতে লাগল। চারিদিকে গম্ভীর নিস্তব্ধতা, তার মধ্যে রাজপুত্র যেন কেবল শুনতে লাগলেন—

দুল্‌বি ওরে দুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে—

শুনতে শুনতে পালঙ্কের উপরে রাজপুত্র একেবারে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

(৩)

তারপর দিন রাজপুত্রের যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য্যদেব সমুদ্রের নীল বুক থেকে একটুকু কেবল মাথা তুলেছেন, ঘুমের জড়িমা তখনও তাঁর চোখ থেকে যায় নি, লম্পট সেই ঢুলু ঢুলু নেত্রেই ঊর্ম্মিবালাদের গায়ে গায়ে সোনালি সোহাগ ঢেলে দিয়েছেন। দু' একটা অশান্ত রশ্মি তাঁর চোখ থেকে ছুট দিয়ে একেবারে রাজপ্রাসাদের উঁচু চূড়াতে গিয়ে চড়ে বসেছে। রাজপুত্র চোখ মেলেই দেখেন তাঁর পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে এক পরমা সুন্দরী বালিকা।

পরমা সুন্দরী! জ্যোস্নাবরণ তার রঙ, সোনার বরণ তার চুল, আকাশবরণ তার চোখ। সে রঙে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সে চুল একেবারে হাঁটুতে এসে পড়েছে, সে চোখে আকাশের বুকের মত প্রশান্ত আর সাগরের বুকের মত গভীর দৃষ্টি, রক্ত কমলের মত দু'খানি হাত, পা দেখা যায় না, কটিদেশ থেকে সাগরবরণ একটা ঘাঘ্‌রা নেমে পা দুটি ঢেকে একবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে,

সারা দেহে আর দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, সব অনাবৃত। দুটি হাতে দুখানি মুক্তা বসান শঙ্খের কাঁকন—আর দ্বিতীয় অলঙ্কার নেই।

রাজপুত্র বিস্মিত হয়ে পালঙ্কের উপরে উঠে বসলেন, প্রশংসার আলোকে তাঁর দুটি চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। রাজপুত্র বালিকার দিকে কতক্ষণ চেয়েই রইলেন, মনে মনে বললেন, এমন ত কখনও দেখি নি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "বালা তুমি কে? তোমায় আমি ভালবাসব।"

অমনি নবৎখানায় রসুনচৌকি বেজে উঠল। রাজপুত্র আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন—"একি! রসুনচৌকি বাজে কোথা থেকে, কাল যে সব শূন্য ছিল!"

বালিকা বললে—"আজ যে আমি এসেছি!"

অমনি হাজার পাখীর সুমিষ্ট কাকলি জেগে উঠল। রাজকুমার বিস্মিত হ'য়ে বললেন—"একি! এত পাখী ডাকে কোথা থেকে, পিঁজরে যে সব শূন্য ছিল!"

বালিকা তেমনি উত্তর দিলে—"আমি যে আজ এসেছি!"

অমনি হাতীশালে হাজার হাতী বৃংহতিনাদ করে উঠল, ঘোড়াশালে লক্ষ ঘোড়া চিঁহিঁহিঁ করে উঠল। রাজপুত্র চমৎকৃত হয়ে বললেন—"এত হাতী এত ঘোড়া এল কোথা থেকে, কাল ত কিছুই ছিল না?"

বালিকা আবার তেমনি উত্তর করলে—"রাজকুমার, আজ যে আমি এসেছি।"

রাজপুত্র ছুটে ঘর থেকে বেরুলেন। দেখলেন বারান্দায় সার সার পিঁজরেতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ছে, নাচছে, গাচ্ছে, ডানা

নাড়ছে, গা ঠোকরাচ্ছে। রাজপুত্র নীচে নামলেন। কোথায় সে নিস্তব্ধ পুরী। চারিদিক লোকজনে একেবারে গম্ গম্ করছে। দাস দাসী শাস্ত্রী প্রহরী দৌবারিক প্রতিহারী যেন মুহূর্ত্তে কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে সব জেগে উঠেছে। দরজায় দরজায় শাস্ত্রীরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে' রাজপুত্রের পথ ছেড়ে দিলে। রাজপুত্র হাতীশালে গিয়ে দেখেন হাজার হাতী হাজার মাহুত। ঘোড়াশালে গিয়ে দেখেন লক্ষ ঘোড়া লক্ষ সোয়ার। রাজপুত্র তেমনি ছুটে আবার উপরে উঠলেন। বালিকাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কে?"

বালিকা একটু মৃদু হাসলে। যেন রক্তকমলের দুটি পাঁপড়ির ফাঁকে এক সার ঘন বিন্যস্ত যূথীর কলি জেগে উঠল। বালিকা হেসে বললে—"আমার নাম প্রেম।"

"প্রেম?—বড় ত সুন্দর!" রাজপুত্র প্রেমের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে নীল চোখে কি এক গভীর দৃষ্টি, তার তলই পাওয়া যায় না। সে-দৃষ্টিতে রাজপুত্র যেন একেবারে হারিয়ে গেলেন। বললেন—"প্রেম, আমি তোমায় ভালবাসি—আমাকে ভালবাসবে?"

প্রেম উত্তর দিলে—"রাজকুমার, আমাকে যে ভালবাসে আমিও তাকে ভালবাসি।"

রাজপুত্রের বুকের কাছটায় যেন কি একটা ফেটে গিয়ে তার ভিতরকার রঙীন স্রোত তাঁর সমস্ত শিরায় উপশিরায় চারিয়ে গেল, তারি নেশায় তাঁর দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণু নেচে উঠল। ওরে মূর্খ, ওরে নির্ব্বোধ! ব্যর্থতা কোথায়?—সাতমহলা পুরীতে নয়, দ্বারে দ্বারে দ্বারীতে নয়, খেতে শুতে দণ্ড প্রহর জানানোতে নয়, সাত শ' লোকের হৈ হৈ রৈ রৈ-তে নয়—আছে তা কেবল হৃদয়ের

সুন্দরহীনতায়, আছে তা কেবল জীবনের জড়ত্বে। এই ত আজ সাতমহলা পুরী, দ্বারে দ্বারে দ্বারী, তবে এর দেয়াল এমন রঙীন হয়ে উঠল কেন?—অন্তরের ঐ আগুন লেগে রে নির্ব্বোধ। শিরায় উপশিরায় ঐ নেশা লেগে। রাজপুত্র বললেন—"প্রেম, যদি তোমায় পেতেম তবে আমার নিজ রাজ্য ছেড়ে আসতেম না।"

প্রেম জিজ্ঞেস করল—"তোমার নিজ রাজ্য ? সে কোথায় রাজকুমার ?"

দু'জনে গিয়ে পালঙ্কে বসল। তারপর রাজপুত্র আপনার কাহিনী বলতে সুরু করলেন। কেমন করে' তাঁর সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিল, কেমন করে' পিতার ইচ্ছা, মন্ত্রীর অনুরোধ, মায়ের চোখের জল, প্রজামণ্ডলীর অনুরাগ, সমস্ত উপেক্ষা করে' তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে' এলেন। তারপর কত রাজ্যের ভিতর দিয়ে দিন নেই রাত নেই নিদ্রা নেই, আহার নেই, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই—তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে রাত দিন কেবল ভ্রমণ করেই বেড়ালেন। তারপর অবশেষে কেমন করে' এই শঙ্খের রাজপুরীতে এসে পৌঁছিলেন, রাজপুত্র অনর্গল কথা বলে' যেতে লাগলেন যে, সে কত গল্প, তাঁর মুখ দিয়ে যেন গল্পের স্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল। কোন্ দিক দিয়ে দিন কেটে গেল। সূর্য্য সারা আকাশ দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পশ্চিম সমুদ্রে ঝুপ করে' ডুব দিলেন, পশ্চিম আকাশে সোনালি আবির উড়তে লাগল, নবৎখানায় পূরবী রাগিনী বেজে উঠল, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল, রাজপুরীর লক্ষ কক্ষে লক্ষ দীপ জ্বলে উঠল। প্রেম পালঙ্ক থেকে চমকে নেমে দাঁড়াল, বলল—"রাজকুমার, আমার যাবার সময় হ'ল, আজ তবে আসি।"

—“আজ তবে আসি? সে কি প্রেম! সে কি প্রেম!”—রাজপুত্র ব্যথিত আকুল কণ্ঠে বললেন—“তুমি এই যে বললে আমায় ভাল বাসবে, তবে আবার কোথায় যাবে?”

প্রেম বললে—“রাজকুমার, আমাকে এখন নিজ ঘরে ফিরতে হবে, কাল আবার আসব।”

রাজপুত্র আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—“তোমার নিজ ঘর!—সে আবার কোথায়? আমি যে মনে করেছিলেম তুমি এই রাজপুরীরই রাজকন্যা, কাল কোথায় কোন্ মহলে লুকিয়ে ছিলে।”

প্রেম উত্তর করলে—“না রাজকুমার, আমি রাজপুরীর রাজকন্যা নই। আমার ঘর ঐ ওখানে—সাগরবুকে।” বালিকা আঙুল দিয়ে বাতায়নের ফাঁকে দেখিয়ে দিলে সমুদ্র।

রাজপুত্র অমনি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারের ছাদে গেলেন। ছাদের আলসেতে কনুই রেখে যতদূর দৃষ্টি চলে তাঁর সামনে ডানে বায়ে দেখতে লাগলেন। দেখলেন কেবল জল, আর জল, আর জল। রাজপুত্র ফিরে এসে প্রেমকে বললেন—“কই সাগর বুকে ত কোনো ঘর বাড়ীর চিহ্ন নেই!”

প্রেম বললে—“সাগরবুকের উপরে নেই তার নীচে আছে। কুমার, আমার ঘর সাগরবুকের যেখানে প্রায় অতল সেইখানে। যেখানে সাগরবুকের ঊর্ম্মিবালারা তাদের নৃত্যে নৃত্যে আকাশের আলোক আর বাতাস মিশিয়ে আমার ঘর তৈরি করে দিয়েছে, সেইখানে আমি থাকি।”

রাজপুত্র বিস্ময়ে সংশয়ে কতক্ষণ চুপ করেই রইলেন। তারপর বললেন, “প্রেম, কাল আসবে ত?”

প্রেম উত্তর দিলে—"আসব বই কি রাজকুমার—নিশ্চয়ই আসব।"

—"আচ্ছা তবে এসো।"

বালিকা রাজপুরী ত্যাগ করে' চলে গেল।

রাজকুমার গিয়ে পালঙ্কে বসলেন। তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পুলক খেলে বেড়াতে লাগল। দু'-বছরের দেশ-বিদেশে ভ্রমণ তাঁর, আজ সে কত দূর। আর আজ এই রাজপুরী তাঁর ছেড়ে যাবার উপায়ই নেই। আজ তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু সে শৃঙ্খল, সে কি হালকা! কেবলই হালকা, না তার চাইতেও বেশি, সে কি তৃপ্তির, কি শান্তির, সে কি সার্থক! এই শৃঙ্খলে আজ তাঁর এ কী মুক্তি! বাইরের দু' বছরের তাঁর স্বাধীনতার মুক্তি, কেবল শূন্যের বোঝায় সে কী ভারাক্রান্ত! কী অশান্ত! আর আজ এই শৃঙ্খলে মুক্তি ঐশ্বর্য্যে সে কী সম্পদময়, কী শান্তিপূর্ণ!

রাজপুত্র স্বপ্নে কেবল বালিকাকেই দেখতে লাগলেন, তার আকাশ-বরণ চোখ—সে চোখের সাগর-গভীর দৃষ্টি।

(৪)

দু' বছর কেটে গেল। রোজ সূর্য্য-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম তার জ্যোছ্না-বরণ রঙ্, সোনার-বরণ চুল, আকাশ-বরণ চোখ, সাগর-বরণ ঘাঘ্রা নিয়ে রাজপুরীতে উপস্থিত হয়। রাজপুত্রের সঙ্গে গল্পে-গানে সারা দিন কাটিয়ে আবার সূর্য্য-ডোবার সঙ্গে সঙ্গে চলে' যায়। দুটি বছরের প্রত্যেক দিনটি ঠিক একই ভাবে কেটে গেল। সেই একই

রাজপুরী, মহলে মহলে একই দাসদাসী, তাদের একই আনাগোনা, দেউড়ীতে দেউড়ীতে একই শান্ত্রী প্রহরী, এদের একই সোর-গোল, নহবতে নহবতে একই রসুনচৌকি, তার ভোর-দুপুর-সন্ধ্যায় একই সুর, সেই সবই কেবল এক, যা রইল না সে হচ্ছে রাজপুত্র নিজে।

সেই সাতমহলা পুরীতে রাজপুত্র আর একা রইলেন না! দু'বছর আগে যখন তাঁর প্রেমের সঙ্গে দেখা হয় তখন কি তৃপ্তিতেই তাঁর অন্তরাত্মা ভরে' গিয়েছিল, কি আনন্দের আলোকেই তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল, কি শান্তিতেই তাঁর অস্তিত্ব জুড়িয়ে গিয়েছিল। আর আজ, আজ তাঁর অন্তরাত্মার এ কি আসোয়াস্তি, তাঁর চোখ দুটিতে কি এক জ্বালা, কি এক বিরাট রাক্ষসী ক্ষুধার অবলেপ, এ কি নিবিড় ব্যথা! রাজপুত্রের চোখ দুটি তার সমস্ত জ্বালা নিয়ে প্রেমের মুখ থেকে ধীরে ধীরে নেমে তার বুকে গিয়ে নিবদ্ধ হ'ল। আঃ, ঐ যে ঐ বুকের উপরে ঠিক তাঁরই হাতের মাপে মাপে দুটি পদ্মের কলি কে জাগিয়ে তুল্‌ছে। ঐ যে সেই পদ্মকোরক দুটির শীর্ষদেশটায় লালচে আভা, তা বুঝি তাঁরই হৃদয়শোণিতের অবলেপ।

ছিলে গো ছিলে, প্রেম! তুমি একদিন অতি সুকুমার ছিলে, আমি একদিন অতি কিশোর ছিলেম, সেদিন আমাদের মিলন ছিল একটু হাসির মিলন, একটি দৃষ্টি বিনিময়ের মিলন। আজ এ প্রদীপ্ত যৌবনে সে অল্পে সুখ কোথায়, তৃপ্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়? এ যৌবনের উন্মত্ততাকে কি দিয়ে শান্ত করবে প্রেম? একটি দৃষ্টি দিয়ে? দুটো কথা দিয়ে? একটুকু হাসি দিয়ে?—সে স্বল্পতাকে জীবন যে কখন্ ছাড়িয়ে গেছে!

না, না প্রেম! আজ আমি চাই তোমার নিবিড়তম আলিঙ্গন। তোমার কথা, তোমার গান, সে যে আজ কত ব্যবধানের। আজ চাই তোমার ঐ দেহ-বল্লরী আমার এই বিশাল বুকের উপরে পিষ্ট হ'য়ে যাবে, তোমার হাসি তোমার দৃষ্টি, সে যে আজ কত স্বল্পতার! বুকে বুকে মুখে মুখে চোখে চোখে দেহের প্রত্যেক অণুতে অণুতে আজ মিলন, আজ বিনিময়—তবেই আজ তৃপ্তি, তবেই আজ আমার এ আত্মার বিদ্রোহের শান্তি। আমার এ রাক্ষসী ক্ষুধার কাছ থেকে কি দিয়ে আত্মরক্ষা করবে প্রেম? কি দিয়ে? আমি চাই এর চাইতে কোন্ আর তোমার বড় সত্য আছে প্রেম? কোন্ বড়? আমি চাই— কেবল অশরীরী তোমাকে নয়, তোমার দেহের প্রত্যেক অণুটির জন্যে আজ আমার দেহের প্রত্যেক অণুটি উন্মাদ। এ উন্মাদকে কি দিয়ে ঠেকাবে? এ উন্মাদকে কিসের সান্ত্বনা দেবে? একটু হাসির? একটু গানের?—পাগল!

সূর্য্য ডুবে গেল, নবৎখানায় পুরবী রাগিনী বেজে উঠল, হাজার কক্ষে হাজার দীপ জ্বলে' উঠল। প্রেম পালঙ্ক থেকে নামতেই রাজপুত্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"প্রেম! একদিনও কি আমার এই রাজপুরীতে রাত্রিযাপন করবে না? অমরত্বকে কি চিরকাল এড়িয়ে চলবে?"

প্রেম চমকে উঠল, তার শঙ্খের মত কান দুটো গোলাপের মত লাল হ'য়ে উঠল, গোলাপের মত গণ্ড দুটি শঙ্খের মত সাদা হয়ে গেল, শুকনো চোখ সজল হ'য়ে এলো, সরস ঠোঁট শুকনো হ'য়ে গেল। প্রেম তার দৃষ্টি রাজপুত্রের চোখের উপরে স্থাপিত করে' বললে— "রাজকুমার, তোমার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি কিন্তু এখানে রাত্রিবাসের আমার উপায় নেই।"

রাজপুত্র দেখলেন প্রেমের চোখ দুটিতে কি এক দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে কি এক নীরব মিনতি, কি এক করুণ-ভৎর্সনা। রাজপুত্র সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর দৃষ্টি অবনত হ'য়ে গেল। রাজপুত্র যখন চোখ তুললেন তখন দেখলেন তিনি একা। প্রেম কখন্ চলে গিয়েছে।

রাজপুত্রের অন্তরে যেন সহস্র শার্দ্দূল গর্জ্জে উঠল, লক্ষ ফণী ফণা বিস্তার করে' রক্ত চক্ষু মেলে দিল। অত্যাচার, অত্যাচার, আমি এ অত্যাচার সহ্য করব না। আমি চাই চাই-ই প্রেমকে, আরও কাছে আরও কাছে, আরও কাছে। এ চাওয়াকে চিরকাল ব্যর্থ হতে দেব না।

রাজপুত্র ডাকলেন—"প্রতিহারী, প্রতিহারী।"

প্রতিহারী ত্রস্তে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল। রাজপুত্র খানিক-ক্ষণ শির নত করে' কি চিন্তা করলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—"আচ্ছা তুমি যাও।"

রাজপুত্র সেদিন সারারাত পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের মত পায়চারি করে' বেড়ালেন।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রেম এলো তখন রাজপুত্র তাকিয়ে দেখলেন, সে কি সুন্দর, কি স্নিগ্ধ, কি কোমল। যেন শিশির-ভেজা সদ্যফোটা পদ্মটি, সে পদ্মের পাঁপ্‌ড়িতে পাঁপ্‌ড়িতে হাসি, সে হাসির অন্তরালে অন্তরালে আমন্ত্রণ। এ কি সত্য সত্যই আমন্ত্রণ, না শুধু তাঁর নিজের প্রাণের আকাঙ্খার প্রতিবিম্ব?

দিন কেটে গেল, সূর্য্যদেব পাটে বসলেন। নহবৎখানায় পূরবী রাগিনী বেজে উঠল, কক্ষে কক্ষে লক্ষ দীপ জ্বলে উঠল, প্রেম পালঙ্ক থেকে নেমে বললে—"কুমার, তবে আজ আসি।"

রাজপুত্র উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দুই বাহু তাঁর বুকের উপরে

ন্যস্ত করে বললেন—"প্রেম! আমার আদেশে আজ পুরীর সিংহদ্বার রুদ্ধ, আমার আদেশ ব্যতীত তা খুলবে না।"

অমনি নহবৎখানার রাগ-আলাপ থমকে গেল, পাখীদের কাকলী-রব স্তব্ধ হ'য়ে গেল, কক্ষে কক্ষে দীপশিখা সব স্থির নিস্পন্দ হ'য়ে গেল। সমস্ত রাজপুরীটার প্রত্যেক বস্তুটি যেন কান খাড়া করে' সজাগ হ'য়ে উঠল।

কক্ষতলে দু'জনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারো মুখে একটি কথা নেই। নিমেষের পর নিমেষ কেটে যেতে লাগল। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের অনেক পথ উঠে ঊর্ম্মিবালাদের গায়ে রূপোর বসন জড়িয়ে দিল। প্রেম বললে—"রাজকুমার, আমায় মুক্তি দাও।"

রাজকুমার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"প্রেম, প্রেম, যদি আমার অন্তরের তীব্র দাহ বুঝতে পারতে, যদি জানতে কেমন করে আমার হৃদ্‌পিণ্ডের পরতে পরতে সূক্ষ্ম শৃঙ্খল কেটে বসেছে, যদি জানতে—" রাজপুত্রের উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠ ক্রমে ক্রমে উন্মাদের মত হ'য়ে উঠল, তাঁর চোখ দুটি জ্বল জ্বল করতে লাগল, রাজপুত্র দুই বাহু বিস্তার করে' গদ গদ কণ্ঠে বললেন--"প্রেম, প্রেম, এসো আজ সমস্ত দূরত্ব সমস্ত ব্যবধান নির্ব্বাসিত হোক।"

প্রেম কেঁপে উঠল, পরমুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করে' ছুটে' পাশের দরজা দিয়ে সমুদ্রের দিক্‌কার ছাদের উপরে বেরিয়ে গেল।

রাজপুত্র ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত তার পিছনে পিছনে ছুটে বেরুলেন। প্রেম ছাদের আলিসাতে উঠতে-না-উঠতে বাম বাহু দিয়ে তার কটি আকর্ষণ করে' আপনার বক্ষের উপর টেনে নিলেন, রাজপুত্রের দক্ষিণ হস্তের নিষ্ঠুরতার নীচে তার হৃদয়পদ্ম পিষিত হ'য়ে গেল,

আর ঠোঁট দুখানির উপর রাজপুত্রের ঠোঁট দুটি যেন একটি শেষ মৃত্যু-আলিঙ্গনে কঠিন হ'য়ে বসে' গেল।

সে-চুম্বনে প্রেমের শিরায় শিরায় একটা তড়িৎ প্রবাহ উন্মাদের মত ছুটে গেল, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল, সে কম্পনে তার নীবিবন্ধের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে গেল, ঘাঘ্‌রা খস্‌ খস্‌ করে উঠল, তারপর সর্‌ সর্‌ করে' তা প্রেমের কাটিচ্যুত হ'য়ে খসে পড়ল।

প্রেমের কণ্ঠ থেকে একটা নিদারুণ "ওঃ" শব্দ রাজপুত্রকে যেন মুহূর্ত্তের জন্যে চেতনা ফিরে দিল, প্রেম দু'হাতে চরম শক্তি সংগ্রহ করে' রাজপুত্রকে ঠেলে দিলে, তারপর দু'হাতে চোখ মুখ ঢেকে শির অবনত করে' দাঁড়িয়ে রইল।

রাজপুত্র তখন দেখলেন তাঁর সামনে নগ্ন নারী মূর্ত্তিটিকে। দেখতে দেখতে, দেখতে দেখতে তাঁর সমস্ত দেহ স্থির নিশ্চল নিস্পন্দ হ'য়ে গেল, তাঁর চোখ দুটি ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে পাথরের মত কঠিন হ'য়ে উঠল।

রাজপুত্র দেখলেন সেই নগ্ন মূর্ত্তিকে। দেখলেন মাথা থেকে কটি পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট সুন্দর এক বালিকা মূর্ত্তি, আর কটি থেকে নেমেছে একটি নিটোলে নিরেট শল্কাবৃত মৎস্যপুচ্ছ।

প্রেম ধীরে ধীরে মাথা তুলল। তারপর বিশ্বের বেদনার কণ্ঠ নিয়ে বললে—"রাজকুমার, আমি অর্দ্ধেক নারী অর্দ্ধেক মাছ, অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক পশু। আমার যে অংশ পশু সে অংশকে আমি অতি যত্নে তোমার কাছ থেকে গোপন করে' রেখেছিলেম, সেই পশুকে আজ তুমি অনাবৃত করলে, আর আমার সাধ্য নেই তোমার জীবনে স্বর্গের পরশ ব'য়ে আনতে, আজ এইখানে আমাদের চির-বিদায়।"

রাজপুত্র স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মৎস্যনারী ধীরে ধীরে আলিশার উপরে উঠে আপনাকে নীচ সাগরে ছেড়ে দিল। মুহূর্ত্তে চাঁদের কিরণে মৎস্যপুচ্ছের আঁশগুলো চিক্‌মিকিয়ে উঠল, তারপর ঝুপ্ করে' একটা শব্দ হল, মুষ্টিখানিক হীরকচূর্ণ চারিদিকে ছড়িয়ে গেল, এক নিমেষের তরে জলবুদ্‌বুদেরা পুঞ্জ বাঁধল, তারপর সাগর-বুকের সেই চিরন্তনের গান—

দুল্‌বি ওরে দুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে।—

রাজপুত্র কাঁদতে কাঁদতে ছাদ থেকে ভিতরে ফিরলেন। ভিতরে এক পা ফেলতেই রাজপুত্র থম্‌কে দাঁড়ালেন। কোথায়, কোথায়? সে কক্ষে কক্ষে দীপের মালা, সে পিঞ্জরে পিঞ্জরে পাখী, দাঁড়ে দাঁড়ে টিয়ের দল! চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম, চারিদিকে আঁধার। রাজপুত্র ছুটে নীচে নামলেন, কোথায় সে দাস দাসী শান্ত্রী প্রহরী দৌবারিক প্রতিহারী সব শূন্য, কোথায়ও একটি জনপ্রাণী নেই, রাজপুত্র গিয়ে দেখেন হাতীশালে একটি হাতী নেই একজন মাহুত নেই, ঘোড়াশালে একটি ঘোড়া নেই একজন শোয়ার নেই, নহবতে রসুনচৌকি নেই। রাজপুত্র রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন চারিদিক শূন্য, নিঝুম, নিঝুম চাঁদের আলো থামের ফাঁকে ফাঁকে আড় হয়ে এসে মেঝেয় পড়ে চারিদিক আরও নিবিড় আরও গভীর করে' তুলেছে। রাজপুত্র হাজার মণ পাথর পায়ে নিয়ে যেন ধীরে ধীরে অতি কষ্টে সিঁড়ি ভেঙে দ্বিতলে উঠলেন, তারপর পালঙ্কে গিয়ে আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর দীর্ঘ নিশ্বাসে নিশ্বাসে প্রকাণ্ড রাজপুরী থম্‌থমে হ'য়ে উঠল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জয়দেব।

—:*:—
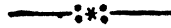
[এটি আমার প্রথম লেখা। এ প্রবন্ধের পূর্ব্বে আমি বাঙলা ভাষায় গদ্য ত দূরের কথা, কখনো দু'ছত্র পদ্যও লিখি নি। তবে যে হঠাৎ একদিন এত বড় একটি প্রবন্ধ লিখে শেষ করলুম তার কারণ, ওটি আমি লিখতে বাধ্য হয়েছিলুম।

আমি B. A. পাশ করে' যখন M. A. ক্লাসে ভর্ত্তি হই, সেই সময়ে এই কলিকাতা সহরের একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভাতেও ভর্ত্তি হই। শুনতে পাই সেই সাহিত্য-সভা কালক্রমে বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়েছে। শুনতে পাই বলছি এই কারণে যে, যে-তিন বৎসরের ভিতর সে-সভার এই রূপান্তর ও নামান্তর ঘটেছে সে তিন বৎসর আমি একটানা ইংলণ্ডে ছিলুম। দেশে ফিরে এসে দেখি সভার আয়তন বৃদ্ধি হয়েছে, ও নামের পরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং সভাস্থলে কাব্যের পরিবর্ত্তে ব্যাকরণের আলোচনা হচ্ছে।

আমাদের সেই ছোট এবং ঘরাও সাহিত্য-সভার একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ছিল এই যে, তার প্রতি সভ্যকে পালায় পালায় একটি করে' প্রবন্ধ পাঠ করতে হত। এবং এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়েই আমি এই প্রবন্ধটি লিখি।

আমি যদি উক্ত সভায় যোগ না দিতুম ত আমার বিশ্বাস, আমি জীবনে আর যাই করি, বাঙলা কখনো লিখতুম না। উক্ত সভাই আমাদের পাঁচজনকে বাঙলা লেখবার নেশা ধরিয়ে দেয়। যে ক'জন উক্ত সভায় মেম্বর ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই অদ্যাবধি বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চা করে আসছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "ব্রহ্মবিদ্যা" এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি "সাহিত্য" নিয়মিত প্রচার করছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ "নারায়ণ" পত্রের সম্পাদন করছেন এবং অবসর মত বাঙলা কবিতাও রচনা করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত I. C. S. সম্প্রতি বাঙলা

নাটক লেখায় মনোনিবেশ করেছেন। তারপর সে সভার যে তিনজন সভ্য দেহত্যাগ করেছেন তাঁরা সকলেই আ-মরণ সাহিত্য-চর্চ্চা করেছিলেন। ৺অক্ষয় কুমার বড়ালের বঙ্গ-সাহিত্যে কীর্ত্তির পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ৺অনাথকৃষ্ণ দেব সাহিত্য-চর্চ্চাই তাঁর জীবনের ব্রত করে তুলেছিলেন, এবং আমার অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু ৺নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়, তাই তিনি এক "প্রিয়দর্শিকা"র অনুবাদ ব্যতীত বঙ্গ-সরস্বতীর ভাণ্ডারে আর কিছু দান করে যেতে পারেন নি।

এ সভার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলা বাহুল্য যে, বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় তিনিই আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনিই আমাদের বাঙলা সাহিত্যকে এতদূর ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন যে, যদিও আমরা জীবনে নানা বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছি, এবং এমন সব ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী হয়েছি যার সঙ্গে বাঙ্গলা-ভাষা ও বাঙ্গলা-সাহিত্যের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই, তবুও আমাদের কেউ ও-ভাষা আর ও-সাহিত্যের মায়া অদ্যাবধি কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

আমার এই প্রথম বয়সের প্রথম লেখাটির পাণ্ডুলিপি আমি এতকাল ধরে সযত্নে রক্ষা করে এসেছি এই কারণে যে, একদিন সেটি অবিকৃত রূপে প্রকাশ করবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। এ প্রবন্ধ পূর্ব্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় কিন্তু সে নিতান্ত খণ্ডিত আকারে। কেননা প্রবন্ধটিতে স্থানে স্থানে এমন সব স্পষ্ট কথা আছে যা সেকালের মতে প্রকাশযোগ্য ছিল না। আমি অবশ্য সে মত কখনই গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। এতদিন পরে আজ সেটিকে আদ্যোপান্ত ছাপার অক্ষরে তুলতে সাহসী হচ্ছি এই বিশ্বাসে যে, আজকের দিনে বাঙলার সাহিত্যসমাজে স্পষ্ট কথা কারও পক্ষে অরুচিকর হবে না।

এ প্রবন্ধ পুনঃ প্রকাশ করবার অপর একটি কারণ আছে।

আমার রচনা-রীতি, আমার মতামত যাদের মনঃপূত হয় না, তাঁরা অনেক সময়ে আমার নামের আগে বিলেত-ফেরত বিশেষণ বসিয়ে দেন। সম্ভবত

পাঠক-সমাজকে এই কথা বোঝাতে যে, আমার মতামতসকল আমি বিলেত গিয়ে সংগ্রহ করেছি। কথাটি যে সত্য নয় তার প্রমাণ পাঠকমাত্রেই আমার বিলাত যাত্রার তিন বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এই প্রবন্ধেই পাবেন। আমার হাল লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা স্পষ্টই দেখতে পাবেন যে আমার একালের ও সেকালের মতামতের পিছনে একটি বিশেষ জাতির মন আছে নূতন দেশ কালের স্পর্শে যে মনের জাত যায় না। তিন বৎসর বিলাত-বাসের ফলে আমার মনের ও মতের যে কিছু বদল হয় নি, এমন কথা বললে একটা মস্ত বাজে কথা বলা হবে, আমার বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, বিলাত গিয়ে আমার মনের ধাৎ বদলে যায় নি। সুতরাং আমার নামের পূর্ব্বে 'বিলেত-ফেরত' জুড়ে দেবার কোনই সার্থকতা নেই। ও-বিশেষণের সাহায্যে আমার লেখার সুবিচার কেউ করতে পারবেন না।

প্রবন্ধটি যেমন লেখা হয়েছিল তেমনিই ছাপা হচ্ছে—আমি তার একটি বর্ণও বদল করছি নে, এমন কি তার ভুলভ্রান্তিও সংশোধন করে দিচ্ছি নে। ফোটোগ্রাফির পরিভাষায় যাকে re-touch বলে তাতে ছবি সুন্দর দেখালেও, সে ছবি কার ছবি তা সকল সময়ে এক নজরে ধরা যায় না। আমি আমার যৌবনের মনের ছবি লোকের চোখের সুমুখে ধরে দিতে চাই বলে ও-প্রবন্ধকে আর re-touch করলুম না, এই ভয়ে যে সে স্পর্শে পাছে মূর্ত্তিটি প্রৌঢ় হয়ে উঠে। যৌবন-সুলভ লেখার যেমন অনেক দোষ থাকে তেমনি কোনো কোনো গুণও থাকে যা আমরা যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে বসি। এই কারণে আশা করি যে, আমার একালের লেখা যাঁদের কাছে অগ্রাহ্য নয়, এ লেখাটিও তাঁদের কাছে অগ্রাহ্য হবে না, এবং পাঠকমাত্রেই আমার অনেক কড়া মতামতের ভিৎ এই প্রবন্ধের মধ্যে আবিষ্কার করবেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।]

* * * * *

একখানি সাহিত্যগ্রন্থকে দুইরকম ভাবে আলোচনা করা যায়:—প্রথমত: কাব্যস্বরূপে, দ্বিতীয়ত: ঐতিহাসিকতত্ত্ব আবিষ্কারের উপায়-স্বরূপে।

প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা কেবল মাত্র তাহার দেশ-কাল নিরপেক্ষ কাব্যহিসাবে দোষ-গুণ বিচারে সমর্থ হই।

দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা তাহা যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে দেশে রচিত হইয়াছিল, সেই দেশের তৎসাময়িক অবস্থা সকলের আলোচনা দ্বারা তাহার তদ্দেশীয় অন্যান্য কাব্য সকলের সহিত কি সম্বন্ধ এবং তাহার দোষ ও গুণ কোন্ কোন্ বিশেষ কারণপ্রসূত, এই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

কাব্যের দোষ-গুণ বিচার করাই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক প্রথায় আলোচনা উক্ত বিচারের সহায়তা সাধন করে মাত্র। কিন্তু এই উভয় পদ্ধতির মিলিত সাহায্যেই যথার্থ সমালোচনা করা যায়।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে সংস্কৃত সাহিত্যে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকায় শ্রীমদ্ভাগবদাদি গ্রন্থের সহিত জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের কি সম্বন্ধ তাহা আমার নিকট অবিদিত। এবং ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধেও আমার পরিমিত জ্ঞান—জয়দেবের সময়ে, অর্থাৎ—বঙ্গীয় রাজা লক্ষণ সেনের সময়ে বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাদির সম্যক্ নির্দ্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুতরাং উপস্থিত প্রবন্ধে—আমাকে জয়দেবের গ্রন্থ কেবলমাত্র কাব্যহিসাবে বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। আর একটি কথা, শুনিতে পাই গীতগোবিন্দের নাকি একটি আধ্যাত্মিক অর্থ

আছে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় মিলনের বিষয়ই নাকি রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোনও পরিচয় নাই। জয়দেব তাঁহার কাব্যে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সহজ ও প্রচলিত অর্থ অনুসারে যতটা বুঝা যায় তাহাই বুঝিয়াছি—কোনও নিগূঢ় অর্থ উদ্ভাবনও করিতে পারি নাই। আমার কাছে কৃষ্ণ ও রাধাকে আমাদেরই মত রক্তমাংসে গঠিত মানুষ বলিয়া বোধ হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রেমকেও স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত সাধারণ মানব-প্রেম বলিয়াই বুঝিয়াছি। যদি যথার্থই একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাব কাব্যখানির প্রাণস্বরূপ হয় তাহা হইলে আমি উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা একান্ত অর্থশূন্য। সূচনাস্বরূপ এই অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখমাত্র করিয়া আমি আসল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(২)

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক দুই চারিটি ঘটনা লইয়া জয়দেব গীত-গোবিন্দ রচনা করিয়াছেন।

একদিন কৃষ্ণ গোপিনীগণ সমভিব্যাহারে যমুনাতীরে বসন্তবিহার করিতেছিলেন এমন সময়ে রাধা বেশভূষা করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে তথায় আসিয়া উক্ত ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণও একান্ত অপ্রতিভ হইয়া মৌন-ভাব ধারণ করিয়া রহিলেন এবং রাধাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টামাত্র করিতেও সাহসী হইলেন না। কিন্তু রাধা চলিয়া

গেলেন দেখিয়া তিনি গোপবধূদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোন এক নিভৃত কুঞ্জবনে আশ্রয় লইয়া মনোদুঃখে রাধার কথা ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে রাধা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণকৃত পূর্ব্ব বিহার স্মরণে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে আনয়নার্থ তাঁহার নিকট সখি প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সখিকে বলিলেন, "আমি যাইতে পারিব না, তাহাকে আসিতে বল।" তারপর সখির রাধার নিকট প্রত্যাগমন এবং কৃষ্ণের প্রার্থনানুযায়ী রাধাকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইবার চেষ্টা। কিন্তু রাধা ইচ্ছা থাকিলেও বিরহজনিত শারীরিক ক্লান্তিহেতু স্থান পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। সখি অগত্যা আবার কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণ এবার রাধার সকাশে স্বয়ং যাইতে রাজি। সখি ছুটিয়া আসিয়া রাধাকে সুসংবাদ জানাইলে রাধা বাসকসজ্জা হইয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কথা রাখিতে পারিলেন না। কাজেই রাধা ঠাহরাইলেন যে কৃষ্ণ অন্য কোন রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার সহিত জমিয়া গিয়াছেন। উক্ত রমণীর সহিত কৃষ্ণ কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেই সকল কথা রাধা কল্পনায় অনুভব করিয়া সেই ভাগ্যবতীর তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত হতভাগিনী মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাত্রি এইরূপেই কাটিয়া গেল। প্রত্যুষে কৃষ্ণ অন্য রমণীর ভোগচিহ্ন-সকল শরীরে ধারণ করিয়া রাধার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাধা কৃষ্ণকে কিরূপ ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নেই। কৃষ্ণ নিজের দোষক্ষালনের কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না, কারণ সে চেষ্টা নিষ্ফল। অধরের কজ্জল, কপোলের সিন্দূর, বক্ষস্থ যাবকরঞ্জিত পদচিহ্ন—এ সকল কোথা হইতে আসিল।

তাহার না হয় একটি বাজে কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে কিন্তু পরিধানের নীলশাটী সম্বন্ধে ত আর কোনরূপ মিথ্যা কৈফিয়ৎ খাটে না। রাধা কথা শেষ করিয়া দুর্জ্জয় মান করিয়া বসিলেন কিন্তু কৃষ্ণের কাছে কি মান টিকে? তিনি মনোমত কথায় রাধার প্রীতি সাধন করিলেন—রাধা কৃষ্ণের উপরে যে আড়ি করিয়াছিলেন তাহা ভাবে পরিণত হইল। এই ত গেল প্রভাত সময়ের ঘটনা, যোগেযাগে দিনটিও কাটিয়া গেল, দিনান্তে অভিসারিকা রাধা, কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উভয়ের মিলন হইল। মিলনান্তর সম্ভোগ, সম্ভোগান্তর কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার বেশবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থের সমাপ্তি।

দেখা যাইতেছে, এ কাব্যের মুখ্য বর্ণিত বিষয় রাধাকৃষ্ণের রূপ, তাঁহাদের পরস্পরের বিরহে পরস্পরের দুঃখপ্রকাশ, মিলিত হইলে পরস্পরের কথোপকথন, অর্থাৎ—কেবলমাত্র রাধা কৃষ্ণের দেহের বর্ণনা ও তাঁহাদের মনোগত প্রেমভাবের বর্ণনা। এ ছাড়া আনুসঙ্গিকরূপে যমুনাতীর, কুঞ্জবন, বসন্তকাল, রাধার সখি ও অন্যান্য গোপিনীগণের কথাও বলা হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় ও ঈশ্বরের বন্দনা বাদ দিলে দেখা যায়, রাধা ও কৃষ্ণের কেলি ব্যতীত স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের অন্য কোনও বিষয়, কোনরূপ ধর্ম্মনৈতিক কিম্বা নৈতিক মতামত ইত্যাদি কিছুই গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করে নাই। জয়দেবের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনও চিন্তা ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ কবির ক্ষমতার পরিসর যত সংক্ষিপ্ত হয় ও তাঁহার কল্পনা যত সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ থাকে

ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সমালোচকের পক্ষে সমালোচনা করাটা তত্তই সহজ সাধ্য হইয়া উঠে। আমি এখন জয়দেবে যাহা নাই তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহাতে যাহা আছে তাহার বিষয়ই আলোচনা করিব। জয়দেবের কবিত্ব শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার বর্ণিত প্রেম কিরূপ ও তাঁহার বর্ণিত স্ত্রী-পুরুষের রূপই বা কিরূপ, তাহাই যথার্থরূপে নিরূপণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

মনের ভাবের প্রকাশ—কথায় ও কার্য্যে। সাধারণ গোপিনীগণ, রাধা ও কৃষ্ণ, ইঁহারা প্রেম শব্দের অর্থে কি বুঝেন তাহা তাঁহাদের কথায় ও কার্য্যে বিশেষরূপে বুঝা যায়। গোপিনীগণ কৃষ্ণের কামোদ্দীপ্ত মুখের উপরে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া কানে কানে কথা কহিবার ছলে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া, পীনপয়োধরভারভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া—'কেলিকলাকুতুকেন' কুঞ্জবনে প্রবেশের নিমিত্ত তাঁহার পরিহিত দুকুল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি স্বীয় প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন।

রাধা কৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া সখিকে বলিলেন—

> "সখি হে কেশিমথনমুদারং
> রময় ময়া সহ মদনমনোরথ ভাবিতয়া সবিকারং॥"

তাহার পর কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে কৃষ্ণ কি করিবেন এবং তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে, রাধা সে বিষয়ে সখিকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন; সে বক্তৃতাটি ইচ্ছাসত্ত্বেও এ সভায় আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে পারিলাম না। নিজেরা পড়িয়া দেখিলেই তাহাতে

রাধা বিরহ ও মিলন কি ভাবে দেখেন তাহা অতি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।

সখি কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহ অবস্থা জানাইয়া বলিতেছেন—"রাধা ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্"—আরও নানা কথা বলিলেন, ফলে দাঁড়াইল রাধার অবস্থা অতি শোচনীয় তিনি অতিশয় উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত, রক্ষা পাওয়া ভার; রোগের কারণ কৃষ্ণের বিরহ। রোগ অতি কঠিন হইলেও কৃষ্ণের দ্বারা অতি সহজেই তাহার প্রশমন হইতে পারে। সখি কৃষ্ণকে বলিলেন, এ রোগ—"ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্র সাধ্যাম্", আর কৃষ্ণ?—তিনিও কথা এবং ব্যবহারে তাঁহার মনোভাব নিঃসন্দেহরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র চুম্বন, আলিঙ্গন, রমণ ইত্যাদির দ্বারা গোপিনী-গণের প্রতি তাঁহার অন্তরের ভালবাসা প্রকাশ করেন। সখি দ্বারা রাধাকে বলিয়া পাঠান যে, যাও শ্রীমতীকে গিয়া বল—"ভূয়স্তৎ কুচকুম্ভনির্ভর পরিরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি"। কৃষ্ণ রাধার দুর্জ্জয় মান ভঞ্জনার্থ যে সকল চাটুবচন প্রয়োগ করেন তাহাতেও ঐ একটি ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি সকলেই যে-ভাবে মত্ত সে-ভাবের নাম সংস্কৃতে ঠিক প্রেম নহে। জয়দেববর্ণিত প্রেমের উৎপত্তি দেহজ আকাঙ্খা হইতে, তাহার পরিণতি দেহের মিলনে, তাহার উদ্দেশ্য দেহের ভোগজনিত সুখলাভ, তাঁহার নিকট বিরহের অর্থ—প্রণয় প্রণয়িনীর দেহের বিচ্ছেদজনিত শারীরিক কষ্ট।

গীতগোবিন্দে আসল ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই, কেবল-মাত্র কামের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই, শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার। যে রমণীর মনে

প্রেম নাই, যাহার হৃদয় নাই, কেবলমাত্র দেহ আছে—তাহার স্ত্রীসুলভ লজ্জা, নম্রতা ইত্যাদি মানসিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ অভাব থাকিবার কথা; রাধিকাপ্রমুখ গোপযুবতীদিগের এই নির্লজ্জতার পরিচয় তাঁহাদের ব্যবহারে ও কথোপকথনে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করা যায়। রাধা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে "স্মর শর পরবশাকুত" প্রিয়মুখ দেখিয়া নিলর্জ্জভাবে উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন।

এই ত গেল প্রেমের কথা, এখন শারীরিক সৌন্দর্য্যের কথা পাড়া যাউক। শারীরিক সৌন্দর্য্য তিনটি বিভিন্ন উপকরণে গঠিত :—

(১) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির গঠন বা আকৃতি

(২) বর্ণ

(৩) ভাব অর্থাৎ—আন্তরিক সৌন্দর্য্যের বাহ্য বিকাশ। জয়দেবের নায়ক নায়িকা যখন সর্ব্বাংশে আন্তরিক সৌন্দর্য্য বঞ্চিত তখন অবশ্য তাহাদের শরীরে ভাবের সৌন্দর্য্যের দেখা পাওয়া অসম্ভব।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠন এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিমাণ-সামঞ্জস্য ও বর্ণ এ সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিয়া ইহাতে কোনও রূপ ভোগের ভাব সংলিপ্ত নহে। যে সৌন্দর্য্য চোখে দেখা যায়, তাহার কেবল মানসিক উপভোগই সম্ভব, তাহা হইতে যে সুখ লাভ করা যায় তাহা কেবলমাত্র মানসিক আনন্দ, তাহাতে দেহের কোনওরূপ লাভ লোকসান নাই। কিন্তু স্পর্শ করিয়া যে সুখ তাহা চৌদ্দ আনা দৈহিক, সুতরাং জয়দেবের নিকট আমরা আকৃতি ও বর্ণের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শারীরিক কোমলতা ও স্পর্শযোগ্যতা ইত্যাদির অধিক বর্ণনা প্রত্যাশা করিতে পারি এবং জয়দেব এ বিষয়ে আমাদিগকে

নিরাশ করেন না। মুখশ্রীর প্রধান উপকরণ ভাব, গঠন ও বর্ণের সৌন্দর্য্য, তাই জয়দেব মুখশ্রী বর্ণনা দুই কথায় করিয়াছেন—যে দুইটি কথা বলেন তাহাও খানিকটা যেন না বলিলে নয় বলিয়া। সুন্দরী যুবতীদিগের গাত্রের বন্ধুরতার, অর্থাৎ—উন্নত অবনত অংশ সকলের প্রতিই তাঁহার আন্তরিক টান দেখা যায়। তিনি উক্ত অঙ্গাদির বেশ ফলাও বর্ণনা করেন। তাঁহার রমণীদের এইরূপ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার বেশ পূর্ণ। কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট উপযাচী হইয়া দাঁড়াইলে তাঁহারা কৃষ্ণের হাত ভরিয়া সৌন্দর্য্য প্রদান করেন। আমার বিবেচনায় যে কারণে গীতগোবিন্দের যুবতীদিগের সৌন্দর্য্য থাকাটা আবশ্যক, সে আবশ্যকতা তাঁহারা কেবলমাত্র আবক্ষ সুন্দরী হইলেই উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারিত। কৃষ্ণকে জয়দেব যেরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার চেহারার বিষয় একটা বিশেষ কিছু পরিষ্কার ভাব মাথায় আসে না, কেবলমাত্র তাঁহার বক্ষস্থল যে নির্দ্দয়রূপ আলিঙ্গনের জন্য বিশেষ উপযুক্ত এবং তাঁহার করযুগল যে স্পর্শ সুখলাভের জন্য অষ্টপ্রহর লালায়িত—এই দুইটি কথাই বিশেষরূপে মনে থাকে। গীতগোবিন্দের মুখ্য বিষয়টি কি, তাহা আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা আপনাদিগকে এতক্ষণ ধরিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, এখন আমি তাহার কাব্যাংশের দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

(৩)

কোন একটি বিশেষ রচনা কাব্য কি না ও যদি কাব্য হয় তাহা হইলে কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ কিম্বা নিকৃষ্ট এসকল বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ

করিতে হইলে আগে কাব্য কাহাকে বলে সে বিষয়ে কতকটা পরিমাণে পরিষ্কাররূপ ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা প্রায় সকলেই সচরাচর কবিতা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি এবং আমাদের সকলেরই মনে কাব্য যে কি পদার্থ সে বিষয়ে একটা ধারণাও আছে, সেটি যে কি তাহা ঠিক প্রকাশ করিয়া বলা অত্যন্ত কঠিন। কোনও একটি ক্ষুদ্র সংজ্ঞার ভিতর পৃথিবীর যাবতীয় কবিতাপুস্তক প্রবেশ করান,যায় না। দুই চারি কথায় কোনও কাব্যের সমস্ত গুণের বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে তাহা যে কি, সেবিষয়ে একটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। আমার বিবেচনায় আমাদের দেশে প্রচলিত*—"কাব্য রসাত্মক বাক্য"—কাব্যের এই সংজ্ঞায় সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ, অর্থাৎ—যাহার অভাবে কোনও রচনা কাব্য হইতে পারে না, সেইটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই অল্প সংখ্যক কথা কয়েকটির মধ্যে কি ভাব নিহিত আছে তাহা খুলিয়া বুঝাইয়া দিলে বোধ হয় আপনারাও আমার কথা কতক পরিমাণে গ্রাহ্য করিবেন।

'রসাত্মক বাক্য' এই কথা কয়েকটির যথার্থ অর্থ বুঝিতে হইলে রস, আত্মা ও বাক্য, এই শব্দগুলির অর্থ জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ 'বাক্য' এই শব্দ লইয়াই আরম্ভ করা যাউক, আমরা দেখিতে পাই বাক্যের দুইটি অংশ আছে। প্রথম, অর্থ—দ্বিতীয়, শব্দ। প্রথমাংশ

---

* যেকালে এ প্রবন্ধ লেখা হয়, সেকালে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কোনো গ্রন্থ আমি চোখে দেখি নি, এমন কি তাদের নাম পর্য্যন্ত শুনি নি, সেই কারণে উক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যটি আমি আমাদের দেশে প্রচলিত বাক্য বলে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিলুম।

মানসেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। দ্বিতীয়াংশ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। যে শব্দ কানে শুনিয়া অন্তরে তাহার অর্থ গ্রহণ করি তাহাই বাক্য।

বাক্যের বিষয় মানুষের মনোভাব।

বাক্যের উদ্দেশ্য তাহা প্রকাশ করা এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় শব্দ। সুতরাং বাক্য রসাত্মক হইতে হইলে প্রথমতঃ ভাব রসাত্মক হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ শব্দ রসাত্মক হওয়া আবশ্যক; তৃতীয়তঃ এরূপ ভাবে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যাহাতে রসাত্মক ভাব রসাত্মক শব্দের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইতে পারে।

শব্দের রস কি? অবশ্য শ্রুতি মধুরতা—যেমন সঙ্গীতে একটি সুর আর একটি সুরের সহিত মিশ্রিত হইয়া অধিকতর শ্রুতিমধুর হয় সেইরূপ একটি শব্দ আর একটি শব্দের সংস্পর্শে অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়। কানে শুনিতে ভাল লাগিবার জন্য শব্দবিন্যাসের পারিপাট্য হইতে ছন্দের উৎপত্তি। ভাষা ছন্দবদ্ধ হইলে যত শুনিতে ভাল লাগে, ছন্দ ব্যতিরেকে ততদূর মিষ্টি লাগে না। সুতরাং কবির ভাষা ছন্দযুক্ত—পদ্যে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান—প্রথম Rhyme—দ্বিতীয় Rythm—এই দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই ছন্দের প্রাণস্বরূপ। Rhyme না থাকিলেও ছন্দ হয় কিন্তু Rythm না থাকিলে চলে না। Rhyme and Rythm উভয়েই সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলেই ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণে পুর্ণাবয়ব হয়। সুতরাং যে কবির রচনায় Rhyme এবং Rythm যত বহুল পরিমাণে থাকিবে ততই তাঁহার শব্দের রস বেশি হইবে—

যে 'ভাব' মনে সুন্দর ভাবের উদ্রেক করে, আমাদের হৃদয়

বিশুদ্ধ আনন্দে পরিপ্লুত করে তাহাই রসাত্মক ভাব। যেমন ফুল, সুগঠিত প্রস্তর মূর্ত্তি, পূর্ণিমা রজনী ইত্যাদি আমাদের দেখিতে ভাল লাগে কিন্তু কেন লাগে তাহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না, সেইরূপ মানবমনের প্রেম, ভক্তি, স্নেহ—সৌন্দর্য্যের আকাঙ্খা, আকাঙ্খাজনিত বিষাদ, জগতের আদি, অন্ত উদ্দেশ্য ইত্যাদি রহস্যপূর্ণ বিষয়ের চিন্তাজনিত মনের আবেগ, বিস্ময়াদি ভাব সকল সহজেই আমাদের ভাল লাগে কিন্তু কেন যে ভাল লাগে তাহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। উক্ত প্রকার রসাত্মক ভাব সকলই কাব্যের মুখ্য বিষয়। এই সকল ভাবের ভিতর যে মাধুর্য্য আছে তাহাই প্রকাশ করা এবং আমাদের মনে এই সকল ভাব উদ্রেক করিয়া আনন্দ প্রদান করাই কবিতার উদ্দেশ্য এবং যে কবি সেই উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হয়েন তিনিই যথার্থ শ্রেষ্ঠ কবি। যদিও সুন্দর ভাব লইয়াই কবির কারবার তথাপি পৃথিবীর কোনও সুন্দর জিনিষ একেবারে তাঁহার আয়ত্তের বহির্ভূত নয়। কি বাহ্যিক, কি মানসিক যতপ্রকার সৌন্দর্য্য আছে সকলেরই ভিতর একটা বিশেষ মিল আছে। চিত্রকরের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা লোকের মানসিক তৃপ্তিসাধন কিন্তু তিনি তাঁহার চিত্রে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া ভাবের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন; কবির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। ভাবের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইলেও তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের বর্ণনাতেও ক্ষান্ত নহেন বরং যে কবি নিজের রচনায়—রূপজ, ভাবজ, নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ সৌন্দর্য্যের একত্র মিলন করিতে পারেন, তিনিই স্তত উচ্চদরের কবি বলিয়া গণ্য হয়েন। কিন্তু যেমন একটি চিত্র-

করের পক্ষে—চিত্রে ভাবের সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতে হইলে—প্রথমতঃ চিত্রটিকে সুন্দর করিয়া আঁকিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ যাহাতে তাহার ভাব পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয় সেইরূপ করিয়া আঁকিতে হইবে ; কবির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ কোনও একটি বিষয় কাব্যভুক্ত করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত লিপ্ত করিতে হইবে—দ্বিতীয়তঃ তাহাকে সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইবে।

আমি 'ভাষা' ও 'ভাব' পৃথক করিয়া আলোচনা করিয়াছি কিন্তু বাস্তবিক কবির নিকট 'ভাষা' ও 'ভাবের' ভিতর কোনও প্রভেদ নাই। কবিতার 'ভাষা' ও 'ভাব' পরস্পরের উপর পরস্পর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। 'ভাব' মন্দ হইলে কবিতার 'ভাষা' কখনই সুন্দর হইতে পারে না এবং ভাষা কদর্য্য হইলে ভাবও সম্পূর্ণরূপ কবিত্বপূর্ণ হইতে পারে না। কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ—কিছুতেই তাহা ভাব হইতে পৃথক করিতে পারা যায় না। একটি ভাব দুই প্রকার ভাষায় ব্যক্ত হইলে অর্থ সম্বন্ধে অনেকটা বিভিন্ন হইয়া যায়। নিবিড় অন্ধকারকে কালিদাস বলিতেছেন "সূচিভেদ্য-স্তমস্"—জয়দেব বলিতেছেন "অনল্পতিমির"—এ দুয়ের মধ্যে কতটা প্রভেদ আপনারাই বুঝিতে পারিতেছেন।

যে অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা কবিতায় ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ একীকরণ সম্পন্ন হয় তাহাই কবিতার আত্মা—এই আত্মা আমাদের আত্মার ন্যায় রহস্যজড়িত। যেমন বৈজ্ঞানিকগণ মানবদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াও তাহার ভিতরকার আত্মাকে খুঁজিয়া পান না সেইরূপ সমালোচকেরাও একখানি কাব্যের বিভিন্ন বিভিন্ন উপাদান সকল পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট করিলেও তাহাদের অন্তরস্থ আত্মাকে

ধরিতে পারেন না। যাঁহারা ভাবের সহিত ভাষা যুক্ত করিয়া কবিতাকে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন তাঁহাদেরই কবিতার আত্মা আছে। কিন্তু যথার্থ কবিত্বশক্তি বিবর্জিত কোনও ব্যক্তি যদি বহুল পরিশ্রম দ্বারা বিশেষরূপে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ভাব সকলকে পরিপাটি ছন্দ ও ভাষাযুক্ত করেন তাহা হইলেও তাঁহার রচনা কাব্য শ্রেণীভুক্ত নয়। সৃষ্টি ও নির্ম্মাণে যে প্রভেদ, কবিতা ও তাহার অনুকরণে রচিত প্রাণশূন্য ছন্দোবন্ধের সমষ্টিতে সেই প্রভেদ।

পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে—যে রচনায় রসাত্মক ভাব সম্পূর্ণরূপ অনুরূপ ভাষায় প্রকাশিত তাহাকেই আমি কাব্য বলিয়া মানি—এখন দেখা যাউক কাব্য বিষয়ে আমার মত অনুসারে বিচার করিলে জয়দেবের কাব্যজগতে স্থান কোথায়?

(৪)

জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন। প্রেমের পরিবর্ত্তে শৃঙ্গার রসকে কবিতার বর্ণিত বিষয় স্বরূপ স্থির করিয়াছেন সেজন্য আমরা কখনও তাঁহাকে কালিদাসাদি কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। আমি আপাততঃ জয়দেব বিষয়টি কাব্যাকারে গঠিত করিয়া কিরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহাই বলিতেছি—

জয়দেবের কবিতা সকল—প্রকৃতির শোভা, রাধাকৃষ্ণের রূপ এবং তাঁহাদের বিরহ মিলন ইত্যাদি অবস্থার বর্ণনায় পূর্ণ; সুতরাং

তাঁহার বর্ণনা বিষয়ে কৃতকার্য্যতা অনুসারে তাঁহার কবিত্বশক্তির স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইবে। কবিরা দুইরূপ প্রণালীতে বর্ণনা করিয়া থাকেন—প্রথম—স্পষ্ট এবং সহজভাবে, দ্বিতীয়—বর্ণিত বিষয় ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। উভয় উপায়ই প্রকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ-কবিরা উভয় প্রণালী অনুসারেই বর্ণনা করিয়া থাকেন। জয়দেব কেবলমাত্র প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ণনার পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য উপমাদি অলঙ্কার সকলের প্রয়োগ দ্বারা বিশেষরূপে সাধিত হয়। এ জগতের সকল পদার্থের মধ্যেই একটা মিল আছে। আমাদের সময়ে সময়ে কোন একটি পদার্থ কিম্বা ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যেন আর অন্য একটি কি জিনিষে এইরূপ ভাব দেখিয়াছিলাম। পৃথক পৃথক পদার্থের ভিতরকার এই সাদৃশ্যের তুলনা হইতে উপমাদির উৎপত্তি—

উপমাদির দ্বারা দুইটি কার্য্য সিদ্ধ হয়—(১) ইহার দ্বারা একটি অস্পষ্ট ভাবকে স্পষ্ট করা যায়—(২) ইহা দ্বারা ভাবের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা যায়। ইহা ব্যতীত কোন দুইটি ভাব বা পদার্থের ভিতর আমার অলক্ষিত কোনরূপ মিল কেহ দেখাইয়া দিলে মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। কবিতায় যে সকল উপমা ব্যবহৃত হয় তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য—কোনও একটি ভাবের, উপমার সাহায্যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং কেবলমাত্র উপমার যাথার্থ্য দ্বারা মনের তুষ্টিসাধন, সুতরাং জয়দেবের বর্ণনার যাথার্থ্য এবং সৌন্দর্য্য অনেকটা তাঁহার উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের শক্তি সাপেক্ষ।

জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনা নেহাৎ একঘেয়ে। তাঁহার বিরহী বিরহিনীদিগের নিকট যে বস্তু মনের সহজ অবস্থায় ভাল লাগিবার কথা

তাহাই শুধু খারাপ লাগে। জয়দেব বিরহের ভাবের অন্য কোনও অংশ ধরিতে পারেন নাই। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে যক্ষস্ত্রীর যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহাব সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জয়দেবের বর্ণনায় বৈচিত্রতার অভাব এবং বিরহাবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য্য আছে তাহার সম্পূর্ণ উল্লেখের অভাব—এই দুইটি ত্রুটি আমাদের নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

জয়দেবের অভিসার বর্ণনায় কেবলমাত্র বেশভূষার বর্ণনাই দেখিতে পাই, তাহাতে অভিসারিকার মনের আবেগ—প্রেমের নিমিত্ত অবলা রমণীগণ কিরূপে নানারূপ বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে—এসকল বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। এ বর্ণনাও নেহাৎ এক-ঘেয়ে। তাঁহার বসন্ত বর্ণনার প্রধান দোষ তাহাতে একটিও সম্পূর্ণ নূতন কথা দেখিতে পাই না। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা যে সকল বসন্ত বর্ণনা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার বসন্ত বর্ণনার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। নূতনত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাতে আরও অনেক দোষ বাহির হইয়া পড়ে। তাঁহার সমস্ত বর্ণনাটিতে সমগ্র বসন্তের ভাব ফুটিয়া উঠে না। তিনি একথা ওকথা বলেন কিন্তু তাহার ভিতর হইতে একটা কোনও বিশেষ ভাব খুব স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। কালিদাস অনেকস্থলে বসন্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অনেক স্থলেই তিনি একটিমাত্র শ্লোকে হয় বসন্তের সমগ্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন, নয় একটি মাত্র চিত্রে সমস্ত বসন্ত আবদ্ধ করিয়াছেন—

ক্রমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং,
স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।

সুখাঃ প্রদোষাঃ দিবসাশ্চ রম্যাঃ
সর্ব্বং প্রিয়ে ! চারুতরং বসন্তে ॥

জয়দেব বসন্ত বর্ণনায় অনেকগুলি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে খুব একটা ভাবের মিল নাই। তিনি একটি শ্লোকের প্রথম চরণে বলিতেছেন যে "বসন্তে বিরহীগণ বিলাপ করিতেছেন"—সেই শ্লেকের আর একটি চরণে 'অলিকুল কর্ত্তৃক বকুলকলাপ অধিকারের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ দুয়ের ভিতর যে কি স্বাভাবিক মিল তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাঁহার উদ্দেশ্য বসন্তে যে মদন রাজার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই বর্ণনা করা। কিন্তু কেবলমাত্র কোন ফুলকে মদন রাজার নখ এবং অন্য অপর আর একটিকে বিরহীদিগের হৃদয় বিদারণের অস্ত্রস্বরূপ বলিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যথার্থ মদনবিকারের ভাব কিসে ফুটিয়া উঠে তাহা আমি কালিদাসের একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমিলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥"

উক্ত শ্লোকে কালিদাস মদনের নখ দূরে যাউক তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই তথাপি প্রেমরস-মত্ততার কি চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। সমগ্র ভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও জয়দেব এমন একটি মাত্রও শ্লোক রচনা করিতে পারেন নাই যাহাতে

কোনও একটি পদার্থের সজীব চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতি বর্ণনাতেও যেরূপ স্ত্রীপুরুষের রূপ বর্ণনাতেও তিনি ঠিক সেইরূপ অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। কালিদাস—

"আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং,
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥"

এই একটি মাত্র শ্লোকে সমগ্র উমাকে কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, জয়দেব এইরূপ দুই চার কথায় একটি স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সমগ্র চিত্র বর্ণনা করিতে একান্ত অপারগ। তাঁহার বিশ্বাস পদ্মের ন্যায় মুখ, তিলফুলের ন্যায় নাসিকা, ইন্দিবরের ন্যায় নয়ন এবং বান্ধুলির ন্যায় অধর এই সকলের একটি সমষ্টি করিলেই সুন্দরীর মুখ নির্ম্মাণ করা যায়। উক্ত বিশ্বাসে ভর করিয়া সুন্দর-কবি বিদ্যাকে একটি পদ্মের সহিত তিলফুল নীলোৎপল, বান্ধুলিপুষ্প এবং কুন্দকলিকা ইত্যাদি অতি কৌশল সহকারে সংযোজনা করিয়া যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন তাহা অবশ্য জয়দেবের নিকট তিলোত্তমার মুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। উক্ত প্রকার বিশ্বাসের উপর আমার কোনই আক্রোশ নাই, যিনি ইচ্ছা করেন অনায়াসে তিনি ঐ সকল ফুল যোড়া তাড়া দিয়া যখন তখন মনের সুখে সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন কেবল এইটি মাত্র মনে রাখিলেই আমি সন্তুষ্ট

থাকিব যে পদ্ধতি অনুসারে চলিলে মাথামুণ্ড কিছুই বর্ণনা করা যায় না।

তারপর জয়দেবের উপমার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে জয়দেবের উপমাসকল প্রায়ই নেহাৎ পড়ে-পাওয়া গোছের। জয়দেবের পূর্ব্বে সেই সকল উপমা শত সহস্রবার সংস্কৃত কবিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। জয়দেব কাব্য-জগতের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে তাহা কুড়াইয়া লইয়াছেন মাত্র। কাব্য জগতে, না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করার প্রথাটা বিশেষরূপ প্রচলিত আছে এবং কোনও কবি যদ্যপি উক্ত উপায়ে উপার্জ্জিত দ্রব্যের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে লোকে কিছু একটা বিশেষ দোষও দেয় না। নেহাৎ পরের দ্রব্য বলিয়া চেনা গেলেই আমরা রাগ করি এবং কবির উদ্দেশে কটুকাটব্যও ব্যবহার করি কিন্তু যদি তাহার একটু মাত্রও রূপের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই তাহা হইলেই ঠাণ্ডা থাকি। জয়দেব অনেকস্থলেই পরের উপমাদি লইয়া তাহার একটু আধটু বদলাইয়া নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার এ বিষয়ে হাত বড় মন্দ সাফাই নহে; আবার অনেকস্থলে যেমনটি পাইয়াছেন অবিকল তেমনটী রাখিয়াছেন। এইরূপ উপমাদি পড়িয়া রাগ করি আর না করি খুব যে খুসী হই তাহা নহে। যে কথা হাজার বার শুনিয়াছি তাহা আর কার শুনিতে ভাল লাগে। আমার ত পদ্মের মত মুখ ইত্যাদি কথা শুনিলেই মনটা একটু অন্যমনস্ক হয় এবং ঐরূপ উপমা বেশীক্ষণ পড়িতে হইলেই হাই উঠিতে আরম্ভ হয় কারণ ওসব পুরাণ কথায় মনে কোনও নির্দ্দিষ্ট ভাব বা চিত্র আসে না। শুনিবামাত্রই মনে

হয় ও সবতো অনেকদিনই শুনিয়াছি আবার অনর্থক ও কথা কেন? ভরসা করি আপনারা সকলেই আমার সহিত এবিষয়ে একমত।

কিন্তু জয়দেব যে কেবলমাত্র প্রচলিত উপমাদি ব্যবহার করিয়াছেন এমন নহে—তাঁহার পরিকল্পিত দুচারিটি নূতন উপমাও গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যেগুলি আমার নিকট বিশেষ-রূপে জয়দেবীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, আপনাদের জ্ঞাতার্থে তাহারই দুই একটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। জয়দেব ঈশ্বরের নরহরিরূপ সম্বন্ধে বর্ণনায় বলিতেছেন—

"তব করকমলবরে নখসম্ভুতশৃঙ্গম্
দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভৃঙ্গম্।"

ইহার দোষ—প্রথমতঃ, কমলের নখঘাত ও তদ্‌কর্ত্তৃক ভ্রমরের বিনাশ নেহাৎ অস্বাভাবিক, দ্বিতীয়তঃ নরসিংহের করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করায় এবং হিরণ্যকশিপুকে ভৃঙ্গের সহিত তুলনা করায় উভয়ের ভিতর, বৈরতার, বিরোধীভাবের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়তঃ দুর্দ্দান্ত দৈত্যের সহিত কৃষ্ণ, নরহরিরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বধার্থ স্বীয় বীরত্বের পরিচায়ক যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে কমল ও ভ্রমরের যুদ্ধ স্বরূপ বলায় ভাবের যাথার্থ্য এবং সৌন্দর্য্য কতটা পরিমাণে বজায় থাকিল আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

বলরামকে উল্লেখ করিয়া জয়দেব বলিতেছেন—

"বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভম্"

হলতাড়নার ভয়ে যমুনা ডেঙ্গায় উঠিয়া বলরামের দেহে বসন-রূপে সংলগ্ন হইয়াছেন এরূপ অযথা কথা বলায় যদি কিছু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে ও না হয় উপমাটি সহ্য করা যাইত, আমার বিবেচনায় জয়দেব বলরামকে জলে নামাইলে, যমুনাকে আর জল ছাড়া করিবার আবশ্যক হইত না। কৃষ্ণের মুখ কিরূপ, না—

"তরল দৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিত রতিরাগম্
স্ফুট কমলোদর খেলিতখঞ্জন যুগলিব শরদি তড়াগম্।"

কৃষ্ণের নয়ন-শোভিত বদন দেখিয়া মনে হইল যেন পদ্মের ভিতর খঞ্জন যুগল খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কমলের ভিতর খঞ্জন যুগলের বিহার আমিও দেখি নাই জয়দেবও দেখেন নাই এবং আমার বিশ্বাস ওরূপ কার্য্য খঞ্জনেরা কখনও করে না। এ উপমাটি আমার নিকট যেমন অপ্রাকৃত তেমনি অর্থশূন্য বলিয়া মনে হইতেছে।

আমার এই উপমা তিনটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য কেবল জয়দেবকে নিন্দা করা নহে, আমি এই সকল উদাহরণ হইতে জয়দেব কিজন্য এবং কি উপায়ে উপমা প্রয়োগ করিতেন তাহাই দেখাইব। এরূপ উপমা পড়িয়া আপনাদের কি মনে হয় না যে জয়দেব কেবল উপমা প্রয়োগ করাটা কবিতায় আবশ্যক বিবেচনায় উক্ত কার্য্য করিতেছেন, বাস্তবিক উপমায় কবিতার সৌন্দর্য্য বাড়িল কি না এবং কোনও বিশেষ ভাব পরিস্কার রূপে তাহার সাহায্যে ব্যক্ত করা গেল কি না এসব কথা জয়দেবের মনেও আসে নাই। উপমা আপনা হইতেই তাহার

কাছে আসে না, তিনি জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনেন অর্থাৎ তাঁহার উপমায় স্বাভাবিকতা কিছুমাত্রও নাই। তাহা কেবলমাত্র কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ। প্রমাণ, কবিরা প্রায়ই সুন্দর করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করেন তাই জয়দেব নরসিংহের করযুগলকে কমল স্বরূপ বলিয়া বসিলেন এবং তাহাকে কমল বলায় হিরণ্য-কশিপুকে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভৃঙ্গ বলিতে হইল। ভাবের সৌন্দর্য্য বজায় থাকিল কি না সে কথা ভাবিয়া আর কি করিবেন? একটি ভুলের জন্য বাধ্য হইয়া আর একটি অন্যায় কাজ করিতে হইল। আবার দেখুন, কবিরা মুখকে পদ্মের সহিত এবং নয়নযুগলকে খঞ্জনের সহিত তুলনা করেন, ইহা জয়দেবের নিকট অবিদিত ছিল না কিন্তু নয়নশোভিত বদনকে কবিরা কি বলেন তাহা তাঁহার জানা ছিল না। কাজেই কি করেন তিনি উপমাস্বরূপ পদ্মের সহিত মনে মনে খঞ্জনের যোগ করিয়া ফেলিলেন, অগত্যা খঞ্জনকেই কমলোদরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইল। ল্যাঠা চুকাইয়া গেল, জয়দেব হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কবিতা হইল কি না সে কথা আপনারা ভাবুন।

আমি ক্রমে ক্রমে প্রমাণ করিয়াছি যে জয়দেব যখন কোনও বিষয়ের সাধারণ ভাব অথবা তাহার সর্ব্বায়বের প্রত্যক্ষরূপ সহজভাবে কিম্বা অলঙ্কারাদির সাহায্যে উত্তমরূপ বর্ণনা করিতে অসমর্থ তখন তাঁহাকে এ বিষয়েও বড় কবি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

(৫)

এখন আমি জয়দেবের ভাষা সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। জয়দেবের ভাষা যে

অতিশয় সুললিত এবং শ্রুতিমধুর ইহা তো সর্ব্ববাদিসম্মত। এমন কি যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁহারাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। বরং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকেই উক্ত বিষয়ে জয়দেবের প্রচুর প্ররিমাণে প্রশংসা করিতে দেখা যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কবিতার ভাষার সৌন্দর্য্য হইতে ভাবের সৌন্দর্য্য পৃথক করা যায় না। ভাবের অনুরূপ ভাষা প্রয়োগেই যথার্থ কবিত্ব শক্তির পরিচয়। যাহাদের মস্তিষ্কে ভাব ও ভাষা একত্রে গঠিত হয় না তাহারা লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য হয় ভাব বিষয়ে পাণ্ডিত্য নয় ভাষা বিষয়ে ছন্দ নির্ম্মাণের কৌশল, এই দুইয়ের একটির সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। জয়দেব আমার বিবেচনায় যথার্থ উচ্চ অঙ্গের কবিতা রচনার অক্ষমতা বশতঃ লোকসাধারণের চটক লাইবার অভিপ্রায়ে শেষোক্ত-উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় কথার কারিগারি দেখা যায়। মনে কোনও একটি বিশেষ ভাবের উদয় হইলে যে কথাটি স্বভাবতঃই মুখাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয় জয়দেব সেটিকে চাপিয়া রাখেন—তাহার পরিবর্ত্তে শব্দশাস্ত্র খুঁজিয়া ভাবপ্রকাশ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে অনুপযোগী আর একটি কথা আনিয়া হাজির করেন। কালিদাসাদি যথার্থ শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনা-প্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁহারা স্বভাবতঃ যে কথাটি মুখে আসে সেইটি ব্যবহার করেন তবে তাঁহাদের ভাবের সহিত আমাদের ভাবের অনেক পার্থক্য সুতরাং যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা একান্তই দুঃসাধ্য। আপনার, আমার, ও জয়দেবের সহিত তাঁহাদের এইটুকু মাত্র তফাৎ। জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ—সুস্পষ্ট rythm-এর

অভাব। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দ সকল একটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্য আর একটির ন্যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় অকারান্ত শব্দের ব্যবহারে শব্দ সকলের হ্রস্ব দীর্ঘাদি প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায়—সুতরাং তাহাদের উচ্চারণের বৈচিত্র অভাবে—জয়দেবের ভাষায় গাম্ভীর্য্যের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু বাক্যের যে অংশ কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাও গাম্ভীর্য্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে মধুর হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভাষা সম্বন্ধেও গাম্ভীর্য্যযুক্ত মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য বিরহিত মাধুর্য্য, অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীসম্পন্ন। "গীতগোবিন্দের" সহিত "মেঘ-দূতের" তুলনা করিলেই দেখা যায় গাম্ভীর্য্যগুণ বিশিষ্ট হইয়াও শেষোক্ত কাব্যের ভাষা পূর্ব্বোক্ত কাব্যের ভাষা হইতে কত উৎকৃষ্ট।

সমভাবে উচ্চারিত অকারান্ত শব্দের একত্রে বহুল বিন্যাসের আর একটি দোষ আছে—তাহাতে পাঠকমাত্রেরই পক্ষে রচনার অর্থ গ্রহণ করা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া উঠে। বিভিন্ন বিভিন্ন শব্দ সকল পরস্পর হইতে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র না হইলে পাঠকালীন তাহাদের প্রত্যেকের উপর নজর পড়ে না। একটি শ্লোকের অন্তর্ভূত শব্দ সকলের আকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য যত সুস্পষ্ট তাহার অর্থও সেই পরিমাণে চট্ করিয়া বুঝা যায়। শব্দ সকলের বৈচিত্র বজায় রাখিয়া তাহাদের ভিতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া যিনি রচনাকে শ্রুতিমধুর করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ভাষার রাজা। জয়দেব তাঁহার রচনায় শব্দ সকলের হ্রস্ব দীর্ঘাদি প্রভেদ জনিত বন্ধুরতা ভাঙ্গিয়া মাজিয়া ঘসিয়া এমন মসৃণ করিয়াছেন যে তাহা পড়িতে গেলে তাহার উপর দিয়া রসনা

ও মন দু-ই পিছলাইয়া যায়। প্রত্যেক শব্দটির উপর মন বসাইতে না পারিলে সমস্ত রচনার অর্থের উপরেও অমনোযোগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

গীতগোবিন্দে কথার বড় একটা কিছু অর্থ নাই বলিয়া জয়দেব যে চাতুরি করিয়া যাহাতে পাঠকের মন ভাবের দিকে আকৃষ্ট না হইতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে উক্ত প্রকার শ্লোক রচনা করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি শুধু জয়দেবের কবিতার দোষ দেখাইয়া আসিয়াছি। তিনি যে উৎকৃষ্ট কবিদিগের সহিত সমশ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিতে পারেন না তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য। যাঁহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিক ভাব, মানব দেহের সৌন্দর্য্য যাঁহার দৃষ্টিতে ততটা পড়ে না, যিনি মানব দেহকে কেবল ভোগের বিষয় বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান, যাঁহার ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরি অধিক—এক কথায় যাঁহার কাব্যে স্বাভাবিকতার অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাঁহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি। ভরসা করি এ বিষয়ে আপনারাও আমার সহিত এক মত। কিন্তু এ সকল কথা সত্য হইলেও জয়দেবকে যে অনেকে বড় কবি বলিয়া মনে করেন সে কথাও ত অস্বীকার করি যো নাই। জয়দেব সম্বন্ধে এই সাধারণ মত কি কি কারণ প্রসূত তাহা আমি কতকটা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি—নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি—

(৬)

প্রথমতঃ শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় জয়দেব যখন তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা প্রস্ফুটিত করিয়া তুলেন তখন তাঁহার কবিতা বিশেষরূপে স্বাভাবিক হইয়া উঠে—তখন তিনি কোনওরূপ অপ্রাকৃত কিম্বা অযথার্থ কথা বলেন না। যে বিষয়ে যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তাহার বর্ণনায় সে অবশ্য বিলক্ষণ নিপুণ। সুরতসুখালসজনিত দেহের অবস্থা তিনি কত জাজ্বল্যমান করিয়া আঁকিতে পারেন। মনের ভাবের কথা নাই বলিলেন, রোমাঞ্চ, শিৎকার ইত্যাদি একান্ত শারীরিক ভাবসকলের বর্ণনায় ত তিনি কাহারও অপেক্ষাও কম নন। আর তাঁহার ভাষায় গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি গুণ নাই বটে কিন্তু তাহা শৃঙ্গার রসের বর্ণনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যুবতীদিগের দেহের ন্যায় তাঁহার শব্দগুলিও কুসুমসুকুমার। যখন রূপসীদিগের কবরী শিথিল হইয়া যাইতেছে নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িতেছে—যখন সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিতেছে তখন আর ভাষার বাঁধুনি কি করিয়া প্রত্যাশা করা যায়? রাধার দেহের ন্যায় গীতগোবিন্দের ভাষা 'নিঃসহনিপতিতা লতা' স্বরূপ। তাই শৃঙ্গাররসবর্ণন কালে তাঁহার ভাষা ভাবের অনুরূপ। তিনি শৃঙ্গার রসের কবি। কিন্তু যে রসেরই হউন না কবি ত বটে? এবং কবির যথার্থ রচনা যে জাতিরিই হউক লোকের ভাল লাগিবেই লাগিবে সুতরাং জয়দেবের কাব্য সাধারণের একেবারেই অনাদরের সামগ্রী নহে।

দ্বিতীয়তঃ—সাধারণের সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতা আর একটি কারণ।

সংস্কৃত না জানার দরুণ ভাষার লালিত্য হইতে লোকে ধরিয়া নেয় ভাবেরও অবশ্য সৌন্দর্য্য আছেই আছে—

তৃতীয়তঃ—রাধাকৃষ্ণের প্রেম জয়দেবের কাব্যের বিষয় বলিয়া সাধারণের নিকট জয়দেবের কাব্য এত উপাদেয়। এ সংসারে ফুল, জ্যোৎস্না, মলয়পবন, কোকিলের কুহুস্বর আমাদের সকলেরই ভাল লাগে—চিরদিন লোকের ভাল লাগিয়াছে এবং চিরদিন ভাল লাগিবে। কিন্তু কতকগুলি জিনিষ আছে যাহার যথার্থ একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য না থাকিলেও, অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ আমাদের ভাল লাগে—যমুনার জল, তমালের বন, বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি—এ সকলের মধুরতা পূর্ণিমারজনী, দক্ষিণ পবনের ন্যায় আমাদের নিকট পুরাতন হয় না—যিনিই এ সকলের কথা বলেন, তাঁহার কথাই আমাদের শুনিতে ইচ্ছা যায়। আমরা অনেকেই বৃন্দাবন, যমুনার জল এ সকল কিছুই দেখি নাই—বাঁশির স্বরও কখনও শুনি নাই—তবে তাহাদের কথা এত প্রাণ স্পর্শ করে কেন? কারণ ঐ এক একটি কথা হৃদয়ে কত সুন্দর কত মধুর স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। আমরা যমুনার জল দেখি নাই বটে কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এত সুন্দর কবিতা পড়িয়াছি যে যমুনার সমস্ত সৌন্দর্য্য আমাদের হৃদয়ে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় সম্পর্কীয় সকল বস্তুকেই প্রকৃতির চিরস্থায়ী সুন্দর অংশ সকলের মধ্যে ভুক্ত করিয়া ফেলি। সুতরাং জয়দেব যখন সেই যমুনা, সেই বাঁশি, সেই রাধা সেই কৃষ্ণ ও সেই বৃন্দাবনের কথা বলেন তখন তাঁহার পরিবর্ত্তে তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিরা আমাদের মনে ঐ সকলের যে সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহারই দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। আমরা

আসল, কারণ না বিচার করিয়া মনে করি—জয়দেবের কবিতা পড়িয়াই আমরা মোহিত হইতেছি। তাঁহার পরবর্ত্তী কবি সকলের গুণ আমরা ভুলক্রমে জয়দেবে আরোপ করি। চণ্ডীদাসাদি বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাব্যের বিষয় না করিলে জয়দেব আমাদের যতটা ভাল লাগে তাহা অপেক্ষা অনেক কম ভাল লাগিত—অন্ততঃ আমার কাছে।

অনুরোধ।

——০:০——

বালা, হিয়ার আলো
জ্বালো জ্বালো!
বসন্ত ঐ আসে।

সারা জীবন একটি বার
একটি নিশার অভিসার,
একটি দীর্ঘশ্বাসে,

এক নিমেষের মাদকতা,
একটি সাঁঝের আকুলতা,
নিবিড় করি' ধর আজি
পরম বিশ্বাসে,

বালা, হিয়ার আলো
জ্বালো জ্বালো!
বসন্ত ঐ আসে।

বালা, প্রাণের বাণী
কহ রাণী!
বসন্ত যে যায়।

একটি নিমেষ, দুইটি ক্ষণ,
রইবে না ত আজীবন—
ফিরবে না ত হায়!

সজল দুটি আঁখির পাতে,
কাজল-মাখা ঘন রাতে,
উজল করি ধর আজি
প্রেমের বর্ত্তিকায়,

বালা, প্রাণের বাণী,
কহ রাণী!
বসন্ত যে যায়।

বালা, বালা, বালা,
গাঁথ মালা!
বসন্ত ঐ গেল।

নাইরে নিমেষ, নাইযে সময়,
আর কি সাজে জয় পরাজয়?
ফেল, সরম ফেল!

একটি দৃঢ় আলিঙ্গনে,
গাঢ় সোহাগ সচুম্বনে,
একটি চরম দৃষ্টি হানি'
হৃদ্‌-কমলটি মেল!

বালা, বালা, বালা,
গাঁথ মালা—
বসন্ত ঐ গেল!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রজাস্বত্বের কথা। (২)

—:*:—

বীরবলজী,

গত বারে আমি যে আপনাকে একখানি পত্র লিখেছিলাম সে-খানি আপনি অনুগ্রহ করে সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর ততোধিক অনুগ্রহ করে আমার ও আমার লেখার প্রশংসা করেছেন। আপনার প্রশংসাপত্র ধন্যবাদের সহিত আমার শিরোধার্য্য।

আপনি জমির স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধে মূল সূত্রের নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন "আপনারা যত পারেন এর টীকা ভাষ্য করুন। টীকা, ভাষ্য, বার্ত্তিক নানা নামে নানা রূপে এদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই আছে। শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, বাচস্পতি মিশ্র, কুল্লুক ভট্ট, মেধাতিথি প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ টীকা লিখেই চিরস্মরণীয়। আজকালকার অর্ব্বাচীন কালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ পরীক্ষারূপী "তপ্তা বৈতরণী নদী" পার করবার জন্য ছাত্রগণকে পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে বহুগুণ প্রবৃদ্ধ কলেবর নোট দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকেন। এই সকল নজীরের বলে আমিও যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার দুঃসাহস করি' তা হলে সে অপরাধ একেবারে অক্ষমণীয় হবে না।

কৃষকের দুঃখের কথা অনেক। তার অন্য কিছুর অভাব থাক

আর নাই থাক, দুঃখের কথার অভাব নাই। আজ তার দু' একটা কথা বলব।

. . . .

জমিদারের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক জমি আর তার খাজানা নিয়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এ দুটি কথার সংজ্ঞা (definition) নেই। আমি আগে খাজনার কথা বলব, তারপর জমির কথা। খাজনার সংস্কৃত এবং বাঙলা প্রতিশব্দ "কর" আর ইংরেজী প্রতিশব্দ "rent" একথা না বললেও চলত, কিন্তু এ দুটো কথা এক জিনিষকে বোঝায় না এবং এর একটি অন্যটির প্রতিশব্দ নয়, সেইটে বোঝাবার জন্য কথাটা বলা অনাবশ্যক মনে করছি না। জমি সম্বন্ধীয় করের অর্থ জমি থেকে যে আয় হয় তারই যে অংশটা রাজাকে দেওয়া যায়। Rent এর অর্থ জমির ব্যবহারের বিনিময়ে যা দেওয়া যায়। প্রথমটায় জমি আমারই, আমি চাষ আবাদ করে তার থেকে কিছু লাভ করি, রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য রাজাকে সেই লাভের একটা অংশ দিই। এই অর্থেই এদেশে প্রাচীন কাল থেকে এ পর্য্যন্ত "কর" কথাটার ব্যবহার চলে আসছে। দ্বিতীয়টায়, জমি অন্যের, আমি কেবল ব্যবহার করি, আর সেই ব্যবহারের মূল্যস্বরূপ যার জমি তাকে কিছু দিই। এর প্রভেদটা এত স্পষ্ট যে স্পষ্টতর করে তা আর বুঝিয়ে দেবার আবশ্যক নেই। এই জন্যই হিন্দুরাজত্ব কালে এবং মুসলমান রাজত্বকালে রাজা জমি ক্রোক-বিক্রী করতে পারতেন না এবং করতেননা। যথা সময়ে কর দিতে না পারার জন্য জমিদারের "বৈকুণ্ঠ" দর্শন পর্য্যন্ত হত, কিন্তু প্রজার প্রতি কোনো অত্যাচারের কথা শোনা যায় নি। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজ কোম্পানী। তাঁরা দেশের কর আদায়ের ভার পেয়ে কর শব্দের ইংরেজী অনুবাদ করলেন rent এবং শব্দ ও অর্থের যে ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ আছে তা থেকে তাঁদের দেশে, অর্থাৎ—বিলেতে যে অর্থে rent শব্দটার ব্যবহার আছে সেই অভ্যস্ত অর্থটাই বুঝলেন। বিলেতে জমিটা জমিদারের, প্রজা তার ব্যবহার করে এবং ব্যবহারের মূল্যস্বরূপ কিছু দিয়ে থাকে, তারই নাম rent. কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা আরও বুঝলেন যে পতনোন্মুখ নবাবী-গবর্ণমেণ্ট প্রজার উপর যে সকল অবৈধ কর বসিয়েছিলেন সেগুলিও "আচারাৎ" প্রজার অবশ্য দেয়। সুতরাং জমির আসল কর ও এই অবৈধ করগুলি যোগ করে যা হল তাই হল rent. ১৭৯৩ সালের ৮ রেগুলেশনের ৫৪ ও ৫৫ ধারায় এই অবৈধ করগুলিকে বৈধ করে দেওয়া হল। ব্যবস্থা হল all cesses (abwab, mathat, mangan &c) are to be consolidated with the substantive rent (asl) in one sum. তবে কোম্পানী বাহাদুর দয়া করে বলে দিলেন যে, এর উপরেও যদি কেহ কোনো কর আদায় করেন, তা অবৈধ হবে। No *new* cesses are to be imposed; কিন্তু এ বিধির সম্মান রক্ষা করা হল একে লঙ্ঘন করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভুল ভ্রান্তিগুলো ক্রমে যত দেখা যেতে লাগল, ততই অন্য অন্য সংশোধক বিধিব্যবস্থা হতে লাগল। এই সংশোধক বিধির মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন একটি। এর দ্বারা প্রজার স্বত্ব কতকটা নির্দ্দিষ্ট করবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হল না। হাইকোর্টের বিচারপতিরা একটা মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে বললেন. এই আইনে প্রজার অধিকার সম্পূর্ণ ভাবে বিবৃত করা হয় নি। আরও বললেন যে, চিরাগত আচার প্রতিষ্ঠিত ভোগস্বত্বের যে অধিকার সে অধিকার প্রজার অক্ষুণ্ণ থাকবে। (Selections from papers relating to the Bengal Tenancy Act,

1885) এর মধ্যে এই আইনের খাজনা বৃদ্ধির ধারাগুলি নিয়েও অনেক আন্দোলন সমালোচন হতে লাগল। ম্যালথস (Malthus) খাজনার সংজ্ঞা দিয়েছেন "that portion of the value of the whole production which remains to the owner of the land after all the outgoings belonging to its cultivation, of whatever kind, have been paid, including the profits of the capital employed, estimated according to the usual and ordinary rate of agricultural capital at the time being." অর্থাৎ—কোনো প্রকার শস্য উৎপাদন করতে হলে কৃষকের যে সমস্ত ব্যয় হয় তা, আর তার জন্য যে মূলধন লাগে তার সুদ বাদে উৎপন্ন শস্যের যে অংশ বাকী থাকে তাই হচ্ছে প্রকৃত খাজনা বা rent. হাই কোর্টের সে সময়কার প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নস্ পীকক (Sir Barnes Peacock) একটা মোকদ্দমায় খাজনার ম্যালথস-কথিত এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এতে জমিদারদের সুবিধা হয় না, তাই এই মীমাংসার বিরুদ্ধে একটা মহা আন্দোলন হয়। ১৮৬৫ সালে ঠাকুরাণী দাসী বনাম বিশেশ্বর মুখুযোর মোকদ্দমার আপীল্ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে উপস্থিত হয়। ফুল বেঞ্চের অধিকাংশ বিচারপতিরা স্যার বার্নস্ পীককের মতের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তাঁরা মীমাংসা করলেন যে, প্রজা জমিদারকে "ন্যায্য" খাজনা দিতে বাধ্য। "ন্যায্য" খাজনার অর্থ করলেন সমস্ত উৎপন্ন শস্যের সেই অংশ যে অংশ দেশের রীতি অনুসারে জমিদারের প্রাপ্য, "that portion of the gross produce, calculated in money, to which the zamindar is

entitled under the custom of the country", (The great rent case. Thakurani Dasi v, Bisheshar Mukhurji, B. L. R. F. B. vol, 202) স্যর বার্নস্ পীককের গৃহীত ম্যালথসের খাজনার সংজ্ঞার সঙ্গে একবার এই সংজ্ঞাটার তুলনা করুন। একটায় মূলধনের সুদ ও চাষের খরচ খরচা বাদে যা থাকে তাই, আর একটায় ও-সকল কিছু বাদ না দিয়ে সবসুদ্ধ যা হয় তারই একটা অংশ। সে অংশটা কত তাও নির্দ্দিষ্ট করে বলা হল না।" বলা বাহুল্য এ অংশটা হিন্দু রাজাদের আমলের ছ' অংশের এক অংশ নয়। এর আবার একটি বিশেষণ আছে—দেশাচার অনুসারে জমিদারের যা প্রাপ্য। দেশাচার বলতে বুঝতে হবে, দেশের প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে যে আচার তা নয়, নবাবী আমলের শেষ ভাগে যে অতি-আচার দ্বারা সকল রকম "আবওয়াব" খাজনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে "আসল জমা" হয়ে গেল, সেই আচার। এখন বিবেচনা করে দেখতে হবে এই খাজনাটা কি "ন্যায্য"? এই "আবওয়াব"-গুলোও কি ন্যায্য, যুক্তি সঙ্গত? আবওয়াব-রূপী অবৈধ অতিরিক্ত করগুলি বাদ দিয়ে যা থাকে তার সঙ্গে আবওয়াব-সংযুক্ত খাজনার তুলনা করে দেখা উচিত। তা হলে বুঝতে পারা যাবে "আসল জমা" বলে যে খাজনা এখন প্রজার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে, সেটা আসল নয়। আসলটা তার একটা সামান্য অংশ মাত্র। এই অত্যন্ত অধিক খাজনা দিতে দিতে এবং তার সঙ্গে আরও কত কি দিতে দিতে প্রজা যে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রজার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে ১৮৬৮ সালে তখনকার গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স (Lord Lawrence) বলেছিলেন "It would be necessary

for the Government sooner or later to interfere and pass a law which should thoroughly protect the raiyat and make him what he is now only in name, a free man, a cultivator with the right to cultivate the land he holds, provided he pays a fair rent for it' (Bengal Tenancy Act, edited by Rampini and Kerr, 4th Edition, p. xii) এর মধ্যে rent-এর বিশেষণ fair কথাটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

তার পর ১৮৮৩ সালে যখন Bengal Tenancy Bill ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হয়, লর্ড রিপন বলেছিলেন যে, কৃষকের যাতে স্বার্থরক্ষা হয় ও মঙ্গল হয় তা করবেন বলে গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু "লজ্জার বিষয়" গবর্ণমেণ্ট সে প্রতিজ্ঞা আজও পালন করেন নি। তাঁর নিজের ভাষায় "We have endeavoured to make a settlement which * * * we believe to be urgently needed * * * for the protection and welfare of the taluqdars, raiyats and other cultivators of the soil, whose interests we then undertook to guard and have to our shame, too long neglected." (Selections from papers relating to the Bengal Tenancy Act, 1885, pp 140-141.)

এই সমস্ত থেকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রজার হিত সাধনে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা আছে, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় জমিদারের পক্ষ সমর্থন করতে অনেক প্রভাবশালী লোক আছেন, আর

দরিদ্র অসহায় প্রজার পক্ষ সমর্থন করতে কেউ নেই। কাজেই ব্যবস্থাপক সভার আইন কানুনে প্রজার বিশেষ কোনো উপকার হয় নি। তার দুরবস্থা যেমন ছিল তেমনই আছে। দেশের কৃষিকর্ম্মের বর্ত্তমান হীন অবস্থা বিবেচনা করলে, পক্ষপাতশূন্য বিচারক স্পষ্টই দেখবেন যে প্রচলিত খাজনার হার উৎপন্ন শস্যের মূল্যের তুলনায় অত্যন্ত অধিক এবং তার আদায়ের প্রণালী অত্যন্ত প্রজারক্তশোষক। ১৮৮০ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনকে দেখান হয়েছিল যে, এ দেশের কোনো কোনো তালুকের খাজনা উৎপন্ন শস্যের মূল্যের শতকরা ৩১ অংশ। ১৯০০ সালে ভারত সচিবের কাছে একটা দরখাস্ত করা হয়েছিল। তাতে দেখান হয়েছিল যে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে চাষের খরচ-খরচা বাদে উৎপন্ন শস্যের মূল্যের যা বাঁচে কৃষককে কোনো কোনো স্থলে তার অর্দ্ধেকেরও বেশি খাজনা দিতে হয়। সেই জন্য সেই দরখাস্তে প্রার্থনা করা হয়েছিল যে, খাজনাটা যেন উৎপন্ন শস্যের মূল্যের অর্দ্ধেকের বেশি না হয়। প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নি।

স-আবওয়াব খাজনার এই গুরুভার অনেক কৃষকের পক্ষে অসহনীয় হয়ে পড়েছে। বাকী খাজনার মোকদ্দমার সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে এবং তার ডিক্রীর দায়ে অনেক কৃষকের জোত জমা বিক্রী হয়ে যাচ্ছে এবং তারা দিনমজুরী করতে বাধ্য হচ্ছে! সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় এইরূপ দিন-মজুরের সংখ্যা—

১৮৯১ সালে ছিল	১,৮৬,৭৩,২০৬
১৯০১	৩,৩৫,২২,৬৮১
১৯১১ — ...	৪,১২,৪৬,৩৫৫

খাজনা-আইনের প্রত্যক্ষ ফল এমন আর কোথাও দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট ত আবশ্যক অনাবশ্যক অসংখ্য বিষয়ে কমিশন নিযুক্ত করছেন, কিন্তু দরিদ্র প্রজার শোচনীয় দুরবস্থার হেতু ও প্রতিকার নির্ণয় করতে একটা কমিশন নিযুক্ত করেন না কেন? বিষয়টা যে অনুসন্ধানের যোগ্য তা বোধ হয় কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। গবর্ণমেণ্টের কাছে অনেকবার প্রার্থনা করা হয়েছে যে, হতভাগ্য প্রজার অবস্থাটা একবার তদন্ত করে দেখুন, কিন্তু সে প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট কখনো মঞ্জুর করেন নি। দুঃখে ও নৈরাশ্যে ডি, ই, ওয়াচা বলেন "It is a matter of profound regret to have to say that every laudable and reasonable appeal made to the Government here or at home to have once for all an independent and exhaustive inquiry into the condition of the wretched ryot has been uniformly refused" (Indian Journal of Economics, Vol. 1, No. 1.)

এই ত গেল খাজনার কথা, জমির কথাও সংক্ষেপে একটু বলি। জমি মানে যে কেবল চাষের জমি বা বাসের জমি বা বাগান-পুকুর করবার জমি তা নয়, তা আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। জমি সংজ্ঞার ভিতর এ সকল ত আছেই, আরও আছে নদী, নালা, খাল, বিল, পাহাড়, পর্ব্বত, বন, খনি প্রভৃতি। আগে এ সকলে প্রজার অধিকার অব্যাহত ছিল। প্রজা প্রাকৃতিক জলাশয়ে অবাধে মাছ ধরত, বনের ফল খেত, বন থেকে জ্বালানী কাঠ আনত, বনে গোরু চরাত, পাহাড়-পর্ব্বত থেকে ঘর তৈয়ের করতে পাথর নিত, খনি থেকে যথাসাধ্য খনিজ নিত। সেকালের বিধি ছিল গ্রামের চার দিকে চারশ' হাত

জমি, অথবা তিন বারে লাঠি ছুড়ে যতদূর ফেলা যায় ততদূর পর্য্যন্ত জমি, পশুচারণের জন্য রাখতে হবে। নগরের চার দিকে এর তিন গুণ।

"ধনুঃ শতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ
শম্যাপাতাস্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু ॥"

(মনু ৮। ২৩৭)

আমাদের হিন্দু জমিদারগণ যাঁরা মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে সান্যাল মহাশয়ের কন্যার বিবাহ এবং আগ্রার লালাজীর পুত্রের সঙ্গে ঢাকার মিত্র মহাশয়ের কন্যার বিবাহকে "অসবর্ণ" বিবাহ-পর্য্যায়ে ফেলে, অসবর্ণ-বিবাহের বিরুদ্ধে বচনামৃত উদ্ধার করবার জন্য শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করছেন, একবার মনুর এই আদেশটা শিরোধার্য্য করে, তাঁদের জমিদারীভুক্ত প্রত্যেক গ্রামের চার দিকে এই রকম গোচারণ রাখবার ব্যবস্থা করুন না?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গ্রামের সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নি, জরিপও হয় নি। সুতরাং গ্রামস্থ এবং গ্রামের নিকটস্থ প্রাকৃতিক জলাশয়, বন প্রভৃতি জমিদারীভুক্ত করে নিতে জমিদার কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করলেন না। প্রজা এখন গোরু চরাবার স্থান পায় না। গ্রামের গো-চর জমি ত সব আবাদ হয়ে গিয়েছে, বনের গো-চরের জন্য কর দিতে হয়। আর গোচর জমির অভাবজনিত ঘাসের অভাবে গাই আর তেমন দুধ দেয় না। শিশুগুলি "গোয়ালিনী মার্কা" বিশুদ্ধ (?) দুধ খেয়ে যকৃৎ বাড়াচ্ছে আর শিশুদের পিতারা ঘিয়ের ছদ্মবেশে সেই নামে যে জিনিষটি বাজারে বিক্রী হয় তাই খেয়ে অজীর্ণ রোগ বাড়াচ্ছেন। জ্বালানী কাঠ ত পাওয়াই যায় না, যেখানে বন আছে

সেখানে মূল্য দিয়ে জমিদারের কাছে কিনতে হয়। প্রজা কাঠের অভাবে গো-চর জ্বালিয়ে তার জমিকে সারশূন্য করে ফেলছে। আর যেহেতু প্রজার "বৃক্ষ রোপন" করবার অধিকার আছে কিন্তু "ছেদন" করবার অধিকার নাই, সেই হেতু প্রজার নিজের আজ্লানো গাছটি মরে গেলে, গাছের মৃত্যু সংবাদটি জমিদারকে দিয়ে, মৃতগাছটি তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। যে সকল প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছ ধরবার অধিকার প্রজার চিরকাল ছিল, এখন জমিদার তা উচ্চ মূল্যে বিক্রী করে, প্রজাকে নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দিচ্ছেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট জ্ঞানত বা অজ্ঞানত জমিদারকে একটু বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। নদীয়া জেলায় একটা বিলে প্রজারা একবার মাছ ধরে। জমিদার তাদের বিরুদ্ধে মাছ চুরির মোকদ্দমা করেন। বিচারের সময় প্রজারা বলে যে মাছগুলো সেই বিলে আপনা আপনি অন্য জলাশয় থেকে আসে এবং আপনা আপনি সেখান থেকে চলে যায়, অর্থাৎ—মাছগুলো স্বাভাবিক সচ্ছন্দচারী, *ferae naturae* কারো অধিকারভুক্ত নয়, তাদের সরালে চুরির অপরাধ হয় না। বিচারক সে কথা শুনলেন না, তাদের চোর সাব্যস্ত করে বেত মেরে ছেড়ে দিলেন। আপীলে জজেরা বললেন ও-টা চুরি নয়। এ নিয়ে একটা আন্দোলন হল, ফল হল মাছমারার আইন—Private Fisheries Act. এই রকম করে প্রজা তার চিরন্তন স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হল, আর জমিদার জলকরের অধিকারটি পেয়ে ধন বৃদ্ধি করতে লাগলেন। এইরূপে এক একটি করে প্রজার অনেক অধিকার লোপ পেয়েছে।

এখন এই লুপ্ত অধিকারগুলি প্রজাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যর্পন করতে

হবে। লর্ড লরেন্সের ভাষায় তাকে স্বাধীন করে দিতে হবে, নামে মাত্র নয়, কাজে। আর অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে। এর জন্য যে বিধি-ব্যবস্থা আবশ্যক তা করতে হবে, অর্থাৎ—"pass a law which should thoroughly protect the raiyat and make him what he is now only in name, a free man." কৃষিবলই দেশের বল, একথা গবর্ণমেণ্ট, জমিদার, প্রজা সকলকেই স্মরণ রাখতে হবে।

শ্রীহৃষীকেশ সেন

বৈশ্য।

—:*:—

মনু উপদেশ করেছেন, শূদ্র সমর্থ হলেও ধনসঞ্চয় করবে না। কেননা বহুধনের গর্ব্বে সে হয় ত ব্রাহ্মণকেও পীড়া দিতে আরম্ভ করবে। অথচ এই ভৃগুসংহিতা যে-সমাজের ধর্ম্মশাস্ত্র তার ধনসৃষ্টি ও ধনসঞ্চয়ের কাজটি ছিল বৈশ্যের হাতে। এ বর্ণটি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রকারের এমন আশঙ্কা হয় নি, সম্ভব তার কারণ বৈশ্য ছিল আর্য্যসভ্যতার ভিতরের লোক—দ্বিজ। শাস্ত্রের শাসন ছাড়াও তার মনে এই সভ্যতার বাঁধন ছিল, যার টানে কেবল ধনের জোরে বিদ্যা ও বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলার কল্পনা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

বিংশ শতাব্দীর বৈশ্যের অবশ্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের বালাই নেই; সভ্যতার বাঁধনকেও সে একরকম কাটিয়ে উঠেছে। কেননা বৈশ্য আজ সভ্যতার মাথায় চড়ে' ব্রাহ্মণকে ডেকে বলছে, তোমার কাজ হ'ল আমার কারখানার কল-কব্জা গড়া, কাঁচা মালকে কেমন করে' সস্তায় ও সহজে তৈরী মাল করা যায় তার ফন্দী বাৎলান; না হয় আমার খবরের কাগজে আমার মতলবমত প্রবন্ধ জোগান। শূদ্রকে বলছে, এস বাবু তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে, লেগে যাও আমার কলের কাজে; পেট-ভাতার অভাব হবে না। আর জেনো এই হচ্ছে সভ্যতা, এতে অসূয়া করা মানে দেশদ্রোহ, একেবারে সমাজের ভিত ধরে' নাড়া দেওয়া। ক্ষত্রিয়কে বলছে, হুসিয়ার থেকো যেন এই যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের

তৈরী আমার কলের মাল দিকে দিকে ছুটল, জলে স্থলে এর গতিকে অবাধ রাখতে হবে, তোমার কামান, বন্দুক, জাহাজ, এরোপ্লেন যেন ঠিক থাকে। বিদেশের বৈশ্য যদি এই বণিকপথের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে নিজে গুঁড়ো হয়ে তাকে গুঁড়ো করতে হবে। তাতে দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে তোমারও অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ হবে, আমারও গোলাগুলি, রসদ, হাতিয়ারের কারখানার মুনাফা বেড়ে যাবে। আর ঘরেও তোমার কাজের একেবারে অভাব নেই। আমার কলের মজুরেরা অতিরিক্ত বেয়াড়া হয়ে উঠলে তাদের উপর গুলি চালাতেও মাসে মাসে তোমার ডাক পড়বে।

এই যে বৈশ্যপ্রভুর ব্যবস্থা, যার বর্ণ ধর্ম্ম কথনের প্রথম কথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই তিন বর্ণের এক ধর্ম্ম, চতুর্থ বর্ণ বৈশ্যের শুশ্রূষা, এরি নাম 'ক্যাপিটালিজম্' বা মহাজন-তন্ত্র। এর নাগপাশ গত একশ' বছর ধরে' ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি অঙ্গে পাকে পাকে নিজেকে জড়িয়ে এসেছে এবং আজ তার চাপে সে সভ্যতার দম বন্ধ হবার উপক্রম। গত যুদ্ধের কামানের শব্দে ট্রেঞ্চের মধ্যে জেগে উঠে ইউরোপের সভ্যতা এ বজ্রবাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার যে ব্যাকুল চেষ্টা করছে তারি নাম কোনও দেশে 'সোভিয়েট্', কোনও দেশে 'ন্যাশনেলিজেশন্'।

(২)

আধুনিক ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থায় যে করে' বৈশ্য-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার ইতিহাস বিস্ময়কর কিন্তু জটিল নয়। এর মূল ভিত্তি হ'ল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপীয় জাতিগুলির

মধ্যে জড়-বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি, প্রকৃতির সকল চেষ্টার শক্তি ও নিয়মের জ্ঞানের অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রসার, এবং সে জ্ঞানকে মানুষের ঘরকন্নার কাজে লাগাবার চেষ্টার অপূর্ব্ব সাফল্য। এর ফলে ইউ-রোপীয় সভ্যতার স্থূলদেহ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে দেখতে দেখতে একেবারে নব কলেবর নিয়েছে। সে চেহারা ইউরোপের ও ইউরোপের বাইরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সমস্ত সভ্যতার চেহারা থেকে একেবারে ভিন্ন রকমের। বাষ্প আর বিদ্যুৎ এই দুই শক্তিকে লোহার বাঁধনে বেঁধে ইউরোপ যে শিল্প, কারু, কৃষি, বার্ত্তা, ব্যবসা, বাণিজ্য গড়ে তুলেছে তার কাজের ভঙ্গী ও সামর্থ্যের সঙ্গে কোনও যুগের কোনও সভ্যতার সে দিক দিয়ে তুলনা করাই চলে না। যেমন ফরাসি অধ্যাপক সেনোবো লিখেছেন এ দিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে আজকার ইউরোপের যে তফাৎ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন মিশরের তফাৎ তার চেয়ে অনেক কম। বলা বাহুল্য এ তফাৎ কল কারখানা, রেল ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ টেলিফোনে মূর্ত্তিমান হয়ে রয়েছে। এবং আশা করা যায় অল্পদিনেই মোটর, এরোপ্লেন সে মূর্ত্তির অদল-বদল ঘটিয়ে এ তফাৎকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। কিন্তু এই যে ইউরোপ কারখানায় কলে শিল্পসামগ্রী তৈরী করছে, রেলে ষ্টীমারে তার পণ্য পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিচ্ছে, টেলিগ্রাফ টেলিফোনে দাম দস্তুর বেচা কেনা চালাচ্ছে এর ভিতরের লক্ষ্য কিছুই নূতন নয়। সেটি অতি প্রাচীন, মানুষের সভ্যতার সঙ্গে একবয়সী। সে লক্ষ্য হ'ল কি করে মানুষের জীবনধারণের ও সে জীবনের শোভা সম্পদ বিধানের সামগ্রীগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে জোগান দেওয়া যায়। পশুপালন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই এই প্রশ্নেরই উত্তর। কেবল উনবিংশ ও

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ তার শিল্প-বাণিজ্যের কৌশলে ও ব্যবস্থায় এ সমস্যার যে সমাধান করেছে, জিনিষের জোগানহিসাবে তা তুলনা রহিত। যা মানুষের অসাধ্য ছিল তা সুসাধ্য হয়েছে; যা বহুদিন, বহুজন ও বহু আয়াস সাধ্য ছিল সামান্য লোকের নামমাত্র পরিশ্রমে তা মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করেছেন, আজ কলের তাঁতে একজনে যে কাপড় বোনে সেটা হাতের তাঁতের ত্রিশজন তাঁতির কাজ; হাতের চরকার এগার'শ' জনের সুতো আজ কলের চরকায় একজন কেটে নামাচ্ছে।

কিন্তু এ নব শিল্প-বাণিজ্যের এই যে অদ্ভুত কর্ম্মসামর্থ্য, একে চালনা করতে হলে গুটিকতক উপায় অপরিহার্য্য। তার মধ্যে প্রধান হ'ল বিপুল আয়তনের উপাদানকে একই জায়গায় একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত করা এবং তার জন্যে চাই বহু লোককে একত্র জড় করে' তাদের নানা রকম মজুরীর সাহায্য। আধুনিক কলের দৈত্য উপকথার দৈত্যের মতই নিমেষে পর্ব্বত প্রমাণ কাজ করে ওঠে, কিন্তু সত্যিকার দৈত্য হওয়াতে সে চায় কাজের পরিমাণ, মালের জোগান, আর মানুষের হাতের সাহায্য। সুতরাং শিল্প-বাণিজ্যের এই নূতন কৌশলকে কাজে লাগাতে হ'লে চাই দেশ বিদেশ থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে' জমা করা, কল গড়ে' কারখানা বসান, আর সে কল-কারখানা চালাবার জন্য নানারকম বহু মজুর একত্র করা। এবং এ-সবারই জন্য চাই টাকা, অর্থাৎ—পূর্ব্বসঞ্চিত ধন। যাতে মাল কেনা চলবে, কল কারখানা তৈরী হবে, মজুরের মজুরী যোগাবে। এবং সে টাকা অল্পস্বল্প হলে চলবে না, একসঙ্গে চাই বহু টাকা। কেননা এ ব্যাপারের মূল কথাই হচ্ছে, যা পূর্ব্বে নানালোকে নানা

জায়গাতে অল্পেস্বল্পে এবং অল্পস্বল্প তৈরী করত, তাই করতে হবে এক জায়গায়, এক তত্ত্বাবধানে, বিদ্যুৎগতিতে আর হাজার গুণ বেশি পরিমাণে। ফলে ইউরোপ জুড়ে কল কারখানা তারাই বসিয়েছে হাতে যাদের ছিল জমান-টাকা এবং কলের চাকার পাকে পাকে নামতার আর্য্যার মত সে টাকা বেড়ে উঠেছে। আর টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলও বেড়েছে কারখানাও বড় হয়েছে। অর্থাৎ—টাকার অঙ্কটা আরও বেড়ে চলেছে। আর এও অতি স্পষ্ট যে এই কলের তৈরী মালের রাশিকে দেশ বিদেশে কাটাতে হলে চাই বড় মূলধনী ব্যবসায়ী, যারা একদমে একে নিঃশেষ করে' কিনে নিতে পারবে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীর হাত দিয়ে ধীরে সুস্থে এ মাল কাটানোর চেষ্টা করা এসব কারখানার মালিকদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। এমনি করে আজকার ইউরোপের সে বিরাট ধনসম্পদ তার একটা প্রকাণ্ড অংশ এসে জমেছে সংখ্যায় অতি অল্প একটি শ্রেণীবিশেষের হাতে—যারা কারখানার মালিক বা সেই কারখানার মালের ব্যবসায়ী। হিসাবে দেখা গেছে যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (যা ইউরোপের একখণ্ড 'ছিট' মাত্র) দেশের সমুদয় ধনের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি রয়েছে লোক সংখ্যার ত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগের হাতে। ধনের গৌরব সব দেশে, সব কালেই ছিল ও থাকবে। সুতরাং এই অতিধনী বৈশ্য শ্রেণীটি যে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তিশালী হবে এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই।

(৩)

কিন্তু এই মহাজন সম্প্রদায়টির ইউরোপে যা প্রভাব ও প্রতিপত্তি-মাত্র, ধন গৌরবের উপর তার সামান্য অংশই নির্ভর করছে। যার

টাকা নেই সে যার টাকা আছে তাকে দূরে থেকেই নমস্কার করতে পারে যদি না জীবিকার জন্য তার দরজায় দাঁড়াতে হয়। এই জন্য ইউরোপের পক্ষে তার মহাজন শ্রেণীটিকে কেবল টাকার খাতির দিয়ে দূরে রাখা সম্ভব নয়। কেননা এই শ্রেণীটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপের অন্নদাতা। আর তা দু'রকমে। নূতন শিল্প-ব্যবস্থায় দেশ জুড়ে ধনস্থষ্টির যে সব ছোট খাট ব্যবস্থা ছিল তা লোপ পেয়েছে। একমাত্র কৃষি ছাড়া ইউরোপর সমস্ত ধন প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হচ্ছে এই মহাজনদের বড় বড় কারখানায়। এবং কৃষি জিনিষটিও আজ ইউরোপের চোখে অতি অপ্রধান শিল্প। কারণ পশ্চিম ইউরোপ আবিষ্কার করেছে নিজের অন্ন দেশে জন্মানোর চাইতে কলের তৈরী শিল্প-সামগ্রী দিয়ে বিদেশ থেকে তা কিনে আনাই তার পক্ষে বেশি সহজ ও সুবিধার। এবং সে শিল্পের জন্য যে কৃষিলভ্য কাঁচা মালের দরকার তার সম্বন্ধেও সেই কথা। ফলে পশ্চিম ইউরোপের অধি-কাংশ লোকের জীবিকার উপায় হচ্ছে মহাজনদের এই বড় বড় কারখানাগুলিতে ও তাদের আফিসে হাতে বা কলমে মজুরীগিরি করা। অর্থাৎ—এই মহা শ্রেষ্ঠি সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই এদের মনিব ও অন্নদাতা। আর পরোক্ষে ইউরোপের সবারই অন্নবস্ত্র এরাই যোগাচ্ছে। জীবনযাত্রার যা-কিছু উপকরণ তা হয় আসছে এদের কারখানা থেকে, নয় ত এদেরি কারখানার কলে তৈরী-মালের বিনিময়ে। যাদের হাতে জীবন-মরণের কাঠি রয়েছে তারা যে সর্ব্বময় হয়ে উঠবে এতে আর বিস্ময় কি।

কিন্তু এ বৈশ্য-প্রভুত্বের সবচেয়ে যা প্রধান কথা তা এই, আধুনিক যুগের নূতন ব্যবস্থায় এই যে সব অতিকায় শিল্প-বাণিজ্যের

প্রতিষ্ঠান মহাজনদের মূলধনে ও চেষ্টায় গ'ড়ে উঠেছে এগুলি যত লোকের অন্ন যোগাচ্ছে এর পূর্ব্বে ইউরোপের পক্ষে তা অসাধ্য ছিল। আর অন্ন বাড়লে যে জীবও বাড়ে এটা প্রাণ-বিদ্যার একবারে প্রথম-ভাগের কথা। ফলে গেল-এক'শ বছরের মধ্যে ইউরোপের লোক-সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। এবং এখন এ বিরাট জনসঙ্ঘের জীবিকা যোগাতে হ'লে ইউরোপের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের চাকা একদিনও অচল হলে চলবে না। এর আয়তন যদি একটু খাটো কি বেশ একটুকু মন্দা হয় তবে ইউরোপ তার সমস্ত লোকের মুখে আর অন্ন দিতে পারবে না। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বাণিজ্যে ইউরোপে যে লোক বেড়েছে, বিংশ শতাব্দীতে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে সেই শিল্প-বাণিজ্য ছাড়া আর গতি নেই, এ যে কত সত্য জর্ম্মাণযুদ্ধের এক আঁচড়েইত তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের ধাক্কায় এ শিল্প-বাণিজ্যের কল যেই একটু বিকল হয়েছে অমনি ইউরোপ জুড়ে কলরব ; ইংলণ্ডে চিনি নেই, ফ্রান্সে কয়লা নেই, জর্ম্মাণিতে চর্ব্বির জন্য হাহাকার, অষ্ট্রিয়ায় দুধ না পেয়ে শিশু মরছে। আর একথা আরও স্পষ্ট হয়েছে, গেল-যুদ্ধের ফলে মূলধনী মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রকম-সকমে। রুষিয়ার বলসেভিক, কি জর্ম্মাণীর সোস্যালিষ্ট,কি ইংলণ্ডের ন্যাশনালিজেশন্ পন্থী এমন কথা কারও মুখে ওঠে নি যে, এই যে আধুনিক ইউরোপের দৈত্যাকৃতি সব শিল্প-বাণিজ্য, যা কলের ও কাজের চাপে মানুষকে পিষে ফেলছে, একে ভাঙা দরকার। কেননা ইউরোপ মর্ম্মে মর্ম্মে জানে যে, এই শিল্প-বাণি-জ্যই তার প্রাণ। একে মারতে গেলে মরতে হবে। তাই এখন সবারই লক্ষ্য কি করে' এই শিল্প-বাণিজ্যকেই বহাল ও সচল রাখা চলে, কিন্তু তার বর্ত্তমান মালিক মহাজনদের ছেটে ফেলা যায়। এ চেষ্টা

সফল হবে কিনা তা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। কিন্তু যতদিন না হবে, ততদিন বৈশ্য ইউরোপীয়-সমাজ ও রাষ্ট্রের মাথায় চড়েই থাকবে। কেননা ইউরোপের মুখের অন্ন তার হাতের মুঠোয়।

(৪)

বলা বাহুল্য ইউরোপের বৈশ্য-প্রভুত্বের বেগ কেবল ইউরোপ বা ইউরোপীয়ান জাতিগুলির মধ্যেই আবদ্ধ নেই; পৃথিবীময় সে নিজেকে জানান দিচ্ছে। কেননা ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর প্রভু। এবং স্বভাবতই এ প্রভুত্বের প্রয়োগ হচ্ছে ইউরোপের প্রভু বৈশ্যের মারফত, তারই সুবিধা ও প্রয়োজন মত। ইউরোপের বিজ্ঞান আজ বাহুবলে ইউরোপকে অজেয় ও দুর্নিবার করেছে। এবং সমস্ত পৃথিবী প্রত্যক্ষে বা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের জিত রাজ্য। কিন্তু এ জয় অশ্বমেধের রাজচক্রবর্ত্তীর জয় নয়। যুদ্ধের উল্লাস কি জয়ের গৌরব এর লক্ষ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল জিত দেশ ও পরাজিত জাতিকে ইউরোপের কারখানার কলের চাকায় জুড়ে দেওয়া। যে শিল্প-বাণিজ্য ইউরোপকে অন্নবস্ত্র দিচ্ছে ইউরোপের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ তার চাই-ই চাই। সেখানকার মাটীর রস টেনেই ওরা বেঁচে রয়েছে। যে কাচা মাল কলে-তৈরী শিল্পে পরিণত হবে, তা প্রধানত আসছে ইউরোপের বাইরে অন্ ইউরোপীয়ান লোকদের দেশ থেকে। জীবনযাত্রার যে সব উপকরণ, বিশেষ করে' খাদ্য, যা ইউরোপের মাটীতে জন্মে না বা কলে গড়া চলে না, তাও বেশির ভাগ আনতে হবে ওখান থেকেই, অবশ্য এ দুই জিনিষ ইউরোপ গায়ের জোরে কেড়ে নিতে চায় না। তার কারখানার তৈরী শিল্পের জন্যেই কিনতে চায়। কিন্তু এদের

জোগান যাতে অব্যাহত, আর পরিমাণ যাতে প্রয়োজনমত হয় সে ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। কেননা কারখানার কল একদিনও বসে থাকলে চলবে না। সুতরাং এসব গরম দেশের অলস লোকেরা যদি নিজের ইচ্ছায়, অথবা লাভের লোভে এসব জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করে' সুবিধার দরে জোগান দিতে না চায় তখন ইউরোপকে বাধ্য হয়েই হাতে চাবুক নিতে হয়, সঙ্গিনের খোঁচায় এদের কাজের ইচ্ছাকে চাগিয়ে রাখতে হয়। এমন কি দু'চারজনার হাত পা' কেটে দিয়ে তাদের বাকী সঙ্গীদের হাত পা'গুলো যাতে কলের চাকার বেগের সঙ্গে তাল রাখতে উৎসাহী হয় সে চেষ্টা থেকেও পশ্চাৎপদ হ'লে চলে না। জর্ম্মাণ অধ্যাপক নিকলাই তাঁর 'যুদ্ধ ও জীবতত্ত্ব' নামের পুঁথিতে লিখেছেন যে, পৃথিবীর পঞ্চাশ কোটী ইউরোপীয়ান ও ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে-পড়া শ্বেত মানুষের হাতে এখনি এমন যন্ত্রপাতি আছে যে, আসছে-বিশ বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একশ' কোটী নানা জাতির অ-শ্বেত মানুষদের একেবারে নির্ম্মূল করে' উচ্ছেদ করতে পারে। এবং ফলে সমস্ত পৃথিবীটা কেবলমাত্র, অন্তত নিজেদের চোখে, উন্নততর শ্বেত জাতিদেরই বাসস্থল হয়। এ বিশ বছরের পরে, অর্থাৎ—যখন চীন তার সমস্ত লোককে আধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধ-বিদ্যায় শিক্ষিত করে' তুলবে, এবং নিজের 'ড্রেডনট' ও কামান গোলা নিজেই তৈরী করতে সুরু করবে, যেমন এখন জাপান করছে, হয়ত এ আর সম্ভব হবে না। কিন্তু ইউরোপ যে একাজে হাত দেবে না তা নিশ্চয়, কেননা ব্যাপারটা এমন ভয়ানক যে কল্পনায় তাকে ফুটিয়ে তুললেই পিছিয়ে আসতে হয়। এবং অধ্যাপক নিকলাই-এর মতে এ জেহাদপ্রচার করা মানে স্বীকার করা যে প্রকৃত জীবনযুদ্ধে,

যেখানে জয়ী হ'তে হয় পরকে মারার শক্তিতে নয়, নিজের বাঁচার শক্তিতে, শ্বেতের চেয়ে অ-শ্বেত শ্রেষ্ঠ। সুদূর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনায় এখানে একটা হাতের কাছের মোটাকথা চোখ এড়িয়ে গেছে, ইউরোপ যদি আসছে-বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব অ-শ্বেত জাতি-গুলিকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয় তবে তার পরের দশ বছরের মধ্যে ইউরোপ আর বর্ত্তমান থাকবে না। তার কল-কারখানার বেশির ভাগই অচল হবে। তার শিল্প-বাণিজ্য সমাজ-রাষ্ট্র সব ব্যবস্থারই মূলে টান পড়বে। কারণ পৃথিবী জুড়ে শস্যক্ষেত্রে, মাঠে, অরণ্যে যে সব কৃষ্ণ, তাম্র, পীত হাত-দ্রব্যসম্ভার জুগিয়ে ইউরোপের সভ্যতার স্থূল শরীরকে স্থূলতর করে তুলছে তার সবগুলিকে যদি শাদা হাত দিয়ে বদল করতে হয় তবে কারখানার কলে দেবার মত হাত ইউরোপে আর বেশি অবশিষ্ট থাকে না। ইউরোপের লোকসংখ্যার ইউরোপে বসে' অন্নসংস্থান অসম্ভব হয়। যে সব ভিত্তির উপর ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে একটা প্রধান হ'ল অন্-ইউ-রোপীয়ান ও অ-শ্বেত লোকদের পরিশ্রমের ফল সহজে ও স্বল্প মূল্যে পাওয়া। প্রাচীন গ্রীক-রোমান পণ্ডিতেরা দাসের শ্রম বাদ দিয়ে নিজেদের সভ্যতার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারতেন না। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে পারেন তার কারণ নামরূপের বদল ঘটালে জানা-জিনিষ চিনতে পণ্ডিতেরও কষ্ট হয়; আর মনে যা ওঠে তা স্পষ্ট করে' খুলে বলার অভ্যাস প্রাচীন পণ্ডিতদের যত ছিল আধুনিক পণ্ডিতদের তা নেই।

ইউরোপের বৈশ্য-প্রভুত্বের খোঁচা এমনি করে' ইউরোপের বাইরে তাম্র কালো পীত সব রং-এর লোকের গায়ে এসেই বিঁধছে। ইউ-

রোপের বৈশ্য চায় এরা নিরলস হয়ে তার কারখানার কাজের উপাদান আর মজুরের খাদ্য যোগায়। কিন্তু এ ছাড়া এর আরও একটা দিক আছে। ইউরোপ যেমন এদের কর্ম্মশীলতা চায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চায় এ কর্ম্মক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে না ওঠে এবং বিপথে না চলে। শিল্পের উপাদান যোগান এবং কৃষি পশু থেকে খাদ্য উৎপাদন, এতেই নিঃশেষ না হয়ে যদি এদের শক্তি ও বুদ্ধি নব শিল্পের নূতন বিদ্যা শিখে উপাদানকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করার দিকে চলে সেটা ইউ-রোপের চোখে অমঙ্গল। কেননা ইউরোপের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের মোটকথা বাকী পৃথিবী উপাদান ও খাদ্য যোগাবে, আর ইউরোপ ঐ উপাদান থেকে তৈরী-শিল্পদ্রব্যের এক অংশ বিনিময়ে ফিরিয়ে দেবে। যদি এ ব্যবস্থা উল্টে গিয়ে খাদ্য ও শিল্পসামগ্রী দুই-ই বাইরে থেকে ইউরোপের দরজায় উপস্থিত হয় তবে বদল দিয়ে এদের ঘরে নেবার মত জিনিষ ইউরোপের বড় বেশি থাকবে না। কেননা ইউ-রোপ যে শিল্প-বাণিজ্যে আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে সে তার দেশের প্রকৃতির গুণে নয়, লোকের প্রকৃতির গুণে। কিন্তু এ কথা যেমন গৌরবের তেমনি আশঙ্কার। যে সব দেশে প্রকৃতি ইউরোপের চেয়ে অকৃপণা, সে দেশের লোকের মনের পঙ্গুত্ব ও শক্তির খর্ব্বতার উপর এ শ্রেষ্ঠত্ব টিকে আছে। মন সচল হ'লে যে ইউরোপের শিল্প-বাণিজ্যের নূতন কৌশল শিখে শক্তিসঞ্চয়ে দেরী হয় না তার পরিচয় জাপান দিয়েছে। এবং যেখানেই এ পরিচয়ের আভাস পেয়েছে, ইউরোপ তার নাম দিয়েছে 'আতঙ্ক'। কারণ ইউরোপের বিশ্ব-প্রেমিকেরা যা-ই বলুন না, ধন ও শক্তিতে ইউরোপ এখন যেমন আছে তেমনি থাকবে। আবার বাকী পৃথিবীটাও ধনী ও শক্তিশালী

হয়ে উঠবে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় এর কোনও সম্ভাবনা নেই। ইউরোপ প্রধান হয়েছে, আর সবাই ছোট ও খাটো আছে বলে'। সে প্রাধান্য বজায় থাকবে—আর সবাইকে ছোট খাটো করে' রাখতে পারলে।

(৫)

বৈশ্য-ইউরোপের চাপ পৃথিবীর যে সব প্রাচীন সভ্য জাতিগুলির উপর এসে পড়েছে তাদের সবারই মনে হয়েছে ওর হাত থেকে রক্ষার উপায় ঐ বৈশ্যত্বকে ধার করে' তার উপর শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়া। কেননা চোখে দেখতে ইউরোপের বাহুতে বল দিচ্ছে তার সব অদ্ভুত কৌশলী কাজের সরঞ্জাম ও উপকরণের বিচিত্র বাহুল্য। আর এ সরঞ্জাম ও উপকরণ সবই যোগাচ্ছে তার বৈশ্যের কর্ম্মব্যবস্থা। প্রাচ্য দেশের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচ্য, জাপান পাশ্চাত্যের এই কর্ম্ম-কৌশল অল্পদিনেই আয়ত্ত করেছে। এবং ফলে পশ্চিম ইউরোপের প্রবল জাতিগুলির মত ইউরোপের চোখে সেও একটা প্রধান জাতি। তারও কারখানার কলে ইউরোপের মত মজুর খাঁটিয়ে শিল্প-সামগ্রী তৈরী হচ্ছে; সেগুলো জাহাজে উঠে পৃথিবীর বাজারের মত ফাঁক জায়গা দরকারী, অদরকারী, সাচ্চা, ঝুঁটো, ভারী ও ঠুন্‌কো মাল ভরে' দিচ্ছে, এবং সবের মাল সরিয়ে নিজের জন্য কতটা জায়গা খালি করা যায় তার চেষ্টা দেখছে। মহাজনী-জাহাজের পেছনে তারও মারোয়ারী জাহাজ সেজে রয়েছে; এবং পৃথিবীর শান্তির জন্য ইউরোপের আর পাঁচজন শান্তিপ্রয়াসীর মত সেও কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি তৈরী করে' যাচ্ছে। বিশ্বহিতের বাণী তার মুল থেকেও

সমান তেজে ও সমান বেগেই বেরুচ্ছে ; এবং মানবজাতির সভ্যতা রক্ষা ও বিস্তারের জন্য দুর্ব্বল জাতির সুফলা দেশের গুরুভার বহনে তার পীত-স্কন্ধের উৎসুক্য কোনও শ্বেত-স্কন্ধের চেয়ে কম নয়। বৃদ্ধ চীন ডাইনে ইউরোপ ও বাঁয়ে জাপান দু'দিক থেকে খোঁচা খেয়ে এ বৈশ্যত্বের দিকে লুব্ধনেত্রে তাকাচ্ছে। কিন্তু তার প্রাচীন সভ্যতার গভীর শিকড়, আর প্রকাণ্ড দেহের বিরাট বিপুলতা তাকে সোজা-সুজি ইউরোপের বৈশ্যত্বের পাঠশালায় ঢুকতে দিচ্ছে না। ইউরোপের নবীন বিদ্যার বেগ তার প্রাচীন সভ্যতাকে একটা নূতন সৃষ্টির পথে নিয়ে যাবে, এশিয়া সেই আশায় তাকিয়ে আছে। এবং সমস্ত বাধা কাটিয়ে পাছে চীন নিজের বৈশ্যমন্ত্রে জাপানের মতই সিদ্ধিলাভ করে সেই আতঙ্কে ইউরোপ মাঝে মাঝে চার দিক হল্‌দে দেখছে।

আমাদের ভারতবর্ষ এ বৈশ্য-তন্ত্রের খাস তালুক। কেননা এ মহাদেশ ইউরোপের সেই দেশের অধীন রাজ্য যেখানে বৈশ্য-তন্ত্রের মূর্ত্তি সবচেয়ে প্রকট, আর বৈশ্য-প্রভুত্বের মহিমা সবচেয়ে উঁচু। এবং 'কন্‌ষ্টিটিউশনাল্ ল'র পুঁথিতে যা-ই থাকুক আমরা সবাই জানি ব্রিটনের বৈশ্যরাজই আমাদের রাজা। স্বভাবতই প্রজার জাতির চোখে উন্নতি মানে রাজার জাতির মত হওয়া। সেই জন্য আমাদের দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশার কথা যখনি ভাবি তখন সহজেই মনে হয় এর প্রতিকারের উপায় ভারতবর্ষকে বিলাতের মত বড় বড় কারখানায় ভরে' ফেলা ; দেশের লোককে গ্রামের মাটি থেকে উপ্‌ড়ে এনে সহরের কলে জুড়ে দেওয়া। এবং সেজন্য সর্ব্বপ্রথম দরকার সকলে মিলে বৈশ্যকে দেশের মাথায় তোলা যাতে যার-ই মগজে বুদ্ধি আর মনে উৎসাহ আছে তার দু'চোখ এদিকে পড়ে। আমাদের সরকারী

বে-সরকারী রাজপুরুষেরাও ভারতবর্ষের যে-জাতি বৈশ্যমহিমা যতটা আয়ত্ত করেছে তাকে ততটা উন্নত বলে' স্বীকার ও প্রচার করেন। এবং আমাদের বড় ছোটর প্রমাণ যে তাঁদের হাতের মাপকাঠি সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাধ্য হয়েই স্বীকার কর্ত্তে হবে যে এ মাপে বাঙালীর উন্নতির বহর বড় বেশি নয়। আরব সমুদ্রের তীরের দুই একটি জাতির কাছে ত আমরা দাঁড়াতেই পারি নে। এমন কি যাঁরা বাঙলার বাইরে থেকে কেবল পাগ্‌ড়ী কি টুপি নিয়ে এসে বাঙলার বুকের উপর দিয়ে মোটর হাঁকাচ্ছেন, তাঁদের পাশেও আমরা নিতান্ত খাটো। আমাদের নিত্য দুঃখ-দৈন্যের চাপটা যখনি কোনও নৈমিত্তিক কারণে একটু বেড়ে ওঠে তখনি এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের আন্দোলন, আলোচনা, ধিক্কার, অনুশোচনার সীমা থাকে না। কলেজ-ফেরত বাঙালীর ছেলে নিরক্ষর অ-বাঙালীর ব্যবসায়ে কেরাণীগিরির উমেদার, এই উদাহরণ তুলে আমরা বাঙালীর মতি গতি এবং সর্ব্বোপরি আমাদের বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দুরবস্থা স্মরণ করে' যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। এ শিক্ষা যে কেবল ব্যর্থ নয়, উন্নতির পথে পায়েশিকল তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কেননা অশিক্ষিত বাঙালীর চেয়ে যে নিরক্ষর দৌল্লিওয়ালা শ্রেষ্ঠ এর পরিচয় ত একের মোটরকার ও অন্যের ছেঁড়া জুতোতেই সুপ্রকাশ। কিন্তু বাঙালীর মনের এমনি মোহ যে এর প্রতিকারে কেউ ইস্কুল কলেজ তুলে দেবার উপদেশ করে না। প্রস্তাব হয় এগুলিতে অন্য রকম শিক্ষা দেওয়া হোক। শিল্পবিদ্যালয় ও কারবার শেখার ইস্কুলে দেশটা ভরে' ফেলা যাক্। অথচ সকলেই জানি মোটরবিহারী দৌল্লিওয়ালা

কি শিল্প কি সওদাগরী কোনও ইস্কুলেই কোনও দিন পড়ে নি।

জর্ম্মাণযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে পৃথিবী-জোড়া দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঙলাদেশের অবস্থা অতি সঙ্কটের জায়গায় এসে পৌঁছেছে। এ সঙ্কট যে কত বড়, আর আমাদের দারিদ্র্যের ব্যাধি যে কত প্রবল তা আমরা এর যে সব বিষচিকিৎসার ব্যবস্থা দিচ্ছি তা দেখলেই বোঝা যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'সবাই মারোয়ারী হও; আর উপায় নেই।' এ কথা বেরিয়েছে তাঁর মুখ থেকে যাঁর সমস্ত জীবন বৈশ্যত্বের একটা প্রতিবাদ। ধনের গৌরব ও ক্ষমতার মোহ যাঁর কাছে প্রলোভনের জিনিষই নয়। যাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য আর ঋষির তপস্যা বিংশ শতাব্দীর বৃটিশ ভারতবর্ষেও জ্ঞানের তপোবন ও শিষ্যের মণ্ডলী গড়ে তুলেছে। যিনি বিদ্যা ও প্রতিভা দিয়েছেন দেশের সেবায়, নিজেকে লোপ করে। এ যুগে যিনি কারখানা গড়ে' তুলেছেন নিজের পকেট নয় দেশের মুখ চেয়ে। আর 'মারোয়ারী হওয়া' ব্যাপারটি কি তা গেল যুদ্ধের টানে সবার সামনে বে-আব্রু হয়েই দেখা দিয়েছে। মারোয়ারিগিরি হচ্ছে ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের কবন্ধ। ইউরোপের বৈশ্য পৃথিবীই লুট করুক, আর দেশের মাথায়ই চড়ে বসুক, দেশকে সে ঠিকই অন্ন যোগাচ্ছে। আজকার ইউরোপের ধনসৃষ্টির সে যে মূল উৎস তাতে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু মারোয়ারিগিরি ধনসৃষ্টির পথ দিয়েই হাঁটে না। ব্যবসা বাণিজ্যের ঐ উত্তমাঙ্গটি তার নেই। তার কাজ হ'ল বিদেশের তৈরী জিনিষ চড়া দরে দেশের মধ্যে চালান, আর দেশের উৎপন্ন ধন সস্তা দরে বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়া। এবং এই হাত বদলানোর কারবার থেকে

যত বেশি সম্ভব দেশের ধন, যার সৃষ্টিতে তার কড়ে' আঙুলেরও সাহায্য নেই, নিজের হাতে জমা করা। সে জন্য যে তীব্র লোভ ও একাগ্র স্বার্থপরতা দরকার তার নাম ব্যবসা-বুদ্ধি! এ ব্যবসা-বুদ্ধি যে কত বড় নির্লজ্জ আর কতদূর হৃদয়হীন গেল যুদ্ধের সময় পৃথিবীর সব দেশে তা প্রমাণ হয়েছে। দেশের নিতান্ত দুর্দ্দশা ও সঙ্কটের সময়ও দেশ-জোড়া দুরবস্থার ভিত্তির উপর নিজের ধনের ইমারত গড়ে তুলতে কোনও দেশের কোনও বৈশ্য কিছুমাত্র গ্লানি বোধ করে নি। এবং এক রাজদণ্ডের শাসন ছাড়া এ লোকের নিষ্ঠুরতা আর কোনও কিছুরই বাধা মানে নি।

ধনসৃষ্টির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক সওদাগরী ইউরোপেও যথেষ্টই আছে। কিন্তু সেখানে সেটা ধন উৎপাদন ও ধন বিতরণের আনুসঙ্গিক উপদ্রব। আর মারোয়ারিগিরি হ'ল নিছক উপদ্রব। জমিদারীর সঙ্গে মোসাহেব থাকে জানি; কিন্তু জমিদারী নেই, আছে কেবল মোসাহেবের উৎপাত এটা যেমন হাস্যকর তেমনি সঙ্কটজনক। দেশের কৃষক নিরন্ন বলে' স্বল্প মূল্যে তার শ্রমের ফল হাতে জমা করে' দেশের লোক নিরুপায় বলে' চড়া দামে তা বিক্রি করার মধ্যে কোথায় যে দেশের ধনবৃদ্ধি ও উপকার আছে তা অর্থ-নীতিশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়েরাও আবিষ্কার করতে পারবেন না। আর গলা যদি নেহাৎ-ই কাটা যায় তবে ছুরিটা বাঙালীর না হয়ে অ-বাঙালীর এতে এমন কি ক্ষুব্ধ হবার কারণ আছে। সম্ভাবনটা সুদূর, কিন্তু যদি সত্যই বাঙলার গোটা শিক্ষিত-সমাজটা 'মারোয়ারী'ই হয়ে ওঠে তবে নিশ্চয় জানি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রই

সবার আগে বলবেন এর চেয়ে বাঙালীজাতির না খেয়ে মরাই ভাল ছিল।

(৬)

ইউরোপের বৈশ্যত্ব বাঙলার মাটিতে ভাল ফলে নি। অথচ ইউরোপের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ভারতবর্ষের সব জাতির চেয়েই বেশি। বাঙলার বাইরে বাঙালী ত একরকম খৃষ্টান বলেই পরিচিত। কথা এই যে, যে ইউরোপের সঙ্গে বাঙালীর নাড়ীর যোগ সেটা বৈশ্য ইউরোপ নয়, ব্রাহ্মণ ইউরোপ। কল-কব্জা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের আধুনিক ইউরোপ ছাড়া ত আর একটা আধুনিক ইউরোপ আছে, যে ইউরোপ প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী যে আধুনিক ইউরোপ মানুষের মনকে মুক্তি দিয়েছে; জ্ঞানের দৃষ্টি যেমন সূক্ষ্ম তেমনি উদার করেছে। যার কাব্য, সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডার জ্ঞান সত্য সৌন্দর্য্যে ভরে' দিয়েছে। এই ইউরোপের আনন্দালোকই বাঙালীর মন হরণ করেছে, কলের ধোঁয়ায় কালো ইউরোপ নয়। সেই জন্য বাঙলার মাটিতে এখনও জামসেট্‌জী তাতা জন্মে নি, কিন্তু বাঙলা দেশ রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি। এখনও বড় কলওয়ালা কি ভারি সওদাগরের আমরা নাম করতে পারি নে, কিন্তু জগদীশ বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালী জাতির মধ্যেই জন্মেছেন। বাঙালীর নাড়ীতে পশ্চিম থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ও মধ্যযুগের মুসলমান সভ্যতা, দক্ষিণ থেকে দ্রাবিড় ও পূর্ব্ব থেকে চীন সভ্যতার রক্ত এসে মিশেছে। ইউরোপীয় আর্য্য সভ্যতার বিদ্যুৎস্পর্শে যদি এই অপূর্ব্ব প্রয়াগ-

ভূমিতে আমরা একটি অক্ষয় নূতন সভ্যতা গড়ে' তুলে মানবজাতিকে দান করতে পারি তবেই আধুনিক বাঙালী জাতির জন্ম সার্থক। না হলে আমরা পায়ে হেঁটে চলি কি মোটর গাড়ীতে দৌড়াই, তাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এ সার্থকতার জন্য ইউরোপের যে উৎস থেকে জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য উৎসারিত হচ্ছে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে যেখানে তার কারখানার মাল তৈরী হচ্ছে সেখানে দু'চোখ বন্ধ করে' রাখলে চলবে না, বাঙালীর মারোয়ারী হওয়া একেবারেই পোষাবে না।

বাঙালীকে অবশ্য আগে বাঁচতে হবে। কিন্তু সে জন্য চাই নূতন ধনসৃষ্টি করা, দেশের অন্নকে বহু করা। বেদের ঋষি অন্নের সৃষ্টির জন্য নিজের হাতে হাল ধরেছেন। আজ পৃথিবীর সেই দিন এসেছে যখন অন্নসৃষ্টির ভার কেবল বৈশ্য বহন করতে পারে না। তার ব্রহ্মণের সাহায্য চাই। এই সাহায্য বাঙালীর জ্ঞান বিজ্ঞান ভারতবর্ষকে দান করবে। যার চোখ আছে তিনিই এর আরম্ভ দেখতে পেয়েছেন। বৈশ্যত্বের নামে নয়, এই ব্রাহ্মণত্বের নামে ডাক দিলে তবেই নবীন বাঙালীর সারা পাওয়া যাবে। এই ব্রাহ্মণত্বের ছায়ায় বাঙলা দেশে এমন বৈশ্যত্ব গড়ে' উঠুক যার হাতে ধন দেখে কি শাস্ত্রকার কি দেশের লোক কেউ ভীত হবে না। যে বৈশ্য প্রাচীন সংহিতার অনুশাসন মত "ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্", ধর্ম্মানুসারে দ্রব্যবৃদ্ধির জন্য উত্তম যত্ন করবে; "দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ," এবং অতি যত্নে সর্ব্বভূতকে পর্য্যাপ্ত অন্ন দান করবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

পুতলি।

—— ০:০ ——

তার সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটা না মনে থাকলেও ক্ষণটা এখনও মনে আছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা—অস্তগামী সূর্য্যের সোনালি আভা জনবিরল পার্ব্বত্য পথে সেদিন একটা কুহক রচনা ক'রেছিল।

* * * *

তারপর সে যখন আমাদের বাড়ীতে এল—চিরদিনের সুখদুঃখের ভাগী হ'য়ে—সে দিন আমাদের কি আনন্দ আর অতগুলো অপরিচিত মুখের কৌতূহল দৃষ্টির সামনে তার যে কি সঙ্কোচ! সে তখন দেখ্‌তেও ছিল ছোট্টটি আর তার বয়সটাও ছিল তরুণ। তার উপর সে যে গরীবের ঘরে প্রতিপালিত—জন্মটা বড় ঘরে হ'লেও—এ কথাটা বোধ হয় সে তখনও ভুলতে পারে নি।

বাড়ীর সকলে তার পূর্ব্বেকার নামটা ব'দলে নূতন নামকরণ ক'রলে পুতলি বা ডলি—তার পুতুলের মত স্বচ্ছ আর হরিণীর মত সরল বিশ্বস্ত চোখ দুটি দেখে। সে-ও তাই বিনা আপত্তিতে মেনে নিলে।

* * * *

তারপর কতদিন কেটে গেল। ভালবাসার মৃদু উত্তাপে ডলির সঙ্কোচ তুষারের মত যেন গ'লে গিয়ে কেমন ক'রে স্রোতস্বিনীর মুখরতায় পরিণত হ'য়েছিল তা' সে নিজেও টের পায়নি বোধ হয়।

কেমন ধীরে ধীরে সে আমার হৃদয়ে নিজের স্থানটি অধিকার ক'রে নিয়েছিল! বাড়ীর কোথাও আদর ভালবাসার ত্রুটী ছিল না এবং সে-ও তার স্নেহ-বন্ধুত্বের বন্ধনে আত্মীয়-অভ্যাগত সকলকেই বেঁধে ফেলেছিল। তবু সে এটা ভোলেনি যে তার সমস্ত সুখ দুঃখ আমাকেই কেন্দ্র ক'রে ঘিরে র'য়েছে আর আমিও জানতুম যে তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাটুকু আমাতেই এসে বিরাম পেয়েছে। নিদাঘ দিনে তার ক্লান্ত চোখের নির্ভর দৃষ্টি আর শীতের রাতে লেপের ভিতর তার সুনিবিড় স্পর্শ আমাকে ওই কথাটাই বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিত।

* * * *

তারপরে আরও কতদিন কেটে গেল। সমস্ত নেশার মত নূতনত্বের নেশাও আমার মন থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। নিজেকে ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি কর্ত্তব্যের দাবীও মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হ'ল। কোথায় গেল ছুটীর সেই দীর্ঘ দিনগুলি আর কোথায় পড়ে রইল আমার অবসরের জীবন্ত সাথী আর খেলার ঘুমন্ত স্মৃতি!

কিন্তু ডলি সেটা ঠিক এভাবে স্বীকার ক'রে নিতে পারলে না। এবং এইখানেই আরম্ভ হ'ল সেই নীরব ট্র্যাজেডি যার কথাগুলি কোন নাট্যকারের লেখনী মুখে কোন দিন ফুটে ওঠে নি কিন্তু জীবন রঙ্গমঞ্চে যার অভিনয় প্রতিদিনই চ'লে আসছে।

সকালবেলার কাজের মধ্যে আমার আপিস-কেদারার ফাঁকটুকু সে অধিকার ক'রে ব'সত। আমি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লতুম—ডলি এখন নয়; কাজ আছে!

সে চ'লে যেত। তার অভিমান দৃষ্টিটুকু আমার কাজের মধ্যে যে কোথায় মিলিয়ে যেত তার কিছুই খবর থাকত না।

ক্লান্ত সন্ধ্যার বিরল অবসরে আরাম-কেদারার মধ্যে আমার বুকের কাছে তার মুখের সঙ্কোচ স্পর্শ অনুভব ক'রতুম। তার সেই রেশমের মত চুলগুলির ভিতর আঙ্গুল রেখে ব'লতুম—ডলি, এখন যাও; বড়ই ক্লান্ত।

রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখতুম—বিছানার আরাম ছেড়ে দিয়ে সে যে কখন নীচের গাল্‌চেতে শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে কিছুই টের পাই নি।

তাকে কর্ম্ম আর অবসর কিছুরই সাথী ক'রে নিই নি। কয়েকটা অলস দিনে তাকে একটু আমোদ যোগাতে দিয়েছিলুম মাত্র।

* * * *

তাই সে যে আমাকে একেবারে ছেড়ে চ'লে যাবে—এতে আশ্চর্য্য হবারই বা কি আছে? তবে এ-কথাটা ঠিক সে সময় বুঝে উঠতে পারি নি।

সেদিনের কথা সংক্ষেপেই ব'লব। সেদিন বিলাতী স্যাকরার দোকান থেকে তারই জন্মে আনা নূতন কণ্ঠহারটা একেবারেই কাছে রাখতে পারলুম না, দূরে ফেলে দিলুম। সেটা যে আমার কতকটা অনুতাপ এবং অনেকটা অনুগ্রহ দিয়ে গড়া—তাতে স্নেহ ভালবাসার নাম গন্ধও ছিল না।

সেদিন বিনিদ্র রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডলিকে যেন আবার নূতন ক'রে পেলুম। মনে মনে ব'ললুম—বন্ধু, তুমি যে নূতন আশ্রয়ে গেছ, সেখানে তোমার ভালবাসা যেন কখন ক্ষুণ্ণ না হয়।

নীরব অবহেলার অপমান বিষে তোমায় যেন কখন জর্জ্জরিত হ'তে না হয়। তুমি ভালই ক'রেছ। তুমি সুখী হও।

* * * *

তার হৃদয়ের সমস্ত অভিমানটুকু নিয়ে ডলি চ'লে গেছে;—আমার হৃদয়ে একটা অনুতাপের ক্ষত রেখে গেছে মাত্র।

ডলিও চ'লে গেছে—আমিও সেই থেকে কুকুর পোষা ছেড়ে দিয়েছি।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

"দ্বীপান্তরের বাঁশী"।

—:•:—

সনাতনপন্থী ধর্ম্মাত্মাদের ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান সূত্র হচ্ছে —কর্ম্ম মানুষের বন্ধন। কিন্তু "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র কবিতাসমষ্টি ঐ সনাতন সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অতি সপ্রতিভভাবে সাক্ষী দিচ্ছে। কেননা বারীন্দ্রের বার বৎসরের পূর্ব্বের কর্ম্মজীবনের একটুকু ছায়া-পাত এই কবিতা পুস্তকটির মধ্যে নেই। যেদিন মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনস্তম্ভে "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র বিজ্ঞাপন দেখি সেদিন মনে করেছিলুম যে ঐ বাঁশীতে যা শুনব সে হচ্ছে ভৈরব রাগ আর দীপক রাগিনী। কিন্তু যেদিন বইখানি হাতে এলো সোদন যখন তার মাঝামাঝি এক জায়গায় খুলতেই চোখে পড়ল—

"একটী কিশোরী অঙ্গে তোরে গো ধরিব,
স্বরগ মরত মোর এই ঠাঁই নিব।"

তখন আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। যে-মানুষটি একদিন আগুন নিয়ে খেলা করে গেলেন সেই মানুষটিরই হাত দিয়ে এমন সুর বেরুল—কোন্ রহস্যে এমন রহস্য সম্ভব হল? তাই সেদিন এই কথাটা স্বীকার করতে বাধ্য হলুম যে, মানুষের কর্ম্মকে যখনই

* দ্বীপান্তরের বাঁশী—শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত গীতি কবিতা; নারায়ণ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য, ১৲ টাকা মাত্র।

বড় করে দেখি তখনই তার আত্মাকে ছোট করে ফেলি! আত্মা যখন ক্ষুদ্র হ'য়ে আসে, অশক্ত হ'য়ে আসে তখন বাইরের যা-কিছু সবই তার বন্ধন হ'য়ে ওঠে; কিন্তু তাই বলেই যা সনাতন সত্য—সৃষ্টির গোড়াকার সত্য যে-কথাটা, সেটা হচ্ছে এই যে, আত্মা আপনারই আনন্দে আপনারই শক্তিতে আপনারই স্বাধীন নির্ব্বাচনে মানুষের বাইরের জীবন প্রকাশ করে' করে' চলেছে! মাকড়শা যেমন তার পেটের ভিতর থেকে সূতো বের করে জাল বোনে অথচ সে জালে সে নিজে কখনও আবদ্ধ হয় না, তেমনি করে' আত্মা আপনার অন্তরের আনন্দ উৎস থেকে বাইরের হাজার কর্ম্মের হাজার ভোগের জাল বোনে। তবে সেই কর্ম্ম সেই ভোগই যে মানুষের মনকে বাঁধে তার কারণ সাধারণত মানুষের মনে ঐ সত্যটি পৌঁছয় না—পৌঁছিলেও তা সেখানে জীবন্ত হ'য়ে জ্বলন্ত হ'য়ে অবিরাম জেগে থাকে না। ঐ সত্যটি সদাসর্ব্বদা মনে প্রতিষ্ঠা করে' রাখতে চাইলে সাধনা দরকার। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার সাধক। তাই তাঁর কর্ম্মজীবনের রাগ দিয়ে তাঁর কাব্যজীবনের সুর নিয়ন্ত্রিত হয় নি। বারীন্দ্রকুমার সাধক —প্রমাণ তাঁর "দ্বীপান্তরের বাঁশী"।

মানুষ মাত্রেরই জীবন হচ্ছে সাধনা। এ-সাধনার অর্থ হচ্ছে মানুষের জীবনে যে একটা চরম রহস্য আছে সেই চরম রহস্যের সন্ধান নেওয়া—মানুষের মধ্যে যে-একটা পরম মিলনের আকাঙ্ক্ষা আছে, যে পরম মিলনটি যেমন সবার চাইতে সত্য তেমনি সবার চাইতে উপেক্ষিত—সেই পরম মিলনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তবে আমরা বিশেষ ভাবে সাধক বলি তাঁদেরই যাঁরা এ-সাধনা করেছেন সজ্ঞানে। বারীন্দ্রকুমারকে সাধক বলছি, কেননা তাঁর ত এ সাধনা

সজ্ঞানে,—সজ্ঞানে নইলে আমরা "দ্বীপান্তরের বাঁশী"তে এ কথা শুনতে পেতেম না—

"সারাটা জীবন ছিল অভিসার
কেবা তা' জানিত সই ?"

এ-অভিসার কিসের অভিসার ?—সেই চরম রহস্যের পানে পরম মিলনের অভিসার। সমস্ত জীবনকে যখন এই অভিসার হিসেবে দেখতে পারি, এই অভিসার বলে' মর্ম্মের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করতে পারি তখন ত আর দুঃখ নেই। তখন যে দুঃখের দুঃখমূর্ত্তি মোহন হ'য়ে দেখা দিয়েছে, চোখের অশ্রুবিন্দু মুক্তা হ'য়ে ফুটে উঠেছে। গৃহে গৃহে দীপ নিভেছে, ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ, চারিদিক স্তব্ধ নীরব—আঁধার জমাট বেঁধে এসেছে—চারিদিক নিশুতি—বিশ্বের নরনারী সুপ্তির কোলে অচেতন, এমন সময় শ্রীরাধা ধীরে ধীরে দ্বার খুলে যমুনাপুলিনের পথে বেরিয়েছেন—মাথার উপরে দেয়া গুরু গুরু ডাকছে—বুকের ভিতরে হৃদয় দুরু দুরু কাঁপছে—কালো কুণ্ডলীকৃত পুঞ্জ মেঘের বুক ফেটে ফেটে চম্‌কে চম্‌কে বিজলী ঝলকাচ্ছে—দারুণ বৃষ্টি শেলের মতো হান্‌ছে—উন্মাদ বাতাস বুকের বসন উড়িয়ে নিয়ে যায়—পথের কাঁটা পদে পদে পায়ে রক্তচিহ্ন এঁকে দেয় ; কিন্তু এ যে অভিসার—তাই এখনকার সমস্ত দুঃখ সুখ হ'য়ে উঠেছে—সমস্ত দুঃখ মিলনকে যে আরও নিবিড় করে' তুলবে—এ ত "দুখ নহে সে যে পথ মিলনকুঞ্জের তারি", তাই এখানে শুনি—

"বল কাঁদায়ে কেমনে দিবে গো জ্বালা !
দুঃখ তব বড় প্রণয়-ঢালা।"

তাই শুনি—

"তারে না পেয়ে কাঁদায় এমন সুখ,
কত মিঠা নাহি জানার দুখ!"

এই যে জীবাত্মার "জাগরণ," এই জাগরণ যখন মানুষের অন্তরে অন্তরে সত্য হ'য়ে ওঠে তখন যদিও—

"বুঝিনা সে কথা এ কিসের মেলা"

তবুও এই কথাটাই সমস্ত বেদনাকে ছাপিয়ে ওঠে—

"কে দুটি চরণে রহি,
কত ছলনায় কুঞ্জ দুয়ারে
নিতেছে কিছু না কহি,।"

তখন—

"সুপথে কুপথে কলঙ্ক সুযশে
কত যে মালা বদল,"

তখন সুপথ কুপথ কলঙ্ক সুযশ কিছুই মনে থাকে না,তখন কত যে "মালা বদল" এই কথাটাই এমনি মুখ্য হয়ে ওঠে যে, ওরই স্বপ্নে দুঃখ সুখের চেহারা একেবারে বদ্‌লে যায়। সুখ দুঃখ তার পার্থক্য হারায়, দুয়ে একেবারে একাকার হ'য়ে যায়। কি এ রহস্য মানব আত্মার? সাংখ্য এখানে বোকা, বেদান্ত এখানে নির্ব্বাক। কিন্তু সাংখ্য বেদান্তের চাইতেও মানব-হৃদয়ের এই রহস্য বড় বলে' এই জগত-সংসার চিরকাল চল্‌ছে। দুঃখকে মানুষ যদি কেবল দুঃখ বলেই জানত তবে কি নিদারুণই হ'য়ে উঠত এই সৃষ্টি। তবে সৃষ্টি হয় মুছে যেত, না হয় স্থাবর হ'য়ে উঠত।

(২)

বারীন্দ্রের "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র মধ্যে মস্ত একটা আরাম আছে। এই বাঙলা দেশের বর্ত্তমান কাব্য-গগনটা রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের অনুকরণের অনুকরণ তস্য অনুকরণে ও তাঁর ভাবের অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদে এমনি ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছিল যে, "দ্বীপান্তরের বাঁশী" যেন তার মধ্যে একটা পরম আরামের নিশ্বাস ফেল্‌লা। যেন এতদিন পরে দাম-ঢাকা সরোবরটার বুকে দাম ফুটিয়ে একটুকু জল চিকমিকিয়ে জেগে উঠল, সে-জল দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল— যেন কতদিনকার গুমোট-বাঁধা আকাশে কার নিশ্বাসে মেঘ কেটে গিয়ে একটুকু জায়গায় নীল আকাশ বেরিয়ে এল। সে আকাশের যেমনি নতুনত্ব তেমনি মনোহারিত্ব। অনুকরণ জিনিষটার মধ্যে আছে আপন আত্মাকে অস্বীকার করা —আর অনুবাদ জিনিষটা হচ্ছে আপন আত্মার সন্ধান না-পাওয়ার নিশানা। যে নিজের আত্মার সন্ধান পায় নি তার দ্বারা কোন-কিছু বড় হবার আশা নেই। পরের প্রভাব যখন নিজের স্বভাবকেই উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে তখনই তা মঙ্গলময়, নইলে তা মারাত্মক। পরের আত্মার স্পর্শে নিজের আত্মাই জেগে উঠবে, তবেই সেখানে অমৃতের অবিনশ্বরতার আবির্ভাবের সম্ভাবনা কিন্তু পরের আত্মা যখন জগদ্দল পাথরের মত চেপে চারিদিকের সমস্ত ফাঁক বুজিয়ে দেয় তখন সেই চাপের নীচে থেকে যে সুর যে রাগ বেরয় তার গায়ে গায়ে থাকে একটা ক্লান্তির আবেশ। এই ক্লান্তির আবেশে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না— হ'য়ে ওঠে ভারাক্রান্ত। এই কথাটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে

খাটে। কেননা সাহিত্য মানেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। আত্মার অনন্ত রূপ অনন্ত ভাব অনন্ত ভঙ্গী সাহিত্যে যেমন করে' ফোটে তেমন মানুষের আর কোনো ক্ষেত্রেই নয়। কেননা আর সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যেক মানুষটিকে আর প্রত্যেকের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে চলতে হয় কিন্তু কেবল এই সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তার পরিপূর্ণ মুক্তি, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। এই পরিপূর্ণ মুক্তি যেখানে সফল হ'য়ে উঠেছে সেইখানেই সাহিত্যের বড় সার্থকতার সম্ভাবনা।

এই সব কথাই মনে করে "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র যে কথাটা প্রথমেই মনে এসে লাগল সে হ'চ্ছে ঐ একটা পরম আরাম, মুক্তির আরাম। রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মার যে একটা মোহজাল সমস্ত দেশের উপরে বিছিয়ে গিয়েছে সেই মোহজাল ছিন্ন করাই মুক্তি। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবনরক্ষার জন্যে এই মোহজাল ছিন্ন করা নিতান্ত দরকার। রবীন্দ্রনাথকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার প্রকাশ করলে কি লাভ হবে, কোন্ সম্পদ বাড়বে? তাও আবার তাঁদের দ্বারা যাঁরা রবীন্দ্রনাথের চাইতে ঢের কম শক্তিমান। রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মার চরম পরিণতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই লাভ করেছে। রবীন্দ্র নাথকে ডিঙিয়ে যাবার উপায় নেই। নতুন সৃষ্টির জন্তে আমাদের নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে। নইলে কাব্যের স্রোতস্বিনী দু'দিনে পানাপুকুর হ'য়ে উঠতে বাধ্য। সাহিত্যের ধর্ম্মই হচ্ছে নিত্য নব নব সুন্দরের দর্শন পাওয়া। সাহিত্যের ঐ ধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া মানেই তার মৃত্যু। এ কথা যেন না ভুলি। সে যাই হোক, "দ্বীপান্তরের বাঁশী" যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে তার কারণ এ বাঁশীর সুর ফুটেছে বারীন্দ্রের অন্তর থেকে—তাঁর বুদ্ধি

থেকে নয়। অনুকরণ জিনিষটার মধ্যেই একটা বুদ্ধির খেলা আছে। "দ্বীপান্তরের বাঁশী" বারীন্দ্রের অন্তরের বাঁশী, তাই এ বাঁশীর সুরে এমন সহজ হ'য়ে এই কথাটা ফুটে উঠেছে —

"এ বীণা বাজায় না কেউ
আপনি বাজে ;
ওরে এ সোণার ঊষা সাজায় না কেউ
আপনি সাজে।"

এ "আপনি" কে ? এ "আপনি" কি ?—মানুষের মন নয় বুদ্ধি নয় প্রাণ নয়—এ হ'চ্ছে মানুষের অন্তরের পরম ঠাকুরটি। মানুষের কর্ম্ম বল ধর্ম্ম বল সাহিত্য বল দর্শন বল বিজ্ঞান বল যখন এই পরম ঠাকুরটির মন্দির থেকে উৎসৃষ্ট হয়েছে তখনই মানুষ তার পরম সত্যটিকেও লাভ করেছে। তখন মানুষের জীবনে দুঃখও অমৃতময় হয়ে উঠেছে, কারণ তখন যে তার এই কথাটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—

"সে কানুর হাতে দুখে সাধা বাঁশী
আমি রে হয়েছি ভাই।"

(৩)

বারীন্দ্রকুমারের "দ্বীপান্তরের বাঁশী" যে কেবল দ্বীপান্তরেরই বাঁশী তা নয়, তা যমুনাপুলিনেরও বাঁশী। মানুষের মধ্যেকার যে পরম মিলনটির কথা আগে বলেছি সে মিলনকে তিনি প্রকাশ করেছেন রাধাকৃষ্ণের বেনামিতে। বারীন্দ্রের "দ্বীপান্তরের বাঁশী" আকারে ও প্রকারে বৈষ্ণব কবিদের পদানুসারী, বিশেষ করে' চণ্ডীদাসের।

চণ্ডীদাস বলেছেন—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

বারীন্দ্রকুমারও তেমনি বলছেন—

"হৃদি বৃন্দাবনে আমারি কারণে
সেই— সর্ব্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার।"

কিন্তু তা হ'লেও বারীন্দ্রকুমারের কাব্য চণ্ডীদাসের হুবহু ফটোগ্রাফ নয়, কেননা আকারে প্রকারে এক হলেও আচারে বিচারে "দ্বীপান্তরের বাঁশী" ও চণ্ডীদাসের গানে একটা প্রভেদ আছে, সেটা "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র কবির নিজস্ব দান—নিজস্ব সুর। এই নিজস্ব সুর আছে বলে "দ্বীপান্তরের বাঁশী" চণ্ডীদাসের পদাবলীর তলে তলিয়ে যায় নি, তা আপনার স্বাতন্ত্র্যে আপনার প্রাণের মূর্চ্ছনায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র মূলধন ঋণের কিন্তু বারীন্দ্রের হাতে সে মূল-ধন বেড়ে গিয়ে নতুন লাভের ঘরে অঙ্কপাত করেছে।

"দ্বীপান্তরের বাঁশী"র এই নতুন লাভের কথা বুঝতে হ'লে চণ্ডীদাসের রাধা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা দরকার। সুতরাং সংক্ষেপে তা বলছি।

চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। রাধা কৃষ্ণের প্রেম, রাধা কৃষ্ণের মিলন—সে হচ্ছে মানুষের সেই পরম মিলনের কথা যা পূর্ব্বে বলে এসেছি। এ মিলন হচ্ছে জীবাত্মার মিলন পরমাত্মার

সঙ্গে, জীবের মিলন ভগবানের সঙ্গে। কৃষ্ণকে পেয়ে রাধা আপনাকেই পূর্ণ করে' পাচ্ছে—ভগবানের সঙ্গে মিলনে জীব আপনারই পরিপূর্ণ সত্যটির স্পর্শ পাচ্ছে।

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা তাঁর কৃষ্ণপ্রেমে এ জগতকে হারিয়ে ফেলেছিল। এ জগত তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের অন্তরায়। ননদিনী, গুরুজন এমন কি "পরশী দুর্জ্জন" পর্য্যন্ত তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের বাদ। শ্যাম রাখি কি কূল রাখি। শ্যাম রাখতে গেলে কূল থাকে না—আর কূল রাখলে শ্যাম থাকে না। অর্থাৎ—সেই হয় সংসার নয় ভগবান, সেই অধিভূত ও আধ্যাত্মের বিরোধভাব। তাই কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার সংসারবৈরাগ্য, তাই তিনি বলছেন—

"মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে"

একা শ্যামে তার অন্তর বাহির একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছে, তখন এমনি অবস্থা যে—

"কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ।"

ধীরে ধীরে সৃষ্টির বহুত্ব তাঁর দৃষ্টি থেকে লোপ পেয়ে গেল, তখন—

"পুলকে অতুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি।"

এই "সব শ্যামময় দেবিখ" পিছন থেকে যে সুর এসে আমাদের মনে লাগে সে হচ্ছে এই যে, সৃষ্টির সহস্র নামরূপ তাদের স্বাতন্ত্র্য

হারিয়ে একেবারে একাকার হ'য়ে যাওয়ার সুর। পরম প্রেমে শ্রীরাধার বাইরের জগত অর্থহীন হ'য়ে উঠেছে। এখানে মানুষের সেই পরম মিলনটি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আর যা-কিছু অস্পষ্ট থেকে অস্পাস্টতর হ'য়ে উঠেছে। এ পথের শেষ পরিণতি সমাধি বা মোক্ষ বা নির্ব্বাণে বা ঐ রকমের আর যে নামই দেওয়া যাক।

অর্থাৎ—চণ্ডীদাসের সাধনার ছিল সে-কালের মায়াবাদ বা নির্ব্বাণ-বাদের একটা ছায়া।

কিন্তু বারীন্দ্রকুমারের সাধনার পিছনে আছে একালের লীলাবাদের ছাপ। এইখানেই প্রভেদ। এবং এ প্রভেদ মস্ত প্রভেদ।

তাই বারীন্দ্রকুমার বলছেন—

"এ সুন্দর ভুবনে আমি পাগল গো দিনযামী
শুনি চাঁদে ফুলমুখে
নিতি ওই ওই;"

এ সুর "নেতি নেতি"-র নয়—এ সুর হচ্ছে "ইতি ইতি"-র—ইহা "ঈশাবাস্যমিদম্ সর্ব্বম্।"

তাই বারীন্দ্রকুমারের রাধাভাব অনুভব করছেন—

"ওগো মায়া বড় মনোহরা"

আর এইটেই হচ্ছে "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র মধ্যেকার সুরটি—নতুন সুরটি, যা চণ্ডীদাসে নেই। রাধাকৃষ্ণের গীতে এইটে হচ্ছে বারীন্দ্র-কুমারের নিজস্ব দান।

এই যে মায়া—এই যে সৃষ্টি, প্রাকৃতজন ও প্রাকৃত মনের কাছে এর একটা মনোহারিত্ব আছে। কিন্তু সে খণ্ডহিসেবে। অর্থাৎ—তার কাছে এ সৃষ্টি বা মায়ার এক অংশই মনোহর—এর অন্য অংশ দুঃখের বেদনার মৃত্যুর। কিন্তু এ সৃষ্টির পরম ও অখণ্ড মনোহারিত্বটি সহজ হ'য়ে উঠেছে একমাত্র তাঁরই কাছে, যাঁর কাছে সেই পরম মিলনটি সত্য হয়ে উঠেছে—যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সৎ চিৎ আনন্দের সঙ্গে মানুষের অন্তরের বীণার সৎ চিৎ আনন্দের সুরটির সঙ্গত চলছে—যেখানে মানুষের জীবনের নিবৃত্তি প্রবৃত্তির সুরটি ভগবানের নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সুরের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে। তখনই জীবের মুক্তি, কেননা তখন সে তার ক্ষুদ্র আমি, অহঙ্কার থেকে খালাস—যে ক্ষুদ্র আমি যে ক্ষুদ্র অহঙ্কার তাকে আসক্ত করে' তোলে কর্ম্মে ভোগে বা নির্ব্বাণে। এই ক্ষুদ্র 'আমি'র ত্যাগে জীবের আর কোনো বন্ধন নেই, কর্ম্মেরও নেই ভোগেরও নেই নির্ব্বাণেরও নেই। সে তখন সেই বিশ্বপ্রকৃতিরই তালে তালে উঠছে পড়ছে হাঁসছে নাচছে এঁকছে বেঁকছে—তখন তার জীবনও ভয়াবহ নয়, মৃত্যুও ভয়াবহ নয়।

এই যে মায়া, এই যে সতত পরিবর্ত্তনশীল জগৎ, ভগবানের এই যে লীলাবিলাস তা বারীন্দ্রের আত্মায় সত্য হ'য়ে উঠেছে, তাই তাঁর মুখে এমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে এই কথা—

"এ জগতলীলা— সে পিয়ার ডাক
মুরতী ধরেছে ওই,"

এখানে রহস্যের আর অন্ত নেই—আর সবার চাইতে বড় রহস্য—

"আপন মাধুরী মোরে
করেছে পাগল !"

এই মাধুরীর ত আর অন্ত নেই। এ যে "নিত্য নূতন নূতন"। কত রূপ কত নাম—এই অনন্ত রূপ অনন্ত নাম অনন্ত বিষয়ের মাঝ দিয়ে তাদের স্পর্শ করে করে যে চল্‌ছে সে কেমন অবস্থা?—সে—

"জাগ্রত সমাধি মোর
পিয়াসু যৌবন ;—"

তারপর এই যে চলছে, এই চলার মধ্যেই আবার একটা কত বড় মিলন রয়েছে, এই মিলন যখন ধরা পড়ে, তখন—

"ওগো— চলিতে অথির হয় যে অঙ্গ
মোরি পদে শুনি সে নূপুর-রঙ্গ
এ— কর চরণ প্রতি তনু যেন
তারি তারি মনে হয়।"

এই-ই মানুষের বড় সাধনা, কেননা এখানে মানুষের আত্মাই কেবল সাযুজ্য পায় নি—তার দেহ পর্য্যন্ত সারূপ্য লাভ করেছে। এখানে মানুষের নামরূপ তার পরম মিলনের পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় নি উপরন্তু তা এই মিলনের গ্রন্থি হয়ে উঠেছে। আর এই হচ্ছে মানুষের বড় সত্যটি, পরিপূর্ণ সত্যটি।

তাই "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র কবিকে আজ আমরা বিশেষ করে' অভিনন্দিত করছি। পরমার্থ সঙ্গীতে আধ্যাত্মিক জীবনে এই সুরই

আজ আমরা চাই। "স্বরগ মরত মোর এক ঠাঁই নিব।" স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে আজ আমরা একই মিলনবেদীর উপরে দাঁড় করাতে চাই, সেটা হচ্ছে মানুষের জীবনবেদী। "ইহ" ও "অমূত্র"-র মাঝে বিরোধ আজ আমরাভাঙ্তে চাই। কেননা আমরা দেখে শিখেছি যে, ওর শেষেরটি ছেড়ে কেবল প্রথমটি নিয়ে থাকলে তা পরিণামে বড় বিশ্রী হয়ে ওঠে আর আমরা ঠেকে শিখেছি যে ওর প্রথমটি ছেড়ে কেবল শেষেরটি নিয়ে থাকলে পরিণামে তাও বড় বিশেষ সুন্দর হ'য়ে ওঠে না। আশা করি "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র সুর তরুণ বাঙলার অন্তরে গিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে এক নতুন মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে।

(৪)

উপসংহারে একটুকু ত্রুটীর কথা না বললে কর্ত্তব্যের হানি হবে। "দ্বীপান্তরের বাঁশী"তে এমন অনেক মিল আছে যা সুষ্ঠু নয়। "ফিরি=উঘারি" "বিভোর=দুরন্তের" "বরষায়=সুরভিময়" এমন কি "যায়= দেয়" ইত্যাদি এ-সমস্ত মিলের দৈন্যহিসেবেই স্বীকার্য্য। বৈষ্ণব পদাবলীতে অবশ্য ওই রকম মিল যেখানে সেখানে মেলে। কিন্তু বাঙলা কাব্য মিলের ঐ দৈন্যকে আজ কাটিয়ে উঠেছে। বিশেষত বৈষ্ণব কবিদের গানের সুরে হয় ত যে মিলগুলি কান এড়িয়ে যেত, "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র কবিতার ছন্দে সে রকম মিল এসে হাঁটু-গেড়ে বসে পড়ে ও মনে একটা খোঁচা মেরে যায়। তাতে যে রস-ভঙ্গ হয় তা বলাই বাহুল্য, আশা করি "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র কবি ভবিষ্যতে এ-দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিচার

—:•:—

(Oscar Wilde The House of Judgment অবলম্বনে)

সেদিন স্বর্গের বিচারগৃহে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। মানুষ এল উলঙ্গ হয়ে ধর্ম্মরাজের কাছে।

যমরাজ খাতা খুলে মানুষের কার্য্যকলাপ মিলিয়ে দেখছিলেন।

ধর্ম্মরাজ মানুষকে বল্লেন—"তুমি অত্যন্ত পাপ করেছ। যাদের দয়া করা উচিত, তুমি তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ। ভিখারীকে ভিক্ষা দাও নি, সে কাঁদতে কাঁদতে তোমার দ্বার থেকে ফিরে ফিরে গেছে। আমার অনুশাসন তুমি বরাবর অমান্য করে এসেছ। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও নি, প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহ করেছ। আমার ভক্তদের দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছ। বৃথা রক্তপাতে বসুন্ধরা রঞ্জিত করেছ। আমার রাজ্যে তুমি মূর্ত্তিমান অনিয়ম।"

মানুষ বল্লে—"হাঁ, তাই বটে।"

ধর্ম্মরাজ আবার বই খুলে দেখলেন। পরে মানুষকে বল্লেন—"তুমি পাপী, তুমি যা চেয়েছ আমি তাই দিয়েছি। যে মঙ্গল আমিরহস্যে ঢেকে রেখেছি তুমি তা জানবার চেষ্টা করো নি। তোমার সহবাস খারাপ, বাসস্থান কুৎসিৎ চিত্রে শোভিত। নটীর নূপুরনিক্কণ শুনে তুমি তোমার বিলাসশয্যা ছেড়েছ। যেখানে

পাপ সেই স্থানেই তোমার সোৎসাহ গতিবিধি। যা অখাদ্য তাতেই তোমার তৃপ্তি, যাতে লজ্জা নিবারিত হয় না, তাই ছিল তোমার পরিধেয়। তুমি চিরকাল মোহান্ধ হয়ে কামের পুজো করেছ। বিলাসে তোমার পরম আনন্দ-উৎসাহ। দিনরাত নির্লজ্জের মত ব্যবহার করেছ।"

মানুষ বল্লে—"হঁা, তা করেছি বটে।"

ধর্ম্মরাজ তৃতীয়বার তাঁর বই খুলে দেখলেন।

তিনি মানুষকে বল্লেন—"তোমার সারাটা জীবন একটা বিরাট পাপের অভিনয়। যে তোমার উপকারী তুমি তার অপকার করেছ। আর যে তোমাকে অনুকম্পা দেখিয়েছে, তুমি তাকে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ। যে তোমায় খাইয়েছে, তুমি তাকেই দংশন করেছ, যার স্তনধারায় তোমার জীবন বেঁচেছে তুমি সেই মাকে অবহেলা করেছ। যে তোমায় প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছে তুমি তার বিশ্বাস হনন করেছ। যে শত্রুর কাছ থেকেও তুমি ক্ষমা পেয়েছ, তাকে বিপদে ফেলতে একটু ইতস্তত করো নি। যে বন্ধু প্রাণাপেক্ষা ভালবেসেছে তুমি তার প্রতি কপট ব্যবহার করেছ। যে তোমায় প্রেম দিয়েছে তুমি তাকে কামভাবে আলিঙ্গন করেছ।"

মানুষ বল্লে—"হঁা, তা করেছি বটে।"

এবার ধর্ম্মরাজ বই বন্ধ করলেন। পরে একটু ভেবে বল্লেন—তোমার শাস্তি অনন্তকাল নরকবাস—নিশ্চয়ই তোমাকে এ শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

মানুষ চীৎকার করে বলে উঠল—"না, না, তা আমি পারবনা!"

—না, কেন?

—কারণ যতকাল বেঁচেছিলুম, আমি ত নরকেই বাস করেছি।"

ধর্ম্মরাজ খানিকটা নীরব থেকে বল্লেন, "আচ্ছা, নরকে না যেতে চাও, তোমায় স্বর্গেই পাঠাচ্ছি, স্বর্গেই তোমাকে যেতে হবে।"

এবারও মানুষ চীৎকার করে বলে উঠল—না, না, তা তুমি পার না কিছুতেই।

—"কেন, কেন স্বর্গে যাবে না তুমি?"

—না, সে আমি পারি নে, কারণ স্বর্গ যে কি তা আমি কোনো দিকে কখনো কল্পনাও করতে পারি নি।"

* * *

বিচারগৃহের নিস্তব্ধতা অক্ষুণ্ণই রইল।

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চিঠি

—:*:—

পদচারণের কবি

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়

সমীপে—

রসের যে সিধা পেনু ঢোলে চাঁটিপড়ার শব্দে,—
পাঠাই রসিদ তার, ঢাকে কাঠি থামিবার পরে ;
জানেন্ তো কুড়ে গোরু চিরদিন ভিন্ন গোঠে চরে,
কুড়েমি কায়েমি যার, ত্রুটি তার ঘটে পদে পদে।

মরম বোঝেনা কেউ, মনে ভাবে মেতে আছে মদে,
কেউ কয় 'চালিয়ান্'! 'কি অসভ্য'! কেউ মনে করে ;
আমি শুধু তুলি হাই,......চিঠির কাগজ নাই ঘরে......
দোয়াতে মসীর পঙ্ক,...এক ফোঁটা জল নাই গঁদে !

লেফাফা দুরস্ত অতি, পোষ্টাফিসে বিকিকিনি তার,
লেফাফা-দুরস্ত হওয়া তাই আর হল না আমার !

হুহু ক'রে বে-পরোয়া চ'লে যেতে চায় দিনগুলো,
হা হা করে পদে পদে ওদের কি রাখা যায় ধ'রে ?
বিশেষ গরম দেশে,...হাঁপ ধরে নাকে ঢোকে ধুলো,
ঢাকে ঢোলে চিঠি তাই লিখি আমি দু'বার বছরে।

গোড়াতে জানিয়ে হাল, ক্ষমা চাই বিনয় বচনে,
ওগো ছন্দ-চঞ্চরীক্! পদচারণের কবিবর!
পায়চারি করে চিত্ত তব গুঞ্জ-গীতি কুঞ্জবনে,
তারিফে ফুটিয়ে তারা, পদে পদে, নিত্য নিরন্তর!

ইতি—

ভবদীয়

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আজ ঈদ

——০০——

আজ ঈদ। ঈদ অর্থ আনন্দ। আজ আনন্দের দিনই বটে, কেননা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের ভীষণ গরম আর সুদীর্ঘদিনব্যাপী কঠোর সংযমের পর আজ রসনা এবং বাসনা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে। কিন্তু আজ এমন আনন্দের দিনেও প্রাণ থেকে অনাবিল আনন্দের ধারা বয়ে সারা জগৎকে হাস্যময় করে তুলছে না। আজও এই আনন্দের পিছনে অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে গভীর দুঃখের ক্রন্দন গুম্‌রে গুম্‌রে ফেটে বের হতে চাচ্ছে। আজ এমন দিনেও প্রত্যেক হাসির সঙ্গে শেলির সেই ছত্রটা মনে পড়ছে—" our sincerest laughter with some pain is fraught "

আজ আনন্দ করতে গিয়ে প্রথমে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছি প্রকৃতির লীলা দেখে। আজ এত আনন্দেও শান্তি কোথায়?—সেই যে বিশ্বের প্রথম দিন—যেদিন অনন্ত অন্ধকার ভেদ করে সৃষ্টির বিমল আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল,—সেদিন যেমন আজও তেমনি প্রতি পলে অনুপলে, প্রতি অণু পরমাণুতে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে। আর সে দ্বন্দ্বের ফল হচ্ছে এক,—নিশ্চিত মৃত্যু। আজ এমন শান্তির দিনেও ত এই হত্যাকাণ্ড অপ্রতিহত গতিতে চলছে— বিরাম নাই, হ্রাস নাই। তবে আজকার দিনে কিসের আনন্দ?—চারিদিকের এই যাতনার দৃশ্য দেখে আজও ত

মন গুরুভারে অবনত হয়ে পড়ছে।—তারপর মনে হচ্ছে এই আনন্দের দিনে, এই আনন্দের উপকরণস্বরূপ কত প্রাণীর প্রাণ যাবে—তারা আত্মবলিদান দিয়ে আমাদের রসনার তৃপ্তিসাধন করবে! তবুও যদি এই বলিদান স্বেচ্ছায় হতো!—তারপর মনে হচ্ছে আজ এই আনন্দের দিনে আমার প্রতিবেশীর আনন্দ কই? এই ত মাত্র দশ গজ ব্যবধান, তার বাসায় আর আমার বাসায়। কিন্তু এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও আজকার সূর্য্য তার কাছে কোন সুখবর বয়ে নিয়ে আসে নি। তার কাছে গত কালও যেমন, আজও তেমন—কর্ম্মক্লান্ত, ধূলিধূসরিত দীর্ঘ দিবস।—তারপর আরও কাছে যখন তাকিয়ে দেখছি, তখন দেখছি অন্য সব দিনের সূর্য্যকিরণের সঙ্গে যেমন কর্ম্মের ধারা ব'য়ে আসে—আজও তেমনি আমার ঘরে সেই পুরাতন কর্ম্মের ধারা বয়ে আসছে। সকাল থেকে সেই আমার স্নানের জল, সেই ছেলের দুধ, সেই ছেলের মার পান—এই সমস্ত যোগাড় করার জন্য আর আর দিন যারা খেটে মরতো, আজও তারা তেমনি ভাবেই খাটছে। সেই রোজ রোজের ঘানি আজও তেমনি ভাবেই ঘুরছে।—তারপর যখন আরো কাছে তাকাচ্ছি, যখন আমার অন্তরের দিকে তাকাচ্ছি, তখন যা দেখতে পাচ্ছি তার বর্ণনা করতে গেলে চোখের জলে লেখার কালি ধুয়ে মুছে যাবে—তাই বিরত হলাম।

আজ কিসের আনন্দ? আমি অন্য দেশবাসীর কথা জিজ্ঞেস করছি না—আমি জিজ্ঞেস করছি আমার নিজের জায়গার লোকের কথা। আজ বাঙালীর কিসের আনন্দ? আজ কি কেউ এসে চুপি চুপি তার কানে মুক্তির বার্ত্তা বলে দিয়ে গেল, তাই তার এত আনন্দ?—

না আজকার আনন্দ শুধু তেরো শত বৎসরের গতানুগতিকতার ফল ?—আজ এর প্রধান আনন্দ হচ্ছে ঈদের নমাজ। (অন্তত তাই বলা উচিত ; কেননা যদি বলি যে আজকের আনন্দের প্রধানতম কারণ,—চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়র আশা—তা'হলে আজকার দিনেও যাদের এই চারটার মধ্যে কোনটাই জুটবে না, তাদের অপমান করা হয়। আর কথাটাও শোনায় নিতান্ত খারাপ। যদিও প্রকৃতপক্ষে ধরতে গেলে অন্তত বার আনা লোকের পক্ষে আজকার আনন্দের উৎস হচ্ছে রন্ধনশালা !)—আজকার আনন্দ হচ্ছে ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, বৃদ্ধ, বালক, সুস্থ, রুগ্ন নির্ব্বিশেষে একত্র হ'য়ে একান্ত মনে বিশ্বপতির চরণে আত্মনিবেদনে, আর তারপর শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে প্রেমালিঙ্গনে। কিন্তু এই যে উপাসনা, আর এই যে আলিঙ্গন, এর মধ্যে সত্যি সত্যি কতখানি আন্তরিকতা আছে, এই বাহ্যিক আচরণের মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে, তা' যখন চিন্তা করতে যাই, তখন এ আনন্দের উৎস একেবারে শুকিয়ে যায়। তার উপর যখন মনে হয় যে এই একত্র আরাধনা, এই পরস্পর প্রীতিবিনিময় থেকে অর্দ্ধেক মুসলমানজগত বঞ্চিত, তখন বুঝি এ আনন্দের দিনেও বৎসরের অপর ৩৬৪ দিনের মতই তারা সেই তাদের গৃহ-কারাগারের মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে আছে। আজিকার এই মিলনের উৎসবে তাদের কোন ভাগ নেই। আজও অর্দ্ধেক মুসলমানের কাছে তাদের প্রতিবেশীরা অপরিচিত। আজও অর্দ্ধেক মুসলমানের কাছে তাদের প্রতিবেশীদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। আজও অর্দ্ধেক মুসলমান হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে' তার প্রতিবেশীকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করবার জন্য উতলা হ'য়ে উঠছে না; কারণ যে অজানিত, অপরিচিত, তার জন্য কি কেউ কখন প্রীতি অনুভব

করে? ল্যাপল্যাণ্ড-বাসীর জন্য আমার মন ক'বার উতলা হয়? যে সংকীর্ণতার মধ্যে অর্দ্ধেক মুসলমান জন্মাবধি লালিত হয়, সে সংকীর্ণতার পরিসর আজও এক চুল পরিমাণ বর্দ্ধিত হচ্ছে না—তাই বলছিলাম যে আজকার আনন্দ, আজকার মিলন-উৎসব থেকে অর্দ্ধেক মুসলমান-জগত বঞ্চিত। তারপর যে বাকী অর্দ্ধেক আছে তাদেরই বা অবস্থা কি? —স্নান করে অজু করে, যে যেমন পারে ভাল জামা কাপড় পরে গিয়ে সকলে একত্র হ'য়ে লাইন বদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াল। কিন্তু এর মধ্যে গোড়াতেই অনেকে, বোধহয় শতকরা ৫০ জন, অজু করার অর্থ বুঝল না। একটা পুরাতন পদ্ধতি আছে বলে, বিড়্ বিড়্ পিট্ পিট্ করে কি আউড়িয়ে, বার তিনেক নাকে মুখে জল দিয়ে হাত পায়ের উপর জল গড়িয়ে, মাথার চুলের উপর আর কানের চার পাশ দিয়ে ভিজা হাত বুলিয়ে উঠে পড়ল। অজু করার অর্থ যে শুধু শরীরকে ধৌত করা নয়, সেই সঙ্গে মনকেও যে ধুয়ে নিতে হবে —তা বুঝল না। তারপর যখন নমাজে গিয়ে দাঁড়াল, তখন আবার সেই বিড়্ বিড়্ করে কি আওড়াল—তার অর্থ সাপ কি ব্যাং, তা বুঝল না। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল্। হয়ত বা ইমাম যা পড়লেন তা শুনতে পেল, হয়ত বা শুনতে পেল না—আর শুনতে পেলেও শতকরা নিরনব্বই জন তা বুঝল না। ততক্ষণ হয়ত বা পোলা-ওটা কেমন হবে তাই ভাবতে লাগল। অথবা আজ ক'বাড়ী ঘুরে কত পয়সা পাবে তারই একটা মানসিক অঙ্ক কসতে ব্যস্ত হ'য়ে রইল। কেউ বা ঈদ উপলক্ষে স্ত্রী-পুত্রকে কিছু দিতে পারল না বলে মনে মনে আফ্‌সোস্ করতে থাকল। তারপর হঠাৎ মধ্যের সারি থেকে কি একটা বলে উঠলো, সবাই হাঁটুর উপর হাতের ভর দিয়ে সামনে

ঝুঁকে পড়ে বার কয়েক পিট্ পিট্ ক'রে কি উচ্চারণ করলো—তার পর আবার উঠে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আবার পর মুহূর্ত্তে বসে পড়ে একেবারে উপুড় হয়ে কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে আবার পিট্ পিট্ করে কি বললো। এমনি ওঠা, বসা, সামনে ঝুঁকে পড়া, মাটিতে কপাল ঠেকান বার দু'য়েক হ'য়ে গেল, তারপর একবার ডান দিকে এক-বার বাঁ দিকে ফিরে কি বললো, তারপর দাঁড়িয়ে বই থেকে কি পড়া হল তাই শুনল, তারপর হাত উঠিয়ে কি প্রার্থনাটা করলো, তারপর সবাই আপন হাত আপন মুখের উপর বুলিয়ে চুমো খাওয়ার মত শব্দ করলো—আর হয়ে গেল আজকার উপাসনা। এই যে pan-tomime—এর অর্থ ক'জনে বুঝতে পারলে ? এ উপাসনাতে ক'জন যোগ দিলে ? এক ধর্ম্মের নামেই এমন করে লোকে কিছু না বুঝে ওঠা-বসার কষ্ট সহ্য করে আসছে ;--কিন্তু এই কি প্রকৃত ধর্ম্ম ? ধর্ম্মের মানে মুক্তি না হয়ে এমন দাসত্ব কেন ? আর যে-সে দাসত্ব নয়—মনের দাসত্ব। শরীরের দাসত্ব থেকে মুক্তির তবুও আশা থাকে, কিন্তু এ মনের দাসত্ব থেকে মুক্তি কোথায় ? মনে ইচ্ছা ক'র, তবে ত শরীরের দাসত্ব ঘোচে। কিন্তু মনই যখন ইচ্ছা করে না, তখন মনের মুক্তি হবে কেমন করে ? অথচ এই যে ওঠা বসা, এর মধ্যেও একদিন প্রাণ ছিল, এবং যাঁরা জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁদের জ্ঞানের সঞ্জীবনীসুধা পান করলে এখনও এই অর্থহীন ওঠা-বসা সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু সে ক'জন ?—হাজারের মধ্যে ন'শ নিরনব্বই জনই ত সেই তেরো শো বৎসরের শব বুকে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই বলছিলাম আজকার আনন্দ অন্তরের প্রকৃত আনন্দ নয়—শুধু আনন্দের অভিনয় মাত্র।—তারপর যখন মনে হয় যে এই দাসত্বের

নিগড়ে মন এমন কঠিনভাবে বাঁধা পড়ে রয়েছে যে উপাসনার অংশটুকুর পরে যে বক্তৃতার অংশটুকু আছে, সেটুকু সময়ের মাহাত্ম্যে উপাসনার সঙ্গে এমনি জড়িয়ে গিয়েছে যে, সেটুকুও সাধারণের অবোধ্য ভাষায় না পড়লে হ'বে না। অথচ মনের এমন বল নেই যে সেটুকুও আমার সহজবোধ্য মাতৃভাষায় পড়বো। এইত আমার অবস্থা। এর মধ্যে আনন্দের স্থান কোথায়?—সেদিন চীনদেশবাসীর অবস্থার কথা পড়ছিলাম। তাদের চীনা রাজা মিং বংশের শেষ বংশাবতংসকে পরাজয় করে মাঞ্চুরা যখন তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিল, তখন মাঞ্চুদের একটা ঘোর দুশ্চিন্তার কারণ উপস্থিত হলো। মাঞ্চুরা দেখলে যে চীনদের তারা লড়াইয়ে হারিয়েছে বটে কিন্তু তারা তাদের চেয়ে ঢের সভ্য, তাদের জ্ঞানবিজ্ঞান তাদের চেয়ে ঢের উন্নত। তাই মাঞ্চু-বিজেতারা চীনদের মনকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করবার জন্য উপায় স্থির করতে বসে গেল। শেষে তারা এমন এক উপায় স্থির করলে যে, তাতে চীনদেশবাসী শরীরে ও মনে উভয়ত মাঞ্চুদের কাছে ক্রীতদাসের মত হয়ে থাকলো। মাঞ্চুরা তাদের পূর্ব্ব রীতি-নীতি আচারব্যবহার শিক্ষাদীক্ষার বাহ্যিক আচরণের মধ্যে হস্তক্ষেপ করলে না। কিন্তু তাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যগুলি এমন করে দিল যে, সেগুলির মানে গুরু বা শিষ্য কারও সুবোধ্য রইল না—বরং একান্ত অবোধ্য হয়ে গেল। আর তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চীনের লোক মুখস্থ করে বিদ্বান্ বলে পরিচিত হতে লাগল; ফলে বহির্জগতের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবং সময় যদিও আপন মনে বয়ে যেতে থাকল, কিন্তু চীনদের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানালোচনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। না জানি

কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে য়ুরোপের কামান গিয়ে চীনের সিংহদ্বারে গর্জ্জে উঠলো, আর চীনদেশবাসীর দাসত্বশৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠে তাদের নিজের অবস্থা জানিয়ে দিল। আজ বাঙালী মুসলমানের অবস্থা কি মাঞ্চুপদদলিত চীনদেশবাসীর সমতুল্য নয়? তারা কি চীন-দেশবাসীর চেয়ে অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত নয়? চীনেরা তাও রক্ত-মাংস-দেহধারী মাঞ্চুদের দেখতে পেত—আর সেই জন্য তাদের সঙ্গে লড়তে পারত। কিন্তু বাঙালী মুসলমানের মনকে কোন্ মাঞ্চুরাজা এখন দাসত্ব-নিগড় পরিয়ে রেখেছে? তারা কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? মানুষ মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে—কিন্তু নিরাকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সে নিতান্ত অপারগ। জড় বস্তুকে বন্দুক, কামান, তলওয়ার দিয়ে আঘাত করা যায়, খণ্ডিত করা যায়, কিন্তু ছায়ামূর্ত্তির শরীরের ভিতর দিয়ে গোলাগুলি প্রবেশ করে বেরিয়ে যায়,—ছায়ামূর্ত্তি যেমন তেমনি থাকে। তাই বলছিলাম বাঙলার মুসলমানরা চীনদের চেয়েও অধিকতর করুণার পাত্র।

এইত গেল আমাদের নিজের অবস্থা। প্রতিবেশীর দিকে যদি তাকাই, তাহ'লে তাকেও দেখি আমার মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। সেও আজ বহু শতাব্দীর পূর্ব্বের হ্রিং টিং ছট্ কিং কিং কিড়িং আওড়াচ্ছে। সেও আজ উপাসনা করতে গিয়ে নিরীহ ছাগ-শিশুকে যূপ কাঠের মধ্যে ফেলে তার উপর খাঁড়ার ঘা মারছে।—মুসলমান যেমন পুরাতন প্রচলিত প্রথার সামনে মাথা নুইয়ে উপাসনার কাজ করছে—সেও তেমনি ইট কাঠ পাথরের মন্দির আর খড় মাটি রংএর প্রতিমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করছে।

আসল অন্তরের অন্তরতম দেবতার নিকট আত্মনিবেদনের ভাষা আজ বাঙলার মুসলমানও যেমন ভুলেছে, হিন্দুও তেমনি ভুলেছে। তারপর প্রতিবেশীদের ভিতর আর একটা অত্যদ্ভুত আচার দেখছি। তাদের সবারি একরকম রং, একরকম আচার, একরকম ভাষা—কিন্তু তাদের কেউবা আর একজনার মাথায় পা' তুলে দিয়ে নাকি তাকে আশীর্ব্বাদ করছে; আর কেউবা আর একজনার সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়ীর দরজার সামনে গিয়ে বলছে 'মশাই' আমি অমুক এসেছি, আপনি দয়া করে বেরিয়ে আস্থন। বেচারীর সাধ্য নেই যে সে বাড়ীর হাতার মধ্যে প্রবেশ করে—কেননা তাহ'লে যে পবিত্র ব্যক্তি সেই বাটীতে বাস করেন তাঁর পবিত্রতা নষ্ট হবে, এবং ফলে উভয়ই পতিত হবে। সেই যে কতশত শতাব্দী পূর্ব্বে সভ্য অসভ্যের মধ্যে তারতম্য রক্ষা করবার জন্য একটা প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল, তা' আজও রয়েছে—আরও কতদিন থাকবে কে জানে!

তারপর আজকার আনন্দ উৎসবের দ্বিতীয় অধ্যায়, নমাজ শেষ করে উঠে পরস্পর প্রেমালিঙ্গন। পূর্ব্বেই বলেছি যে এই প্রেমালিঙ্গন থেকে অর্দ্ধেক মুসলমান-জগত বঞ্চিত। অপরার্দ্ধের নিকট এই আলিঙ্গন এই কোলাকুলি একটা প্রথা মাত্র। এই আলিঙ্গনের সঙ্গে বৎসরাবধি-সঞ্চিত মনোমালিন্যের কণামাত্রও ধুয়ে যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হয়। তার উপর আবার মুসলমান-জগতের অর্দ্ধেক পৃথিবীর মানবসমষ্টির দশমাংশের মাত্র একাংশ। বক্রি নয় অংশই এই আলিঙ্গনের বাহিরে। আজিকার এই মিলন-উৎসবে দুই বাহু প্রসারিত করে আমি পাচ্ছি জগতের মানবসমূহের মাত্র এক দশমিক ভাগকে!

তাই আজ এই আনন্দ-উৎসবে আনন্দের চেয়ে বিষাদের ভাগই মনের উপর চাপ দিচ্ছে বেশি করে'। যেদিকে তাকাচ্ছি সেই দিকেই কেবল নিষ্ঠুরতার অভিনয়। অতীত এবং বর্ত্তমানের ইতিহাস চোখের সামনে অগণিত জীবের রক্তে ভিজে লাল হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই লাল রং আকাশে বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—যেন সমস্ত প্রকৃতি তার রক্তনেত্রের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পৃথিবী বিভীষিকাময় করে তুলেছে। প্রাণ একেবারে হাঁপিয়ে উঠছে। আর এক-একবার হতাশনেত্রে তাকিয়ে দেখছে, এ বিভীষিকার মধ্যে এমন কোথাও কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কিনা যা' মনকে একটু অভয় দিতে পারে—এমন কোনও আলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে কিনা যার বিমল জ্যোতি এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে স্নেহের প্রলেপ দিতে পারে। আশাতেই মানুষের জীবন। অতীত এবং বর্ত্তমানের মত ভবিষ্যতও যদি এমনি ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাহ'লে মানুষ বাঁচে কি করে? আশা মরীচিকা হ'তে পারে, কিন্তু তবুও তাতে একটা সঞ্জীবনী-শক্তি আছে। তাই যখন দেখছি যে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গের প্রতিনিধিস্বরূপ কাফ্রি নির্ব্বাচিত হচ্ছে, যখন দেখছি যে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর দুঃখে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পাদ্রির হৃদয় ভেদ করে সহানুভূতির ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, যখন দেখছি যে ভারতের কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তের জন্য য়ুরোপের শ্বেতাঙ্গ-রমণী প্রাণপাত করছে, যখন দেখছি যে বাঙলার দেশী মন্ত্রীর যোগ্যতম ব্যক্তি নির্ব্বাচনের সময় হিন্দু মুসলমানকে ভোট দিচ্ছে, যখন দেখছি যে বাঙলার মুসলমান রবীন্দ্রনাথকে আপনার জন বলে মনে করছে, যখন দেখছি বাঙলার মুসলমান লেখকের লেখার মধ্যে স্বাধীনতার বাতাস বইছে—তখন মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার

হচ্ছে। হয় ত বা এমন একদিন আসবে, যেদিন মানুষ মানুষকে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নিউপাসক, নাস্তিক, প্রাচ্য, প্রতীচ্য বলে দেখবে না—দেখবে কেবল মানুষ বলে। সেই শুভদিনের জন্য আমরা কায়মনে প্রার্থনা করছি। আর সেই শুভদিনের আশায় আমরা দুই বাহু প্রসারিত করে বিশ্ববাসী সকল নরনারীকে বক্ষে টেনে নিয়ে নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করছি।

তরিকুল আলম।

আদিম মানব।

——:•:——

(আমার প্রথম বয়েসের লেখা "জয়দেব" পড়ে সবুজ পত্রের কোনো কোনো পাঠক জানতে চেয়েছেন আমার সেকালের আর কোন লেখা আছে কিনা ?

আমি অনেক খুঁজেপেতে আর একটি প্রবন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, যার নীচে আমার স্বাক্ষর আছে। কিন্তু পড়ে দেখছি, সেটি বীরবলের লেখা আমি তার বেনামদার মাত্র।

আমি সেটি পুনঃপ্রকাশিত করছি দুটি কারণে। প্রথমত—যাঁরা আমার ছাত্রাবস্থার লেখা দেখতে উৎসুক তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য।

দ্বিতীয়ত—এই সত্য প্রমাণ করবার জন্য যে লোকে যাকে বীরবলী ঢং বলে, সে ঢং ক্রিয়াপদের হ্রস্বদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না। ও হচ্ছে রচনার একটা বিশেষ ভঙ্গী। সকলেই দেখতে পাবেন যে, "আদিম মানবের" ভাষা সাধুভাষা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী)

*　　*　　*　　*

যথার্থ, নিয়মবদ্ধ, সুসংলগ্ন জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে যাহা বলে, তাহা সকল দেশেই সকল সময়েই সত্য—বিজ্ঞান কোনও দেশের বা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের সম্পত্তি নহে। যে কেহ, যখন তখন, ইচ্ছা করিলেই, বিজ্ঞানের কথা যাচাই করিয়া লইতে পারেন। সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক খাঁটি সত্য জন-সাধারণের কাছে কখনই আদরের সামগ্রী নয়। সত্যের সঙ্গে অনেক আপদ-বালাই থাকে।

সত্য অতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধত ভাবে আমাদের নিকট আসিয়া হাজির হয়। তাহাকে ঘরে লইলে, অনেক পুরাতন, বহুদিন প্রতিপালিত, দুর্ব্বল বা সবল বিশ্বাস সকলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। ভুল বিশ্বাসগুলি অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। কিম্বা উত্তরাধিকারসত্বে লাভ করিয়াছি। অতএব স্বোপার্জ্জিত কিম্বা পৈতৃক বলিয়া আমাদের কাছে তাহাদের যে মূল্য আছে, সত্য তাহা বুঝে না। ভুল বিশ্বাসগুলি পূর্ব্বে অনেক কাজে লাগে দেখিয়াছি এবং তাহাদের দরুণ অনেক সুবিধা ভোগ করিতেছি, এ কথা বলিলেও সত্য তাহা কানে তোলে না। এই সকল কারণে, সকলের পক্ষে কেবলমাত্র সত্যকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা একেবারেই অসম্ভব। সাধারণ লোকে সাধারণ বিশ্বাস ও জ্ঞান লইয়াই শান্তিতে থাকে। সাধারণ বিশ্বাসের ভিতর সত্য ও মিথ্যা দুই সপত্নী নির্ব্বিবাদে ঘর করে। একত্রবাসের অভ্যাসবশতঃ তাহাদের স্বাভাবিক জাতিবৈরতার পরিবর্ত্তে একটা মেলামেশার ভাব আসিয়া পড়ে। মিথ্যা, সত্যের উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিয়া ও সত্য ব্যবহারিক উপযোগিতার ধূসর বস্ত্রে নিজের দীপ্তরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া লোকের চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সকল দেশেই দর্শন-বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সহিত মনুষ্যসাধারণের সহজবুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞানের একটা তুলনা করিয়া, বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে সকল সময়েই লোকে অনাবশ্যক এবং অনেক সময়েই ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করে। মনে এইরূপ একটা ধারণা জন্মাইয়া যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ পরিচালনার দ্বারা যাহা জানিতে হয়, তাহা অপেক্ষা, বিনা আয়াসে লব্ধ মতামত শ্রেষ্ঠ; কারণ কোনও রূপ না ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা

অবশ্য ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান। দর্শন, বিজ্ঞান, মানব চেষ্টার ফল; অতএব প্রমাদপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সহজ বুদ্ধি নাকি প্রকৃতির একটি অংশমাত্র, তাই সাধারণ মতামত অন্তঃকর্ণে শ্রুত দৈববাণীর ন্যায় নিঃসংশয়িতরূপে গ্রাহ্য। এরূপ বিশ্বাসে সোয়াস্তির ন্যায় সুখও আছে। আপনা অপেক্ষা অপর কাহাকেও আমরা সহজে বড় বলিয়া মানিতে চাহি না, যদি কেহ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ি। আবার অপরে যে কারণে বড়, তাহাতে তাহার সমান হইবার অভিপ্রায় রাখিলে বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যক, কিন্তু পরিশ্রম করিতে লোক সহজেই নারাজ— তাহার উপর আবার একপ্রকার পরিশ্রমেই প্রত্যেক কিছু আর একইরূপ ফললাভ করিতে পারে না। সুতরাং সহজ জ্ঞানের দৈবশক্তিতে নির্ভর করিয়া যদি আমরা আপনাদিগকে অধিকাংশ লোকের সমকক্ষ ও দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি অধিক সুখের হইতে পারে? রোজগার না করিয়া ধনী হইতে কাহার অসাধ? কিন্তু যাঁহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, লোকে যে সকল মতামত প্রকৃতি কর্ত্তৃক স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দত্ত অমূল্য রত্নভ্রমে যত্নসহকারে রক্ষা করেন ও জনসাধারণের সমক্ষে আপন গৌরববৃদ্ধির মানসে প্রকাশ করেন, তাহার প্রতি কাণা কড়ি পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। প্রকৃতি, তাঁহার জ্ঞানধন কাঙালিবিদায়ে অপব্যয় করেন না।

আমরা শৈশবাবস্থায় সাধারণের মধ্যে প্রচলিত মতামত এমনই অলক্ষিতভাবে শিক্ষা করি যে, পরে তাহা যে শিক্ষালব্ধ, তাহা মনে

থাকে না। বিজ্ঞান ও সাধারণ বিশ্বাস, উভয়েই শিক্ষাজাত। মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল ও বৈধ পরিচালনার ফল বিজ্ঞান। মানব বুদ্ধির অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খল ও অবৈধ পরিচালনার ফল সাধারণ মত। বিনা পরিশ্রমে সত্য মেলে না, পৃথিবীতে মিথ্যা প্রত্যেক নিশ্বাসে পথের ধূলির ন্যায় অজ্ঞাতসারে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে।

মানবজাতি সম্বন্ধে, নানা দেশে নানাপ্রকার সাধারণ মত প্রচলিত আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আজ কাল অসম্ভব যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা অনেক সত্য নির্ণয় করিয়া মানব-বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্তের সহিত পূর্ব্বোক্তের কোনও দেশেই সম্পূর্ণ মিল দেখা যায় না। সাধারণতঃ মানবজাতিসম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধি না হইলেও লৌকিক মত অদৃশ্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা প্রথমতঃ নিজ পরিবারের মধ্যে প্রচলিত আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও নিজ পরিবারভুক্ত লোকদিগকে আদর্শ স্থির করিয়া, সেই আদর্শের সহিত অপর সাধারণের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও চরিত্রের তুলনা করিয়া, অপর সম্বন্ধে ভাল মন্দ মতামত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করি। পারিবারিক দোষ সকল অভ্যাসের গুণে দোষ বলিয়া বুঝিতে পারি না। অন্যের ভিতর, অদৃষ্টপূর্ব্ব গুণ সকল দেখিলে, তাহা হয় দোষ, নয় অত্যন্ত হাস্যজনক পদার্থ বলিয়া মনে হয়। অন্যের কিছু নূতন দেখিলেই, তাহা, হয় চরিত্রহীনতা, নয় নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। স্ত্রীজাতি পরিবারমধ্যে বদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহারা এইরূপ মনোভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের দেহের ন্যায়, তাঁহাদের হৃদয় মনও গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে চির অব-রোধে বাস করে। তাঁহাদের যদি কোনও গ্রন্থ ভাল লাগে, তাহা

হইলে, তাঁহারা গ্রন্থকারকে, ভ্রাতা কিংবা প্রণয়পাত্রস্বরূপে ভালবাসিতে ইচ্ছা করেন! আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা ছাড়াও পৃথিবীতে যে অন্য প্রকারের ভালবাসা জন্মিতে পারে, সে কথা তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত। পৃথিবীতে যদি কাহাকেও তাঁহাদের মহৎ বলিয়া, কিংবা উচ্চ মনুষ্যত্ববিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তাহাকে মনে মনে তাঁহারা নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া ল'ন। অন্তঃপুর প্রাচীরের বাহিরে যে বিশাল জগৎ পড়িয়া আছে, তাহার কথা, শ্রুতকাহিনীর ন্যায়, তাঁহাদের নিকট কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বসনীয় হইতে পারে না।

পুরুষজাতির কার্য্যোপলক্ষে অনেকের সহিত মেলা-মেশা আবশ্যক তাই পুরুষেরা পারিবারিক আদর্শ ত্যাগ করিয়া, সামাজিক আদর্শ গঠন করেন। যিনি পল্লিগ্রামে বাস করেন, গ্রাম্য সমাজের অনুমোদিত আচার ব্যবহার ইত্যাদিই তাঁহার আদর্শ; যিনি নগরে বাস করেন, নাগরিক সমাজ তাঁহার আদর্শ। যাঁহারা দেশভ্রমণে ও সাহিত্য ইত্যাদির চর্চ্চা দ্বারা, নিজের মনের প্রসরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা জাতীয় আদর্শ গঠন করেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুসমাজের নিকট হিন্দুজাতিই মানব আদর্শের চরমোৎকর্ষ লাভে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্য অন্য জাতির পক্ষেও এই কথা সত্য। নানা বিভিন্ন জাতির সমাজ সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া, নানা বিভিন্ন জাতিকে ভালরূপে জানিলে পর, তবে মানবসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতে বিশ্বাস জন্মে; অন্যান্য মানবজাতির প্রতি সহৃদয়তা জন্মে। অজ্ঞতা হইতেই হৃদয়ের অনুদারতা জন্মলাভ করে। প্রশস্ত জ্ঞান ও সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের সম্মিলন, অত্যন্ত বিরল। যে জাতি যত অসভ্য, তাহারা সেই পরিমাণে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ এবং অপর জাতি সকলকে

নিকৃষ্ট মনে করে। এস্‌কুইমোদিগের বিশ্বাস, ঈশ্বর প্রথমে ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি ইউরোপীয়দিগকে সৃষ্টি করেন; কিন্তু প্রথম চেষ্টার ফল আশানুরূপ ভাল হয় নাই। তাহার পরে সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়া, ভগবান সর্ব্বশেষে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব এস্‌কুইমো-দিগকে সৃষ্টি করেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদিগের প্রথম রচনা অপেক্ষা পরের রচনা যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা এস্‌কুইমোরা সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। তাহারা আপনাদিগকে Inoits. অর্থাৎ মানব-নামে অভিহিত করে। অপর কাহাকেও তাহারা আদপে মনুষ্যজাতিভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। তাহারাই পৃথি-বীর একমাত্র মানবজাতি; তাহাদের ধর্ম্মই যথার্থ মানবধর্ম্ম এই বিষয়ে আমাদের সহিত তাহাদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

মানবজাতি কত দেশে কত বৈচিত্রবিশিষ্ট; মানব-চরিত্র দেশ-ভেদে কত বিভিন্ন আকার ধারণ করে, দেশভেদে মানুষের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি, পরস্পর হইতে কত বিভিন্ন, এ সকল বিষয়ে সত্যের সহিত সম্যক পরিচয়ে আমাদের পক্ষে অনেক উপকার আছে। যদি আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যমাত্রেরই মধ্যে একটা মিল আছে, সর্ব্বত্রই বুদ্ধি ও নীতির শ্রেষ্ঠত্বেই যথার্থ মনুষ্যত্ব নিহিত, তাহা হইলে, আমাদের মন হইতে আমরা যাহাকে স্বজাতিপ্রিয়তা বলি এবং যাহা বিজাতির প্রতি ঘৃণার রূপান্তর বই আর কিছুই নহে, তাহার পরিবর্ত্তে, মনে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। দেশ কাল বিচার না করিয়া, আমরা যাহাতে বুদ্ধির উদারতা, তীক্ষ্নতা ও চরিত্রের মহত্ব ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি, তাহার প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মে। যখন আমরা প্রমাণ পাই যে, দেশভেদে

এবং একই দেশে কালভেদে, স্বতন্ত্র রকমের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও নীতি, প্রকৃতির অবিচলিত নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে, তখন আমরা কখনও কেবলমাত্র আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা হইতে জাতি-সমূহের সভ্যতা ও অসভ্যতা প্রমাণ করিতে উদ্যত হই না, কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখি না। সর্ব্বশেষে এই মহৎ সত্যটি জানিতে পারি যে, আচার-ব্যবহারে জাতিকে বড় করে না, উন্নত মনুষ্যচরিত্র হইতেই জাতির এবং আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠত্ব বিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হয়।

অজ্ঞতাজাত, অনুদার মনোভাবের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমাদের বাঙ্গলা দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আজকাল আবাল বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে এইরূপ নিজমহত্বে বিশ্বাস ও স্বদেশবাৎসল্য ও স্বজাতি-প্রিয়তা কিঞ্চিৎ অনাবশ্যকরূপে অপরিমিত হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, এতটা না হইলেও বঙ্গসন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না। বিজাতীর প্রতি ঘৃণা ম্যালেরিয়ার মত সকলের হৃদয় মন আক্রমণ করিয়াছে। বিদেশী সভ্যতাকে গালি না দিলে লেকে সংবাদপত্র পড়ে না। সকলেরই বিশ্বাস, শত্রুর মুখে ছাই অর্পণ করা ব্যতীত, বাঙ্গালীর উন্নতির অন্য কোনও উপায় নাই। কোনও বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা গর্হিতকার্য্য বলিয়া গণ্য। আর্য্যদিগের ন্যায় আর্য্য সহানুভূতিরও সাগর পার হইলে জাতি নষ্ট হয়। শূন্যগর্ভ আত্ম-গরিমায় পূর্ণ হইলেই বাঙ্গালী পাঠক রচনার আদর করেন।—লেখায়, সুযুক্তি, সুবিবেচনা ও সুরুচির অভাবই রচনা অধিক মূল্যবান করে। দুঃখের বিষয় এই যে, অন্যায় ও অশোভন মনোভাব, বাঙ্গলার অনেক শিক্ষিত বলিয়া খ্যাত লোকদিগের কথায় ও লেখায় যথেষ্ট প্রকাশ পায়। বাঙ্গালী পাঠকদিগের মনে অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে ঈষৎ কৌতূ-

হল উদ্রেকের অভিপ্রায়ে, আমি উপস্থিত প্রবন্ধে গুটিকতক অসভ্য জাতির আচার ব্যবহারাদির বিবরণ, সংক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মানুষকে ভালরূপে জানিতে হইলে, সভ্য অসভ্য, সকল জাতির বিষয়ই সমানভাবে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজনীয়। কিন্তু অসভ্য জাতিদিগের বিষয় জানায়, একটু বিশেষ লাভ আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষ কিছু একেবারে সভ্য হইয়াই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। আজকাল যাহাদিগকে সভ্য দেখি, তাহারা পূর্ব্বে অসভ্য ছিল। মানবজাতি একপদ একপদ করিয়া, সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইতিহাসে এই ক্রমোন্নতির কথা অনেকটা জানা যায়। কিন্তু অনেকটা সভ্য হইবার পূর্ব্বে, আর ইতিহাস রচনা মানুষের পক্ষে সম্ভবে না। সুতরাং ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা আমাদের জানিবার কোনও নিশ্চিত উপায় ছিল না—বরাবর খানিকটা আন্দাজ ও অনুমানের দ্বারা, গোঁজামিলন দিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে হইতেছিল; কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের এ স্থলে বিশেষ অভাব। নাইল নদীর ন্যায় মানব-প্রবাহেরও উৎপত্তি স্থান অনাবিষ্কৃত প্রদেশে লুক্কায়িত ছিল। মাঝে মাঝে দুই এক জন গোড়ার খবর বাহির করিয়াছেন বলিয়া, সভ্য সমাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কিন্তু লোকে তাঁহাদের কথা মানে নাই, তাঁহারাও নিজের কথার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেন নাই।

কিন্তু হঠাৎ ইউরোপীয়েরা মানব ইতিহাসের লুপ্ত প্রথম অধ্যায়-গুলি অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলেন। অপরিচিত অক্ষর

ও অজ্ঞাত ভাষা হইতে মর্ম্ম উদ্ধার করিতে, প্রথমে তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ক্রমে বহুলোকের সমবেত চেষ্টার ফলে, আমরা অসভ্য জাতিদের ভিতরকার কথা জানিতে পারিয়াছি। বিস্তৃতকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, পৃথিবীর জীব জন্তু উদ্ভিদাদি ক্রমে যতপ্রকার বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, পৃথিবীর বিস্তৃত ক্ষেত্রে সে সকলেরই নিদর্শন পড়িয়া আছে। যাহা দূর-কালে ঘটিয়াছিল, এখন দূরদেশে তাহা বর্ত্তমান। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সভ্যজগতে যাহা বর্ত্তমান ছিল, এখন তাহা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহে ও দুর্গম পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে বদ্ধ আছে। এখনকার অসভ্যদিগকে দেখিয়া আমাদের আদিম পূর্ব্বপুরুষদিগের যথার্থ অবস্থা আমরা জানিতে পারি।

যথার্থ কথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, এ প্রবন্ধে মানবজাতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পর্য্যালোচনার কিছুমাত্র চেষ্টা করা হয় নাই। কারণ সেরূপ চেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়া লেখকের জ্ঞান ও ক্ষমতার বহির্ভূত। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বঙ্গসমাজের সহিত অসভ্য-সমাজের তুলনা করিয়া অনর্থক লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার অভিপ্রায় যে আমার নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। Lucretius বলেন যে, তীরে বসিয়া সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতে দেখায় বিশেষ আমোদ আছে। সনাতন আর্য্যসমাজের অটল পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরস্থায়ী বঙ্গসন্তানগণ এই সকল অসভ্যদের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার ভুলের ভিতর নাকানি-চুবানি দেখিয়া যদি কিছুমাত্র আমোদ বোধ করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অসভ্যদের দেশে বাস করিয়া সুখ নাই। পৃথিবীর উত্তর সীমায় এস্কুইমোরা বাস করে। সে দেশে ভয়ঙ্কর শীত ; নদী, মাঠ, পর্ব্বত ইত্যাদি চির-তুষারাবৃত। এক বিন্দু তরল পদার্থ মণি মাণিক্য অপেক্ষাও দুর্লভ। এমন কি বোতলের ভিতর ব্র্যাণ্ডি জমিয়া যায়, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে গেলে যথার্থই মুক্তা বর্ষণ হয়। শিলাবৃষ্টি ব্যতীত অন্যপ্রকার বৃষ্টি এ দেশে অজ্ঞাত। কঠিন পদার্থ ঠাণ্ডায় আরও কঠিন হইয়া উঠে। রুটি, মাংস ইত্যাদি ছুরিতে কাটে না, কুঠারের সাহায্য ব্যতীত তাহা ভাগ করা যায় না। ইউরোপীয়দিগের শরীরেও এই শীতের দৌরাত্ম্য সহ্য হয় না। মুহূর্ত্তমাত্র আবরণ মুক্ত হইলে, অস্থিমাংসগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল হিমানীক্লিষ্ট সুকুমার পুষ্পের ন্যায় খসিয়া পড়ে। ইহার উপর আবার ছয় মাস ধরিয়া দিন ও ছয় মাস ধরিয়া রাত্রি। এই দীর্ঘ দিনে সূর্য্যরশ্মি বরফের উপর প্রতিফলিত হইয়া এমন চক্‌চক্ করে যে, কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করা দুষ্কর। তাহা হইলে অন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যখন রৌদ্রের উত্তাপে বরফরাশি গলিতে আরম্ভ করে, তখন পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল ভাঙ্গিয়া পড়ে। বরফাবৃত পৃথিবী শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়—চারিদিক হইতে এই পরিবর্ত্তনের আনুষঙ্গিক কোলাহল উঠিতে থাকে। এই দিনের আলোকে, লোকালয়হীন বরফের প্রান্তর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁকচুরা আকারের পর্ব্বত, তমসাচ্ছন্ন গভীর গহ্বর সকল চোখের সম্মুখে ব্যক্ত হয়। চারিদিকে কোনও প্রাচীন জগতের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, মনে হয়। এই অফুরন্ত দিন শরীরে ক্লান্তি ও মনে অবসাদ সহজেই আনয়ন করে।

ছয় মাস রাত্রি আরও ভয়ানক। এই দীর্ঘ রাত্রিতে কেবল

নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ও অসহ্য নিস্তব্ধতা দেশ জুড়িয়া বসিয়া থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বজগতের যেরূপ অবস্থা ছিল বলিয়া কল্পনা করি, এখানে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এই অনিবিড় অন্ধকারে চতুঃ-পার্শ্বের দৃশ্য অত্যন্ত ভীষণ দেখায়। আকাশপথে পুরাকালের নিশাচরদের ন্যায়, অনির্দ্দিষ্ট আকারের কত বিভীষিকা, ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে চলিয়া যায়। ক্ষীণ অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে, দূরের পর্ব্বত সকল বিপুল দেহশালী নিদ্রিত দৈত্যকুল বলিয়া মনে হয়।

ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, নিজের বুকের ধুক ধুক শব্দও স্পষ্টরূপে শোনা যায়—দুই তিন ক্রোশ দূরের ঘণ্টার শব্দ কানে আসে। সকলেই জানেন, এই দেশ বৈদ্যুতিক আলোকের জন্মস্থান। যখন তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া, বৈদ্যুতিক আলোক সহস্রপ্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দেয়। যখন অরোরা বোরিয়ালিস্ দিগন্তবিস্তৃত রক্তবর্ণ ধনুকের আকারে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয়, অন্তরীক্ষে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। অরোরা বোরিয়ালিসের আলোক চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বরফের উপর অসংখ্য আকারে প্রতিফলিত হয়; অরোরা বোরিয়ালিস্ অল্পক্ষণের জন্য এই প্রচুর আলোক রাশি দ্যুলোকে ও ভূলোকে ছড়াইয়া দিয়া, সহসা অদৃশ্য হয়—আবার সমস্ত অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে।

এ দেশে ফল নাই, ফুল নাই, শ্যাম-দুর্ব্বাদল নাই, সুমধুর জ্যোৎস্না নাই। দক্ষিণ পবন মৃদু হইয়া আসে না, ঝড়ের আকার ধরিয়া আসে, চন্দনের শীতল স্পর্শের পরিবর্ত্তে কঠিন তুষার কণা বহিয়া আনে—ঘন পল্লবের ভিতর দিয়া মর্ম্মর ধ্বনি বহিয়া আনে না, বরফে প্রতিহত হইয়া বিকট চীৎকার করে। এ দেশে বসন্ত সর্ব্বা-

পেক্ষা বিশ্রী ঋতু। আমাদের দেশের সস্তা কবিরা সে দেশে গেলে, তাঁহাদের ব্যবসা মারা যায়। কাহারও কাহারও চক্ষে, এ দেশও মধুর সৌন্দর্য্যময় বোধ হয়। অনেক ইংরেজ এ দেশের প্রতি বিশেষ আসক্ত। কিন্তু তাহার কারণ দৃশ্য-সৌন্দর্য্য নহে, তাঁহারা বলেন, শীতের কৃপায় বেশ ভাল রকম ক্ষুধা হয়, বহুল পরিমাণে আহার করা যায়!

এই ত গেল পূর্ব্ব প্রদেশের কথা। পশ্চিম প্রদেশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। শীত এত অধিক নয়। কিন্তু দেশটা নিতান্ত ভিজে রকমের। গ্রীষ্মকালে ঘাস গুল্মলতায় মাঠ ঘাট সবুজ হইয়া উঠে। তবে বড় বড় গাছ পালা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দেশের কথা মনে করিতে আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, আয়েসী-বাঙ্গালী প্রকৃতি কাতর হইয়া উঠে, তদ্দেশবাসীরা সেখানে বেশ সানন্দমনে বাস করে। তাহাদিগকে একরূপ সদানন্দ বলিলে চলে। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা, অষ্টপ্রহর তাহারা হাসির উপরই থাকে। তাহাদের খাবার সময় হাসি পায়, তাহারা ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে গেলে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে, কান্নাতে সুরু করিয়া হাসিতে শেষ করে—অকারণ এত আনন্দ বিদেশীরা ঠিক বুঝিতে পারে না।

অভ্যাসবশতঃ সকল দেশই সহ্য হয়, ক্রমে ভালও লাগে। মৃত্যুর পর স্বর্গেতর স্থানে গেলে মানুষকে বোধ হয়, অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; থাকিতে থাকিতে সে দেশটাও অভ্যস্ত হইয়া আসে; ক্রমে হয়ত ভাল লাগিতেও পারে।

আমেরিকার মধ্যদেশে আপাকেরা বাস করে। সেখানে বং-

সরের ভিতর দশ মাস এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় না। আকাশ সম্পূর্ণ মেঘযুক্ত থাকে—সমস্ত দিন সূর্য্য হইতে অগ্নি বর্ষণ হয়। বৃক্ষপত্রহীন, সুদূরবিস্তৃত বালুকাময় প্রান্তর ও কঠিন পর্ব্বত সকল, ছায়ার অভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া যায়। দিন রাত প্রবলবেগে ঝড় বহিতে থাকে—ধূলিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলে। বাকী দুই মাস অজস্র-ধারায় বৃষ্টি হয়—সমস্ত দেশ জলে ভাসিয়া যায়। বৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি দুইয়েরই একটা বাড়াবাড়ি লক্ষিত হয়।

জন্মভূমির হীনতার জন্যই, অনেক জাতি আদিম অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বাহ্য-প্রকৃতির সহিত বনিবনাও করিয়া আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হয়। যেখানে প্রকৃতি জীবনপথে বাধা স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে, সেই সকল বাধা অতি-ক্রম করিতেই আমাদের দিন চলিয়া যায়; উন্নতি করিবার অবসর থাকে না।

কোনও দেশে অধিক শীত কিম্বা অধিক গরম, শরীর মনের স্বাস্থ্যের উপযোগী নহে। যেখানে অসভ্য জাতি, সেখানেই হয় জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর, না হয় আহার্য্য দ্রব্য বিরল। জীবন কার্য্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক খনিজ পদার্থের অভাবও একটি বিশেষ কারণ। Jevons এবং Greene-এর মতে, বিলাতের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা, ইংরাজদিগের চরিত্র অপেক্ষা, বিলাতের কয়লার খনির নিকট কিছুমাত্র কম পরিমাণে দায়ী নহে।

ভারতবর্ষেও দেখা যায় যে, অস্বাস্থ্যকর এবং অনুর্ব্বর পর্ব্বতের উপত্যকাসমূহেই এ দেশের অসভ্য জাতিদিগের বাস। কেবল নীলগিরি পর্ব্বত সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। এই মলয় পবনের

স্বদেশে, শীত গ্রীষ্ম দুইই মাঝারি রকমের। বারমাসই সূর্য্যালোকের অভাব নাই। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আকাশ বেশ পরিষ্কার ও নীল। বর্ষার পর আকাশের নীলিমা আরও গাঢ় ও নির্ম্মল এবং স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হয়। গাছ পালা, ফলে, ফুলে, ঘন পল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠে। অসংখ্য লতা Fern-এ পৃথিবী ছাইয়া ফেলে। যেখানে সেখানে, লাল, নীল, শ্বেত, পীত, নানাবর্ণের অসংখ্য ফুল দলে দলে ফুটিয়া থাকে। চারিপাশে উঁচুনীচু শস্যক্ষেত্র হরিৎ-সমুদ্রের হিল্লোলের ন্যায়, পর্ব্বত অধিকার করিয়া বসে। দূরে পশ্চিমে সমুদ্র দেখা যায়। দেশের গুণে, নীলগিরির টোডারা অন্যান্য অসভ্য জাতি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। অসভ্যেরা অধিকাংশই দেখিতে কদাকার ও মাথায় ছোট এবং স্বল্পজীবী; কিন্তু টোডারা দেখিতে বেশ সুন্দর, তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, চক্ষু জ্যোতিপূর্ণ, নাসিকা উন্নত, তাহারা আকারে দীর্ঘ এবং ইংরাজদিগের অপেক্ষাও অধিক দিন বাঁচে। জল বায়ুর গুণে ইহারা শরীরে উন্নত, কিন্তু বুদ্ধি এবং নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে ইহাদের সহিত অন্যান্য অসভ্য জাতিদের সামান্য প্রভেদ। Buckle-এর মতানুসারে, যদি মানব-উন্নতি কেবলমাত্র বাহ্য প্রকৃতি সাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে, টোডাদিগের, গ্রীকদিগের ন্যায় সাহিত্য এবং কলাবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া উচিত ছিল, কারণ মলয় পর্ব্বত গ্রীস অপেক্ষা সৌন্দর্য্যবিষয়ে কোনও অংশেই ন্যূন নহে। টোডাদিগের এইরূপ অনুচিতরূপে চিরদিন অসভ্যাবস্থায় থাকা সম্বন্ধে সমর্থন কিম্বা প্রতিবাদের ভার বকলের শিষ্যদিগের উপর অর্পিত হইল।

বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় ধনী ব্যক্তিগণ, যেরূপ গ্রীসের প্রস্তর মূর্ত্তি, ইটালীর ছবি, চীন এবং জাপান দেশীয় শিল্পজাত সকলে, গৃহ

পরিপূর্ণ করিয়া, চিরজীবন শিল্প সৌন্দর্য্যে পরিবৃত থাকিয়াও, অশিক্ষা কিম্বা কুশিক্ষার দোষে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাববশতঃ, কিছুমাত্র আনন্দ উপভোগ করেন না, উক্ত বিশিষ্ট সহবাসেও চরিত্র সম্বন্ধে কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন না—টোডারাও ঠিক সেইরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ ও উদাসীন। পড়িতে না জানিলে প্রকাণ্ড লাইব্রেরির মধ্যে বাস করার বিশেষ যে কিছু লাভ আছে, এরূপ আমার বিশ্বাস নহে।

বলা বাহুল্য, অসভ্যদের ভালরকম বাড়ী ঘর নাই। অধিকাংশ স্থলে পর্ব্বতের গুহায়, গাছের তলায়, কখনও বা 'মুক্তবায়ুতে, কেবলমাত্র আকাশের নীচেই তাহারা দিন কাটাইয়া দেয়। যেখানে ঘর বাঁধা নিতান্ত আবশ্যক, সেখানে হাতের গোড়ায় যা পাওয়া যায়, বাঁশ, কাঠ, খড়, গাছের ডাল পালা ইত্যাদি, তাহা দিয়াই কোন রকমে রৌদ্র বৃষ্টির হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মাথা লুকাইবার একটু স্থান রচনা করে। এক বিষয়ে সকল দেশের অসভ্যদিগের ভিতর একটা পারিবারিক সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহারা বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ, কোথাও বা দু'তিন শত লোক, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া একটি মাত্র ঘরে বাস করে। এইরূপ ঘেঁসাঘেঁসিতে বিশেষ রকম ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। স্বল্পায়তন স্থানের মধ্যে থাকিতে বাধ্য হওয়ায়, তাহারা কেবলমাত্র একমন নহে, কতকটা একদেহও হইয়া যায়। "বসুধৈব কুটুম্বকং" এই মহৎ বাক্যের, তাহারা আমাদের অপেক্ষা অধিক সম্মান রক্ষা করিয়াছে। অনেকে বলেন, বাঙ্গালীরা একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত বলিয়া পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত মনুষ্যত্ববিশিষ্ট। কেবলমাত্র একান্নবর্ত্তী নহে, উপরন্তু এককক্ষাবর্ত্তী অসভ্যেরা কত

উচ্চ মনুষ্যত্ববিশিষ্ট, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর দার্শনিকেরা, সে বিষয়ে একটা মীমাংসা করিয়া দিতে বোধ হয় সক্ষম।

একটিমাত্র ঘরে দলশুদ্ধ লোকে রন্ধন, শয়ন, আহার, বিহার ইত্যাদি করায়, তাহাদের শরীর এবং গৃহের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে ততটা আসক্তি জন্মায় না। গোয়ালে যেমন একপাল গরু থাকে, ইহারাও ঠিক সেইরূপ অবস্থায় বাস করে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, গরুর মালিক উক্ত জীবের স্বীয় স্বাস্থ্য লাভের পক্ষে আবশ্যকীয় জ্ঞানে, গোয়াল পরিষ্কার করেন, কিন্তু এই পঞ্চাশ শরীকের গৃহ পরিষ্কার করাটা কেহই একের কর্ত্তব্য মনে করেন না। অনেক স্থলে বাসগৃহের মেজে খুঁড়িয়া মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। ইহলোক এবং পরলোক, এই দুই লোকের অধিবাসীরা, দুই হাত মৃত্তিকার ব্যবধানে বাস করেন!

গারোরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। গ্রামের সকল ছেলেরা মিলিয়া, একটি বৃহৎ ব্যারাকে বাস করে। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র মহিলাশালা আছে। যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিন তাহাদিগকে সেখানে থাকিতে হয়। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনকতক জবরদস্ত রমণী তাহাদের কর্ত্রী নিযুক্ত হয়। বৈকালে উক্ত কর্ত্রী-ঠাকুরাণীগণ ছড়ি হাতে করিয়া, কুমারীগণকে পদব্রজে হাওয়া খাওয়াইতে বাহিরে লইয়া যান। ছড়ি লইবার উদ্দেশ্য, পথের কুকুর ও ছোড়া তাড়ান। ক্রমবিকাশপদ্ধতি অনুসারে আজ কাল যাহা Kinder Garten-এ পরিণত হইয়াছে, এইখানেই বোধ হয় তাহার আদি সৃষ্টি।

বেশ ভূষা সম্বন্ধে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অসভ্যেরা পরস্পর অত্যন্ত

বিভিন্ন। জন্মসুলভ নগ্নতা হইতে অনাবশ্যকরূপ পরিচ্ছদপ্রাচুর্য্য ইহাদের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত। এরূপ পার্থক্য যে সকল সময়েই অকারণজাত, তাহা নহে। কোথাও বা শীতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ রকম দেহের আবরণ আবশ্যক। কোথাও বা গরমের জ্বালায় গায়ে এক টুকরাও কাপড় রাখা যায় না। তবে এ বিষয়ে কিছু নিশ্চিত নাই। বেশ ভূষার বাহুল্যের জন্য বিখ্যাত আপাকেদিগের পরিচ্ছদের ভার, সে দেশের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কিছুমাত্র লাঘব করতে পারে নাই। অপ্রয়োজনে কেন যে ইহারা বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করে, তাহার যথার্থ কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে লজ্জা নিবারণ করা যে তাহার উদ্দেশ্য নহে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অসভ্যজাতিমাত্রেই অতি সহজে এবং অসঙ্কুচিত ভাবে, আবশ্যক হইলেই বেশ পরিত্যাগ করে। নৃত্য করিবার সময় এবং অনেক প্রকার উৎসব এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে যোগ দান করিতে হইলে, তাহাদের দেহ, আচ্ছাদনের সম্পর্ক রহিত করা নিতান্ত আবশ্যক। অতিসভ্য প্রাচীন গ্রীক জাতির সহিত, এ বিষয়ে তাহাদের আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে লজ্জা গুণ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; তবে তাহাদের লজ্জার কারণ স্বতন্ত্র। কিসে লজ্জা হওয়া উচিত এবং কিসে উচিত নয়, এ বিষয়ে কোন সভ্য জাতির সহিত তাহাদের একেবারেই মতে মেলে না। ভদ্রতা এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হইয়া পরিচ্ছদধারণের উদ্দেশ্য পাঁচ জনে যেরূপ করে, ঠিক সেইরূপ করা। অর্থাৎ, ইংরাজীতে যাহাকে “ফ্যাশন” বলে, তাহারই প্রাদুর্ভাব উক্তরূপ ব্যবহারের কারণ। “ফ্যাশন” ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ফল নহে—উনবিংশ

শতাব্দীর হাত এড়াইয়া যে প্রাচীন অসভ্যতা আজিও সভ্য সমাজে বিরাজ করিতেছে, "ফ্যাশন" তাহারি বিকাশ মাত্র। যদি কাহারও এ কথা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে না হয়, তাহা হইলে Herbert Spencer-এর Sociology নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে, বৃক্ষ পল্লব এবং বল্কল ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার পরিচ্ছদ প্রচলিত ছিল না। তাহারা পত্র আবরণ দিয়া লজ্জারক্ষা করিত। নীলগিরির টোডারা একখণ্ড বস্ত্র, প্রাচীন রোমান জাতির টোগার ন্যায়, স্কন্ধের উপর দিয়া পরিধান করে। এক পার্শ্বের অঙ্গ অর্দ্ধ অনাবৃত থাকে, একখানি হাত এবং একটি জঘন কাপড়ে ঢাকা পড়ে না। ইউরোপীয়দের চক্ষে এ পরিচ্ছদ বড় ভাল লাগে; তাঁহাদের মতে, উক্ত পরিচ্ছদ হইতে টোডাদের সুরুচির দিব্য পরিচয় পাওয়া যায়।

মালাবার প্রদেশের নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা দেহের উপরিভাগ অনাবৃত রাখে। পাশ্চাত্য রমণীগণ, বৈকালিক পোষাক সম্বন্ধে কতকটা স্বাধীনতা ভোগ করেন; তাঁহাদের বৈকালিক পরিচ্ছদে একটু স্বচ্ছন্দ উন্মুক্ত ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু, ইহাদের সন্ধ্যা-সকাল বিচার নাই; সকল সময়েই অঙ্গাবরণ একটু বেশী খোলা। গোধূলি সময়ে অন্তঃপুরের গবাক্ষদ্বারের মধ্য দিয়া ঈষৎলক্ষিত অসূর্য্যম্পশ্যা-দিগের সহিত, পরিস্ফুট দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে পুরজন সমক্ষে উক্ত অবরোধবাসিনীগণের বহিরাগমনের যে পার্থক্য, পাশ্চাত্য ও মালাবার স্ত্রীপরিচ্ছদের বিভিন্নতাও প্রায় তদনুরূপ। ইংরাজ রমণী-গণ ইহাদিগকে পরিচ্ছদসম্বন্ধে একটু সভ্য করিবার জন্য বহুল চেষ্টা

করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরাজ ললনাদিগকে রাজপথে উন্মুক্তদেহে বাহির হইতে বলিলে, তাঁহারা যে পরিমাণ আপত্তি প্রকাশ করিতেন, মালবার রমণীরা, প্রচলিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত কাপড় ব্যবহার করিতে, তাহা অপেক্ষা কিছু কম আপত্তি প্রকাশ করে নাই। শরীরের উত্তমার্দ্ধ বস্ত্রাবৃত করা ইহাদের মতে অসম্মানের বিষয়, বিশেষ লজ্জার কথা, গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা একেবারেই অসম্ভব।

পাখির পালক ও সলোম পশুচর্ম্মের প্রতি অসভ্যদের একটু বিশেষ টান দেখা যায়। চামড়া অপেক্ষা পালক অধিক যত্নের ধন, কারণ পালকে শুধু পোষাক নির্ম্মিত হয় এমন নহে, পালকের ন্যায় মস্তকের শোভা আর কিছুতেই বাড়াইতে পারে না।

এস্‌কুইমোরা মাছের চামড়ার জুতা পরে। শুনিতে পাই, সম্প্রতি জন কতক স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তি বিলাতি দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিবার উদ্দেশে, মাঞ্চেষ্টার, বারমিংহাম, লণ্ডন প্রভৃতির সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়া, নিজেরা কোম্পানি করিয়া কারখানা খুলিবেন। উক্ত মহোদয়গণ দেশীয় মৎস্যচর্ম্ম যদি কাজে লাগাইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার হয়।

এ স্থলে বলা আবশ্যক, অসভ্যদিগের ন্যায় "স্থিতিশীল" লোক সভ্য জগতে দুর্লভ। তাহারা সকল প্রকার উন্নতির ভয়ানক বিরোধী। পুরুষানুক্রমে প্রচলিত আচারব্যবহারের একটুমাত্র পরিবর্ত্তন তাহাদের পক্ষে অসহ্য। বাঙ্গলার নব্য হিন্দুরাও এ বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ নহেন। সুতরাং পরিচ্ছদসম্বন্ধে সনাতন প্রথা বজায় রাখিবার জন্য, তাহারা একান্ত উৎসুক। বৃক্ষত্বক্, পশুচর্ম্মাদি-

রচিত বেশের ন্যায়, প্রকৃতিদত্ত সাজ পরিহার করিতেও নিতান্ত অনিচ্ছুক। পূর্ব্বে টিপু সুলতান মালবার প্রদেশের লোকদের কাপড় পরিতে আদেশ করায়, তাহারা দারিদ্র্যের দোহাই দিয়া আপত্তি করিয়া পাঠায়। টিপু সুলতান নিজখরচে তাহাদের বস্ত্র যোগাইতে রাজি হইলেন। যখন তাহাদের পক্ষে আর কোনও মিথ্যা ওজরের পথ রহিল না, তখন তাহারা কাপড়পরা-রূপ ঘোরতর অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা দেশত্যাগ শ্রেয়ঃ মনে করিয়া, অন্য রাজার দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিল। টিপু সুলতান অগত্যা তাহাদের লজ্জানিবারণের চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ইচ্ছানুসারে, উড়িষ্যার অসভ্য জাতিরা কিছুদিন হইতে কাপড় পরিতে বাধ্য হইয়াছে। মহারাণীর ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, ইংরাজসৈন্যের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল। ইংরাজ এক হাতে বন্দুক ও অপর হাতে কাপড় লইয়া গিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহারা রাইফেল গুলির অপেক্ষা, মাঞ্চেষ্টারের ধুতি অধিক পছন্দ করিল।

পরিচ্ছদসম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে যেমন ভেদই থাকুক, অসভ্য-মাত্রেই অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়। তাহাদের মধ্যে উল্কি পরাটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কারস্বরূপে পরিগণিত, সর্ব্বত্রই এই উল্কির সমান আদর। আবার লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বর্ণে মুখ চিত্রিত করা বিশেষ বাবুয়ানার লক্ষণ বলিয়া পরিচিত। এস্‌কুইমোরা শোভা বৃদ্ধির জন্য মুখে কালি মাখে, তাহারা নিজের পাণ্ডুবর্ণ তাদৃশ নয়নরঞ্জন বলিয়া বোধ করে না। পাউডারের কথা ঠিক জানা নাই, কিন্তু বিবাহ উৎসবাদি উপলক্ষে মুখে চুন মাখাটা অনেক দেশে প্রচলিত আছে।

স্ত্রীজাতিই অবশ্য অলঙ্কারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া অলঙ্কার তাহাদেরই একচেটিয়া নহে, পুরুষেরাও যথেষ্ট পরিমাণে অলঙ্কারভক্ত। সৌন্দর্য্য যে কেবল স্ত্রীজাতির পক্ষে আবশ্যক, এ কথা তাহারা মানে না—পুরুষদেরও সুন্দর হইবার ভারি সাধ!—তাহারাও সর্ব্বদা শোভন ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করে। অসভ্য জাতিমাত্রেরই কেশবিন্যাসের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইস্কুইমো রমণীরা সম্মুখে থর কাটিয়া, পশ্চাতের চুল লম্বা রাখে—পুরুষেরা পশ্চাতের চুল ছোট করিয়া, সম্মুখে ঝুঁটি বাঁধিবার মত দীর্ঘ করিয়া রাখে। এবং ঘাস, পাতা, খড়, পালক, ছেঁড়া নেকড়া, কখনও বা ফুল, ইত্যাদি দ্বারা চুলের গহনা রচনা করে।

আপাকেদের দেশে, কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হইলে, ভ্রূ ও চোখের পক্ষ্মরাজি তুলিয়া ফেলে; উদ্দেশ্য, অধিক সুন্দর দেখাইবে। দেহের লালিত্য-সাধনের জন্য অঙ্গরাগ, ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করে। অঙ্গরাগের দুর্গন্ধে, সভ্য জাতির লোকে বহুদূর হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, সে গন্ধ তাহাদের ভাল লাগে। রুচিসম্বন্ধে কাহারও সহিত তর্ক করা বৃথা। কড়ি, ঝিণুক, মৃত জন্তুর হাড়, দাঁত, নখ, ছোট বড় পাথরের টুকরা, কাঠ, শুকনা ফল, ইত্যাদিই অলঙ্কারের প্রধান উপকরণ। নির্ম্মমভাবে নাক, কাণ ইত্যাদি বিধাইয়া, ইহারা উক্ত পদার্থ সকলের দ্বারা নির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ করে। হাতে, পায়ে, যেখানে যেরূপ মিলে, হাড়ের, পাথরের, স্থানে স্থানে লোহা পিতলের পর্য্যন্ত প্রচুর গহনা পরে। এক একটি কোল রমণী সাত, আট, কেহ বা দশ পনের সের পর্য্যন্ত ওজনের গহনা বহিয়া বেড়ায়। বিনা কষ্টে কি সুন্দর

হওয়া যায়? মুক্তার অভাবে কড়ির মালাই কণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করে। হস্ত, পদ, কণ্ঠ, নাসিকা এবং কর্ণের অলঙ্কার, আজ পর্য্যন্ত সভ্য জাতিদের মধ্যেও পুরুষদের মনোরঞ্জন করে। আমাদের দেশের সুন্দরীরা অবশ্য তাঁহাদের অসভ্য ভগিনীগণের গহনা সম্বন্ধে সুরুচির এ পর্য্যন্ত অনুমোদন করিবেন। কিন্তু, এক বিষয়ে তাহারা আমাদের সুন্দরীগণ অপেক্ষাও অগ্রগণ্য;—তাহাদের অধরের গহনা আছে। আমরা খালি-অধরই ভালবাসি; বড় জোর তাম্বুলরাগ পর্য্যন্ত সহ্য হয়, তার বেশী নয়। কিন্তু অসভ্য রমণীরা নাক কাণের ন্যায়, অধর বিদ্ধ করিয়া, তাহাতে বেশ ভারি রকমের গহনা পরে; গহনার ভারে অধর উল্টাইয়া পড়ে, মুখের দুই পার্শ্ব দিয়া অজস্রধারায় চিরমুখামৃত বর্ষণ হইতে থাকে। আবার নাসিকারন্ধ্র যত বৃহদায়তন হয়, অসভ্যদের চক্ষে ততই সুন্দর দেখায়। উক্ত সৌন্দর্য্য কৃত্রিম উপায়ে বাড়াইবার জন্য, নাসারন্ধ্র বড় বড় অস্থিখণ্ডের দ্বারা আরও অধিক বিস্ফারিত করিয়া রাখে। আমরা বিস্ফারিত নয়ন দেখিয়া মনের শান্তি হারাই, কিন্তু অসভ্যেরা কবিতা লিখিলে বিস্ফারিত নাসিকার কথাই উল্লেখ করিত, সন্দেহ নাই। উভয়েই সমান বুদ্ধির কাজ করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যের রুচির উপর কোনও কথা বলা সাজে না—অপরে জোর করিয়া তাহাদের রুচিসম্মত জিনিস আমাদের গিলাইয়া না দিলেই আমরা আনন্দিত থাকি। অসভ্যদের রুচিসম্বন্ধে কিছু অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়াও, বোধ হয়, এ কথা বলা যায় যে, সুন্দরীগণ কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির ইচ্ছা ত্যাগ করিলে, কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না। কারণ এ কথা সভ্যজাতিসম্বন্ধেও খাটে। এই অলঙ্কারের অত্যাচার হইতে নিস্তার পাইবার জন্য,

সকল দেশেই, নানা সময়ে রসজ্ঞ পুরুষগণ, "উদ্যান-লতা অপেক্ষা বনলতা শ্রেষ্ঠ"—"রূপসীগণ বিনা আভরণেই অধিকতর রমণীয় হ'ন"—"সুন্দরীর অলঙ্কারধারণে পুনরুক্তিদোষ দাঁড়াইয়া যায়", ইত্যাদি মিষ্ট কথায়, অলঙ্কারের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য-প্রিয় লোকমাত্রই চিরকাল এই কথা বলিবে। অলঙ্কার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি করে, ব্যবহার করিতে না জানিলে, সেইরূপ শ্রীহানি করে—কিন্তু প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্য্যের কোনও বালাই নাই, চিরদিনই সমান থাকে। যৌবন প্রত্যেক রমণীর অঙ্গেই পুষ্পের ন্যায় সম্নদ্ধ থাকে।

আষাঢ় ১২৯৮।

শিল্পীর সাধনা।

——:০:——

একান্ন বৎসর বয়সে ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ্ যখন সাতান্ন সংখ্যক বেগমের পাণি-পীড়ন করলেন, তখন—তখন কে জানত যে তাঁরই রাজপ্রাসাদে আরব্য উপন্যাসের নিছক রূপকথাগুলোর একটা এসে নিজের বাস্তবতা প্রমাণ করে' যাবে!

সে যাই হোক্। বাদশা নতুন বেগমের পাণি-পীড়ন করে' তাঁর হারেমে পুরলেন, এদিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরবারের আমীর ওমরাহ্‌দের মধ্যে কেমন করে' জানাজানি হয়ে গেল যে, নতুন বেগমের মত সুন্দরী ত্রিভুবনে নেই। অপ্সরী?—অপ্সরীরা ত সব চির-যৌবনা। যা চিরদিনের, যার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, যা স্থির, তা হাজার সুন্দর হোক কিন্তু তাতে মোহের অবসর নেই। ফুলগুলো ফুটে উঠে ঝরে' যায় বলেই ত ওর সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তের তরে নিবিড়তম হ'য়ে দেখা দেয়, সেই জন্যেই ওর মোহ অনন্ত কালের। নতুন বেগমের ভোম্‌রা রঙের রেশমী চুলের রাশ যে একদিন শণের নুড়ি হ'য়ে উঠবে—তার আঙুরের রসে ভিজান হিঙ্গুল রঙের ঠোঁট দুখানি যে একদিন শুকিয়ে চামড়ার মত হ'য়ে উঠবে—তাজা ফুলের মত গাল দুটো যে শুক্‌নো পাতার মত চুমড়ে যাবে—চোখের কোণ থেকে তড়িৎ ঢালাঢালি যে আর চলবে না—তার বুক যে আর দুলবে না, গ্রীবা যে আর হেলবে না, হৃদয় যে আর টলবে না—এই চিন্তাই যে

হুশেন শাহ্‌কে চতুর্গুণ মাতিয়ে তুলেছে। সুতরাং অপ্সরী?—না, নতুন বেগমের সঙ্গে অপ্সরীর তুলনাই হয় না। অপ্সরী ত নয়ই—মানব মানবীর মধ্যেও এমন রূপ আর কখনও সৃষ্ট হয় নি—আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা সে বিষয়ে বাদশা হুশেন শাহের ঘোর সন্দেহ।

কিন্তু আমীর ওমরাহ্‌দের মধ্যে নতুন বেগমের রূপের কথা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আপশোষের কথাও জেগে উঠল। এমন সুন্দরী যে নূতন বেগম—যার দেহে বিশ্বকর্ম্মা তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ছাপ অঙ্কিত করে' দিয়েছেন—যার তুল্য সুন্দরী সসাগরা পৃথিবীতে নেই, অমরাবতীতে নেই, গন্ধর্ব্বলোকে নেই—তেমন রূপ একদিনের জন্যেও কারো নয়নগোচর হবে না, এই হচ্ছে তাঁদের আপশোষের কথা। তাঁদের মধ্যে দু' একজনা দার্শনিক ওমরাহ্‌ তাঁদের লম্বা শুভ্র দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গালিচার বুনোনো রঙিন ময়ূর-গুলোকে নিরীক্ষণ করে' করে' বলতে লাগলেন—তা আসলে সৌন্দর্য্য জিনিসটা সকলের জন্যেই হওয়া উচিত—বিশেষত রূপ দেখলে রূপের কোনো ক্ষতি নেই অথচ দর্শকের মহা লাভ।

আমীর ওমরাহ্‌দের কানাকানি বাদশা হুশেন শাহের কানে পৌঁছিতে বড় বিশেষ বিলম্ব হ'ল না! হুশেন শাহ্‌ ছিলেন প্রজারঞ্জক রাজা। কাজেই আমীর ওমরাহ্‌দের এই আপশোষের কারণ দূর করবার জন্যে ইচ্ছা করলেন। তাই মনস্থ করলেন যে, নতুন বেগমের একখানি পূর্ণায়তন তস্‌বীর অঙ্কিত করিয়ে তাঁর আমদরবারের বিশাল কক্ষে মস্‌নদের পিছনে দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দেবেন। বাদশা মনে মনে এই ব্যবস্থা ঠিক করেই তাঁর প্রধান উজিরকে ডাকলেন—"ফজলু খাঁ।"

ফজলু খাঁ পামিরের মাথার উপরকার বরফের মত সাদা লম্বা দাড়ি হেলিয়ে এসে কুর্ণিস করে' দাঁড়াল—"জাঁহাপনা"—

বাদশা বললেন—"উজির, বর্ত্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে ?"

উজির হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর লম্বা দাড়ির মধ্যে চালাতে চালাতে স্মৃতিশক্তিটাকে উগ্র করে' নিয়ে উত্তর করলেন—"জাঁহাপনা, বর্ত্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হচ্ছে হিন্দুস্থানের কোশল রাজসভার চিত্রকর—নাম মৌকূল দেব।"

হিন্দুস্থানের নাম শুনে বাদশা মুহূর্ত্তের জন্যে চিন্তান্বিত হলেন—যেন তাঁর মনে কোন সংশয় উদিত হয়েছে ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন সে সংশয়ের একটা সমাধান করে' বললেন—"ফজুল খাঁ, কোশল রাজ-সভার চিত্রশিল্পী ইরাণ-তুরাণের বাদশার দরবারের তরফ থেকে ইস্পাহানে আমন্ত্রিত হোক।

ফজলু খাঁ তাঁর উষ্ণীষ হেলিয়ে কুর্ণিশ করে' বললেন—"প্রবল প্রতাপান্বিত সুজনের রক্ষক দুর্জ্জনের শাসক ইরাণ-তুরানের বাদশা হুশেন শাহের যে আজ্ঞা।"

তার পরদিন পূব গগনে ঊষাসুন্দরী যখন আপনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবেন কি করবেন না ভাবছিলেন, তখন ইস্পাহানের প্রশস্ত পাথর-বাঁধা রাজপথ কাঁপিয়ে বাদশার পাঞ্জাঙ্কিত পত্র নিয়ে তুরুক সোয়ার কাবুলের পথে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করল। দ্রুতগামী অশ্বখুরের খটাখট্ শব্দে নিদ্রিত নাগরিকেরা চকিত হ'য়ে উঠে বসল। বেলা হ'লে ইস্পাহানের বাজারে বাজারে রটে গেল যে,

হিন্দুস্থান থেকে চিত্রকর আসছে—নতুন বেগমের তসবীর আঁকবার জন্যে।

(২)

বাদশা আমীর ওমরাহ্‌দের নিয়ে তাঁর খাস দরবারে বসে' ছিলেন। ইরাণ-তুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তায়েজউদ্দিন সেদিন হেমন্ত-সন্ধ্যার মত করুণ কণ্ঠস্বরে বাদশা-সমীপে সুন্দরী তরুণীর অশ্রু-ভেজা ব্যথিত কালো আঁখি-তারার মত একটা নব রচিত গজল্ সারেঙ্গী সহযোগে গান করছিলেন। গজল্ বলছিল—"রূপোর দেয়ালী লেগেছে— এমনি নিবিড় জোছনা, যেন মনে হয় তা মুঠো বেঁধে দলা পাকিয়ে ঢিল ছোঁড়াছোঁড়ি খেলা যায়, শিশির-ভেজা পাতায় পাতায় জোছনা ছল্‌কে উঠে পিছলে পড়ছে—দূর এলবুরুজ পাহাড়-তলীর বুল্‌বুল্‌রা সব আর সেদিন ঘুমুতে যায় নি—তাদের গানের সুর ঘন জোছনার বুক চিরে চিরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এমনি রাতে নিঠুরা পিয়ারী বাহুর বাঁধন আল্‌গা করে' কাউকে কিছু না বলে' ক'য়ে কোন্ অজানার পথ ধরে' কোথায় চ'লে গেল—কোথায় গেল······"

'চারিদিক মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে—কালো কালো মেঘ, বিদ্যুৎ বুকে করা মেঘ। এলবুরুজ পাহাড়তলীর ময়ূরের দল পেখম তুলে নৃত্য করে' করে' তাদের কেকা রবে চারিদিক মুখর করে' তুলেছে। বারি ঝর্‌তে আরম্ভ করল,—ঝর্ ঝর্ ঝর্—বিরাম নেই বিরক্তি নেই—কত দিনকার কার অশ্রু—কোন্ অলকার কোন্ অপ্সরীর—এমনি বাদল-বুকের মধ্যে বসে' বসে' কে যে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—এমন দিন, তবুও পিয়ারী ফিরে এল না—কেন এল না············"

"পিয়ারী কেমন করে' ফিরবে—পিয়ারী যে পথ ধরে' গিয়েছে, সে ত ফেরবার পথ নয়—সে যে কেবল যাবারই পথ, সে-পথ—সে যে মরণের পথ........."

সারেঙ্গীর মিষ্টি সুরের সঙ্গে কবির মিষ্টি সুর মিলে গজলের ব্যথা-ভরা কাহিনী, বাদশার খাস দরবারের প্রশস্ত কক্ষের কোণে কোণে কোন্-হারিয়ে-যাওয়া কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। যে আমীর ওমরাহ্‌রা যুবক, তাদের কি একটা ব্যথার আনন্দে বুক ফুলে উঠল, টলে উঠল—বাদশার খুড়ো আশী বছর বয়সের বৃদ্ধ বৈরাম খাঁর পর্য্যন্ত কুয়াশা-ঢাকা চোখ দুটো ছল্‌ছল্ করে' উঠল। গান শেষ করে' কবি সারেঙ্গী ও ছড়টা গালিচার উপরে নামিয়ে রাখলেন—চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কেবল সদ্য সমাপ্ত গজলের সুর বাতাসের বুক চিরে আকাশের গায়ে গায়ে একটা রেশের চিহ্ন এঁকে দিয়ে দিয়ে দূর হতে দূরান্তরে চলে যেতে লাগল—মুহূর্ত্ত ধরে' যেন কারো নিশ্বাস প্রশ্বাসও পড়ছে না—এমনি নিবিড় নিস্তব্ধতা। তারপর দরবারের সবাই যেন হঠাৎ চমক ভেঙ্গে জেগে সমস্বরে বলে' উঠলেন—"ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ!"

বাদশা সস্মিত হাস্যে কবির দিকে ফিরে বললেন—"তায়েজ, তোমার কাব্য সাধনা, সঙ্গীত সাধনা, যন্ত্র সাধনা, সবই সার্থক!"

কবি তায়েজ তাঁর বিনম্র শির আরও নত করে' কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় উজির ফজলু খাঁ প্রবেশ করে' বাদশা-সমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, হিন্দুস্থান হ'তে কোশল-রাজসভার চিত্রশিল্পী মৌকুল দেব ইরাণ-তুরাণের বাদশা, দুর্বিলের রক্ষক দুর্জ্জনের শাসক প্রবল প্রতাপান্বিত হুশেন শাহের দরবারে হাজির।"

বাদশা বললেন—"তাকে এইখানে নিয়ে আসা হোক।"

উজির তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন, আবার পরক্ষণেই ফিরে এলেন—সবাই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল এক অতি সুন্দর তরুণ যুবক।

অতি সুন্দর তরুণ যুবক। তার চোখ দুটোতে যেন বিদ্যুতের রেখা টানা—কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে এসে তার বলিষ্ঠ স্কন্ধ ছেয়ে ফেলেছে—অতি চিক্কণ গোঁফের রেখার চিহ্ন তার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের ঘোষণা করছে—আঙুলগুলো যেন ছবির মত সুশ্রী—বাদশা বিস্ময় প্রকাশ করে' বললেন—"এই যুবক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ?"

যুবক তার মাথা অবনত করল, উজির ফজলু খাঁ উত্তর দিলেন—"হাঁ জাঁহাপনা।"

"এমনি তরুণ বয়সে!"

উজির উত্তর দিলেন—"জাঁহাপনা, প্রতিভাসুন্দরী তরুণের গলেই তাঁর বরমাল্য প্রদান করতে ভালবাসেন।"

বাদশা প্রসন্ন দৃষ্টিতে শিল্পীর দিকে ফিরে বললেন—"সুন্দর বিদেশী যুবক, চিত্রবিদ্যায় তোমার কতদূর পারদর্শিতা ?"

যুবক উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, কবি, চিত্রকর, গায়ক এদের পারদর্শিতার মাপযন্ত্র অন্যের কাছে। আমার যে কি রকম পারদর্শিতা তা আমি নিজে কেমন করে' বলব ? তবে আমার অঙ্কিত চিত্রে হিন্দুস্থানের অনেক নৃপতি অনুগ্রহ করে' সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।"

বাদশা বললেন—"শোন যুবক, ইসলাম-রমণী কোনদিন বিধর্ম্মী-পুরুষের কাছে তার মুখাবরণ উন্মোচন করবে না, শাস্ত্রের নিষেধ—না দেখে তুমি তার আলেখ্য অঙ্কিত করতে পারবে ?"

শিল্পী বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"না দেখে কি করে' ছবি আঁকা চলতে পারে জাঁহাপনা ?"

বাধা দিয়ে বাদশা জিজ্ঞাসার সুরে বললেন—"কেবল তার বর্ণনা শুনে।"

যুবক বললে—"এমন কবি কে আছে জাঁহাপনা যে শব্দ অর্থ ও সুর দিয়ে রক্তমাংস ও বর্ণকে এমনি করে' মূর্ত্তিমান করে' তুলতে পারে যা আবার রঙে ও তুলিতে পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে ?"

গৌরবান্বিত দৃষ্টিতে বাদশা উত্তর দিলেন—"বিদেশী যুবক! আছে, ইরাণ-তুরাণের শ্রেষ্ঠ কবি—তার কণ্ঠসুরে শরৎ-উষার উজ্জ্বল আকাশ সান্ধ্য গগনের মত ব্যথিত হ'য়ে ওঠে—হেমন্ত-সন্ধ্যার করুণ রাগিণী বসন্ত-উষার মত হাস্যময় হ'য়ে ওঠে—যার সারেঙ্গীর আলাপে প্রচণ্ড নিদাঘে বর্ষার শৈত্য আমন্ত্রন করে' আনে—শীতের শুভ্র মাটীতে সবুজ রঙ জাগিযে তোলে—যুবক তুমি নিজেই বিচার করবে"—বাদশা কবি তায়েজকে গান করতে আদেশ করলেন।

সারেঙ্গীর সুর জেগে উঠল—কিশোরী প্রিয়ার সলজ্জ চাউনির মত মিষ্টি, তার রেশমী চুলের স্পর্শের মত মোলায়েম—সে সুরের রেশ প্রিয়ার অঙ্গের স্পর্শেরই মত শ্রবণেন্দ্রিয়কে বুলিয়ে যায়।

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরি ?—রজনীর কালো আঁধারের মাঝে পুঞ্জ মেঘের বুক থেকে বিদ্যুৎ কেমন ঝিলিক্ হানে ?—তাই পিয়ারীর কালো চোখের চার পাশে সুরমা আঁকা পিয়ারীর কালো চোখের তারা সে মেঘ—চোখের পাতায়-আঁকা সুরমা সে রজনীর আঁধার—পিয়ারীর দৃষ্টি সে বিদ্যুৎ—সে-বিদ্যুৎ

কেমন উজ্জ্বল, কেমন নিবিড়, কেমন তীব্র—সুরমা আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরী ?”

“সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী। পিয়ারি যে চোখ দুটোতে সুরমা ঢেকে তার সারা দেহের আকাঙ্ক্ষা-রাশিকে গোপন করতে চায়—তার মনের শঙ্কা সঙ্কোচ সরম স্পষ্ট করে’ তুলতে চায়—তার চঞ্চল দৃষ্টিকে নিবিড় করতে চায়—তার হাস্যময় দৃষ্টিকে ব্যথা ভরা দেখতে চায়—সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী।”

গান থামল—রইল শুধু একটা সূচী-সূক্ষ্ম রেশের আধ-লুপ্ত আধ-সুপ্ত রণন্।

তরুণ চিত্রকর প্রশংসমান নেত্রে বললে—“ইরাণ-তুরাণের কবি, হিন্দুস্থানের চিত্রকরের অভিবাদন গ্রহণ করুন।” তার পর বাদশার দিকে ফিরে বললে—“জাঁহাপনা, কবি তায়েজের ক্ষমতা অসাধারণ। কবির সুরে সুরে আমার তুলি চলবে—তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের ছবি ফুটে উঠবে—তাঁর চোখ জেগে উঠবে—তাঁর বুক দুলে উঠবে—গণ্ডে তাঁর গোলাপ ফুটবে—হাতে তাঁর চাঁপার কলি জাগবে—পায়ে তাঁর রক্তকমল বিকশিত হবে—তাঁর ওড়্না উড়বে, বেণী দুলবে, ঘাগ্রা ঝুলবে; কিন্তু তাঁর আত্মার কথা আমি বলতে পারব না জাঁহাপনা। কবি তায়েজের সুরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের বাহিরকেই আমি দিতে পারব—জাঁহাপনা, তাঁর আত্মার সন্ধান আমি দিতে পারব না।”

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন—“কেন শিল্পী ?”

শিল্পী উত্তর দিলে—“জাঁহাপনা, আত্মা যে সাম্‌না সাম্‌নি দেখবার

জিনিষ—হাজার বর্ণনাতেও তার আসল পরিচয় নেই। শিল্পীর আত্মা দিয়ে নতুন বেগমের আত্মা স্পর্শ করতে না পারলে তার তুলির সঙ্গে তা কখনও ধরা পড়বে না। এ আত্মায় আত্মায় স্পর্শ অনুবাদের ভিতর দিয়ে হ'তে পারে না। জাঁহাপনা, আমি ছবি আঁকব; কিন্তু তাতে আত্মার সন্ধান করবেন না।"

বাদশা বলে' উঠলেন—"কিন্তু নতুন বেগমের যে দেহের চাইতে আত্মা সুন্দর—আত্মা সুন্দর বলেই ত তার দেহ সুন্দর—সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধু দেহের ছবি আঁকা—যেন গন্ধ বাদ দিয়ে গোলাপ ফোটান—নেশা বাদ দিয়ে মদ চোঁয়ান; কিন্তু বিধর্ম্মার কাছে ইস্‌লাম-রমণী কেমন করে' মুখ খুলবে?—উপায় কি?" বাদশা তাঁর দরবারের আমীর ওমরাহ্‌দের দিকে তাকিয়ে উজিরকে সম্বোধন করে বললেন—"ফজলু খাঁ, উপায় কি?"

ইরাণ সাম্রাজ্যের প্রধান উজির বিমনা হলেন। আমীর ওমরাহ্‌রা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। সভা নিস্তব্ধ—চারিদিকে একটুকু শব্দ নেই। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বৈরাম খাঁ তাঁর সুদীর্ঘ শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর তাঁর দীর্ঘোন্নত শরীর বেঁকিয়ে কুর্ণিস করে' বললেন—"জাঁহাপনা, উপায় আছে। নতুন বেগমকে বিধর্ম্মীর সাম্‌নে মুখ খুলতে হবে না—তা একখানি দর্পণের সামনে করলেই চলবে। সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত নতুন বেগমকে দেখলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য সফল হবে। শাস্ত্রও রক্ষা হবে—কর্ম্মও ঠেকা থাকবে না।"

বৈরাম খাঁর কথা শুনে সবার বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বাদশা প্রশংসমান নেত্রে খুল্লতাত বৈরাম খাঁর দিকে তাকিয়ে উজিরকে

লক্ষ্য করে বললেন—"ফজলু খাঁ, খুল্লতাত বৈরাম খাঁর যুক্তি গৃহীত হোক।"

দরবার ভাঙল। আমীর ওমরাহ্‌রা বৈরাম খাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ আবাসে ফিরলেন।

(৩)

দ্বারে দ্বারে পুরু রেশমি পরদা—তারি পাশে পাশে উলঙ্গ কৃপাণ হাতে যমদূতের মত কালো হাব্‌সী খোজা। এখানে বুঝি ক্ষুদ্র মধু-মক্ষিকাটিরও প্রবেশ করবার পথ নেই। এখানে বুঝি আর কোন শব্দ নেই, কেবল দুধের মত সাদা কঠিন পাথরের উপরে রক্ত কমলের মত রাঙা কোমল পা ফেলে চলে'-যাওয়া রূপসীদের নূপুর-নিক্কন, কেবল লিলায়িত তনুর ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে তাদের জঙ্ঘা-স্পর্শ-সুখে বিহ্বল ঘাগরার খস্ খস্ শব্দ, কেবল তাদের কৌতুক-উচ্ছ্বাস-উদ্দীপ্ত হাসির ছন্দময় গিটকিরি, কেবল কত কত উৎস হতে উচ্ছ্বসিত গোলাপজলের বিরতিহীন ঝর্ ঝর্ শব্দ। এখানে বুঝি আর কোন গন্ধ নেই—কেবল কত কত তরুণীদের নিশ্বাস-বিচ্ছুরিত সুরভি, কেবল তাদের সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ বেণী-কুণ্ডল হতে উৎসারিত স্বপ্নময় গন্ধাবলেপ, কেবল তাদের সারা অঙ্গ হতে উৎসৃষ্ট এক আবেশময় আভাস। এখানে বুঝি আর কোন রূপ নেই, কেবল সদ্য ফোটা গোলাপরাশির স্তবক, কেবল ফুল্ল প্রস্ফুটিত চম্পকদলের উগ্রতা। এখানে বুঝি আর কোন রস নেই, কেবল সাকির আপন-ভোলা বিফলতা, কেবল সিরাজির সকল-ভোলা মাদকতা। মানুষ জীবনকে ধরে' রাখতে পারে না, কিন্তু যৌবনকে ধরে' রাখতে চায়। এমনি বাদশার হারেম।

এখানে কত কত রূপসী তরুণীর কমল-চোখের কোমল দৃষ্টি কুয়াশায় ঢেকে গেল—কোমল মুখের কমল-হাসি শুকিয়ে উঠল—গ্রীবা আর হেল্‌ল না, বুক আর দুলল না, চরণ আর চল্‌ল না; কিন্তু শেষ নেই, আবার কত কত নব নব তরুণী এসে তাদের রূপ-যৌবন দিয়ে এখানটাকে ভরে' তুলল। বাদশা হুশেন শাহের কালো চুল শাদা হ'য়ে গেল, দন্তাভাবে গণ্ড শীর্ণ হয়ে পড়্‌ল, তড়িতাভাবে দৃষ্টি মলিন হয়ে উঠল; কিন্তু এখানটায় তাঁর রূপ-যৌবনের সম্পদ অব্যাহত। এমনি ইরাণ-তুরাণের বাদশার হারেম।

সেই হারেমে কত কত দ্বারে কত কত পরদা সরিয়ে কত কত কক্ষ অতিক্রম করে' কত কত হাবসী খোজার ক্রূর শার্দ্দূল-দৃষ্টির সামনে দিয়ে তরুণ শিল্পী বাদশা হুশেন শাহ্ ও উজির ফজলু খাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল। হারেমে বিদেশী বিধর্ম্মীর আভাস পেয়ে বেগমদের পোষা ময়ূরের দল একবার ভীষণ কেকারবে যেন তাদের আপত্তি জানিয়ে দিল। তার পর হারেমের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যাদুমন্ত্র বলে নিমেষে যেন একটা পুরু নিস্তব্ধতার গালিচা বিছিয়ে গেল। কত কত মরাল গতির ছন্দে ছন্দে শিঞ্জিনী নিক্বনার অর্দ্ধেক ফুটে আর অর্দ্ধ ফোটার আর অবসর পেলে না—কত কত হাসির গিটকিরি মাঝপথে এসে হঠাৎ চকিতে থেমে গেল—যেন সজীব যা যেখানে ছিল সব সেই সেইখানেই সেই অবস্থাতেই সহসা প্রস্তরের মত কঠিন হ'য়ে গেল—চারিদিকে কেবল নিস্তব্ধতা —সেই নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে কেবল গোলাপবারির ঝর্ ঝর্ শব্দ। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বাদশা শিল্পী ও উজিরকে নিয়ে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে প্রবেশ করলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে দেয়ালে-গাঁথা এক সুবৃহৎ দর্পণ—একটা ক্রুদ্ধ-চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ সাটিনের মাঝখানে জড়োয়া কাজের একটা প্রকাণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা পরদায় আগাগোড়া ঢাকা। বাদশা উজির ও শিল্পী তিন জনে এসে সেই দর্পণের সামনা সামনি কক্ষের অপর প্রান্তে দাঁড়ালেন। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদা সরে গেল। রত্নখচিত সিংহা-সনে উপবিষ্ট নতুন বেগমের প্রতিবিম্ব দর্পণের গায়ে ফুটে উঠল—

যেন মসী-লিপ্ত অমাবস্যার অন্ধকারের বিরাট গহ্বর হতে শরৎ পূর্ণিমার লক্ষ চাঁদ সহসা এককালে জেগে উঠল—যেন কঠিন রসহীন প্রাণহীন পাষাণের বুক চিরে এককালে-ফোটা বসোরার গোলাপ ফুটে উঠল—যেন ঘোর অমানিশায় পুঞ্জ মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের রেখা ফুটে অচঞ্চল হয়ে চারিদিক উদ্ভাসিত করে' রাখল—যেন—। বাদশা বললেন—"শিল্পী, এই তোমার আলেখ্য।"

বাদশা শিল্পীর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, বুঝলেন তাঁর কথা শিল্পীর কানে যায় নি—তার দৃষ্টি দর্পণে নিবদ্ধ—শিল্পী মন্ত্রমুগ্ধ—বাহ্যজগত তার কাছে লোপ পেয়েছে। বাদশার ঠোঁট দুখানিতে একটা তৃপ্তির, একটা গৌরবের, যেন একটা বিজয়ের নিঃশব্দ হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

শিল্পীর দৃষ্টিতে কি ছিল—দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির অবনত চোখ দুটি ধীরে ধীরে যেন মন্ত্রচালিত হ'য়ে উত্তোলিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধ শিল্পীর প্রতি নিবদ্ধ হল—সেই চোখ দুটিতে বিস্ময়ের একটা ক্ষণিক প্রভা যেন মুহূর্ত্তের জন্য খেলে গেল—তার পর আজীবন সংগোপিত অনন্ত গোপন আকাঙ্খা আকুলতার আড়াল থেকে দুটি তরুণ চোখ আর দুটি তরুণ চোখের সঙ্গে মিলিত হ'ল—দর্পণের মূর্ত্তি যেন তার রক্তে

রন্ধ্রে একটা পুলক নিয়ে কেঁপে উঠল—শিল্পীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ চারিয়ে গেল—তার পর নারীর দৃষ্টি অবনত হ'য়ে গেল—পুরুষের চোখে পলক পড়ল না। দর্পণের মসৃন গায়ের উপরে মনে হ'ল কে যেন সিঁদূর ঢেলে দিল। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদার দর্পণ ঢাকা পড়ল। শিল্পী চমক ভেঙ্গে জেগে উঠল —দেখলে চারিদিক যেন সন্ধ্যার মত মলিন হ'য়ে উঠেছে।

বাদশা বললেন—"শিল্পী—"

তরুণ যুবক সংযত স্বরে বললে—"জাঁহাপনা, আমি হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গের অনেক অনেক অন্তঃপুর-মহিলাদের দেখেছি, কিন্তু এমন রূপ কখনও আমার নয়নগোচর হয় নি।"

স্মিত হাস্যে বাদশা বললেন—"শিল্পী, যা চোখে দেখলে, তাই যদি চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলতে পার, তবে লক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রা তোমার পুরস্কার।"

শিল্পী উত্তর করলে —"জাঁহাপনা, আমাকে ছয় মাস সময় দিন। আর আমি চাই একটি নির্জ্জন নিভৃত স্থান, অতি নিভৃত, যেখানে বাইরের জগতের রাগ রঙ্গ হাসি অশ্রু আমার প্রাণে কোন ঢেউ-ই তুলবার স্বুযোগ পাবে না—যেখানে একান্ত ভাবে থাকবে আমি আর আমার আলেখ্য।"

বাদশা উজিরের দিকে ফিরে বললেন—"ফজলু, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হোক্।"

তিনজনে হারেম ত্যাগ করলেন।

আবার তরুণীদের কলকণ্ঠ ফুটে উঠল। তাদের পায়ে পায়ে কত কত লাস্য নিয়ে নূপুর নিক্কণ জেগে উঠল, তাদের হাস্যোচ্ছ্বাস কক্ষে

কক্ষে রণিত হ'য়ে উঠল; কিন্তু সেদিন সেই হারেমে একটি নিভৃত কক্ষে একটি তরুণীর অন্তরে অন্তরে একটা নবীন স্বপ্নের আভাসে যে একটা নব তন্ত্রী বাজতে লাগল, তার সঙ্গে সেই তুচ্ছ প্রতিদিনকার উদ্দেশ্যহীন হাসি-গানের কোনই মিল রইল না।

(৪)

সসাগরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সে, দেশ বিদেশে কোটী কোটী নর নারীর মুখে মুখে তার নাম ফিরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু সে নিজে এতদিন কোথায় ছিল? কোথায় আপন-ভোলা হ'য়ে ঘুরছিল? কি জীবন সে এতদিন যাপন করেছে? কি জীবন? কোন্ একান্ত বাইরে বাইরে সে তুলি আর রঙ নিয়ে কেবল কি এক তুচ্ছ খেলা করে' বেড়িয়েছে? শিল্পী সে, কিন্তু এই এতদিন তার কাছ থেকে জীবনের অমৃতের উৎস এমনি করে' গুপ্ত হয়েছিল যে, তার অস্তিত্বের সন্দেহমাত্র তার মনে জাগে নি! তার তুলির মুখে কত কত সুন্দরীর ভোমরা-কালো আঁখি-তারা বিশ্ব-বিমোহিনী দৃষ্টি নিয়ে জেগে উঠেছে, তার তুলির সোহাগে সোহাগে কত কত তরুণীর হৃদয়ের উপরে অঞ্চল-ঢাকা ভরা-বুক আধ আভাস নিয়ে মাথা তুলেছে, তার তুলির আদরে আদরে কত কত কমলের মত হাত চাঁপার কলির মত আঙুল নিয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু তার পিছনে কি ছিল? আজ যে সে জানে যে, তার পিছনে ছিল তার কেবল অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা। তার পিছনে ছিল না শিল্পী তার সবখানি নিয়ে, ছিল না শিল্পীর নিগূঢ় জীবনের নিবিড় চরম আনন্দের অনুভূতি, ছিল না শিল্পীর নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া। সে

কেমন করে' কাটিয়েছে, কেমন করে' !—এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে, এই বিরাট শূন্যতা নিয়ে—কেমন করে' সে এতদিন ছিল, কেবল এই রঙ তুলি ও চিত্রপটের বিরাট ব্যর্থতাভরা ব্যঙ্গ নিয়ে? হায়! তার নিগূঢ় আনন্দের উৎসটি এতদিন কে এমন করে' নিষ্ঠুর ভাবে তার অলক্ষ্য করে' রেখেছিল !

কিন্তু আজ তার কোন্ নিগূঢ় অন্তরের গোপন কক্ষে কোন্ একটা মণি-মুক্তা-খচিত বীণার স্বর্ণ-তারে কার অদৃশ্য অঙ্গুলির স্পর্শ পড়ল—সেই স্পর্শে যে সুর বেজে উঠল—সেই সুরে তার আজ একি হ'য়ে গেল! একি বেদনা, একি আনন্দ! তা ত আজ তার বুঝবারও ক্ষমতা নেই—আজ যে কেমন তার বেদনা আর আনন্দ একেবারে ছড়িয়ে গেছে, দুটোকে আর ত তার আলাদা করবার উপায় নেই—আজ যে কেমন তার মনে হচ্ছে, বেদনাও আনন্দ—আনন্দও বেদনা। মৌকূল, মৌকূল, এতদিন কোন্ মরুভূমির মধ্যে পিপাসা নিবারণের জন্যে ঘুরে ঘুরে মরছিলে !

ঐ যে নিগূঢ় গোপন বীণার তারে ঝঙ্কার—কি ঐশ্বর্য্যময় সে ঝঙ্কার—সেই ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে আজ এক নিমেষে সব নিবিড় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল—চোখে যে কিসের অঞ্জন লেগে গেল—এই ধরিত্রীর মাটিতে মাটিতে এত গান, এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য—এই যে মতিমঞ্জিল, ঐ যে তরুশ্রেণী, ঐ যে কুসুমকুঞ্জ, ঐ যে লতাবিজন - সব যেন কেমন উজ্জ্বল কেমন সজীব হ'য়ে উঠল। শিল্পী, শিল্পী, তুমি এতদিন কোন্ অন্ধ-করা অরণ্যে কেবল মুক্তির পথ খুঁজে মরছিলে !

দুটি তরুণ চোখ আর দুটি তরুণ চোখ—তাদের মিলনে এমনি

রহস্যের সৃষ্টি, এমনি অমৃতের উৎস, এমনি দিকে দিকে পুলক জেগে উঠল, আকাশে বাতাসে হিল্লোল খেলে গেল, জল স্থল রঙিন হয়ে উঠল!

সে আজ ছবি আঁকবে—নতুন বেগমের। নতুন বেগম! না—না—না—নতুন বেগম কে? তাকে ত সে তেমন করে' জানে না—তার সঙ্গে ত শিল্পীর কোনই পরিচয় হয় নি। না—না—সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয়—বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন-মনের মন্দিরের দেবী—যে কোমল স্পর্শে তার হৃদয়-বীণায় মোহন রাগিণী বাজিয়ে তুলেছে—তার দৃষ্টিসম্পাতে তার হৃদয়-পদ্ম প্রত্যেক দলটি নিয়ে ফুটে উঠেছে। না—না— সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয়—বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন হৃদয়-মন্দিরের প্রণয়িনী—যার গণ্ড কপোল কণ্ঠ শিল্পীর দৃষ্টিতে লাজ-লালিমার রক্তিমাভায় ছেয়ে গিয়েছে— যে শিল্পীর দৃষ্টি বিনিময়ে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুলক নিয়ে কেঁপে উঠেছে—না, সে বৃদ্ধ হুসেন শাহের নতুন বেগম নয়—সে যে চিরতারুণ্যের জীবন-মন্দিরে যুগযুগান্তরের সঙ্গিনী!

তারি, কেবল তারি ছবি সে আঁকবে? নতুন বেগম? নতুন বেগম?—নতুন বেগম বলে কেউ এই পৃথিবীতে নেই—নেই—নেই। নেই—এই ব্রহ্মাণ্ডে ইরাণ-তুরাণ বলে' কোন স্থান নেই—বাদশা হুশেন শাহ্‌ বলে' কোন ব্যক্তি নেই—তার হারেম বলে কোন কারাগার নেই—সেখানে নতুন বেগম বলে' কোন বন্দিনী নেই। আছে শুধু অনন্ত শূন্য অনন্ত অবসরের মাঝে দুটি তরুণ তরুণী, দুটি প্রেমিক

প্রেমিকা—আছে শুধু দুটি হৃদয়, চারটি আঁখি, একটি অনন্তকালের নিবিড় চুম্বন। এই আর কিছুই নয়।

কেবল তারই ছবি সে আঁকবে। যে-ছবি সে আঁকবে—কেবলই কি তুচ্ছ রঙ দিয়ে? তুচ্ছ রঙ দিয়ে! তার হৃদয় শোণিতের বিন্দুতে বিন্দুতে যে আলেখ্যের প্রত্যেক অণু পরমাণু প্রাণ পাবে—তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জেগে উঠবে, তার আত্মার স্পর্শে স্পর্শে তা চিত্রপটে ফুটে উঠবে—তুচ্ছ তুলি আর রঙ?—না।

শিল্পী এক মনে মতিমঞ্জিলে ছবি আঁকতে লাগল।

ধীরে ধীরে তার কাছে বাহ্যজগত লোপ পেয়ে গেল। মতিমঞ্জিল তার বিস্তীর্ণ উদ্যান—বিশাল তরুশ্রেণী—নিবিড় লতাবিতান, সব অদৃশ্য হ'য়ে গেল—রইল শুধু তার চোখের সামনে একটি তরুণীর মূর্ত্তি—কুন্তল যার নিবিড়, দৃষ্টি যার গভীর, বক্ষে যার ইঙ্গিত, কক্ষে যার সঙ্গীত, জঙ্ঘা যার বিরহ-কাতর, চরণ যার নিগড় বাঁধা।

শিল্পী এক মনে ছবি আঁকতে লাগল।

(৫)

দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল।

গোধূলির স্বর্ণে স্বর্ণে পশ্চিমাকাশে গৈরিক ওড়্না উড়িয়ে পূরবী রাগিণী বেজে উঠেছে—বাদশা হুশেন শাহ্ ফজলু খাঁকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিলে এসে উপস্থিত হলেন। শিল্পীকে বললেন—"শিল্পী, তোমার ছ'মাস শেষ।"

শিল্পী আভূমি প্রণত হ'য়ে উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, আলেখ্যও শেষ।"

বাদশা বললেন—"আজ হিন্দুস্থানের চিত্রকরের ক্ষমতা কতদূর, তার বিচার হবে শিল্পী।"

শিল্পী বিনম্র শিরে বহু কক্ষ অতিক্রম করে' বাদশা ও উজিরকে মতিমঞ্জিলের নিভৃততম অংশে একটি কক্ষে নিয়ে এল। গোধূলি লগ্নে কক্ষের মধ্যে আঁধার হ'য়ে এসেছে। শিল্পী রৌপ্য-দীপদানে দুটি দীপ জ্বালিয়ে তার চিত্রপটের দু'পাশে রক্ষা করল। চিত্রপটের উপরে পরদা ঢাকা।

পরদা-ঢাকা চিত্রপটের সামনে এসে বাদশা ও উজির দাঁড়ালেন। শিল্পী ধীরে ধীরে চিত্রপটের উপর থেকে পরদা সরিয়ে নিয়ে এক পাশে এসে দাঁড়াল।

বাদশার কোষের অসি ঝন্‌ঝন্‌ করে' বেজে উঠল, তাঁর হাতের আকর্ষণে খাপ থেকে তা অর্দ্ধেক বেরিয়ে এল। শিল্পী তৃপ্তির হাস্যে, শান্তস্বরে বললে—"জাঁহাপনা, এ আলেখ্য মাত্র।"

ইরাণ-তুরাণের বাদশা লজ্জিত হ'য়ে তরবারি আবার খাপে পুরলেন। কণ্ঠ হ'তে বহুমুল্য মণিহার খুলে শিল্পীর গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর বাদশা আর উজির দু'জনে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আলেখ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ ত রঙ দিয়ে আঁকা ছবি নয়—এ যে মূর্ত্তিমান রক্তমাংসের শরীর! কে বলবে নতুন বেগম আজ বাদশা হুশেন শাহের হারেমে—সে আজ মতিমঞ্জিলের একটি নিভৃত কক্ষে রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্টা!

প্রথম বিস্ময়ের কথঞ্চিৎ উপশমে বাদশা বললেন—"শিল্পী, তোমার শক্তি অলৌকিক, ঐশ্বরিক—লক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে পাঁচ লক্ষ তোমার পুরস্কার—হিন্দুস্থানের নৃপতিরা না বলে ইরাণ-তুরাণের

বাদশা গুণের আদর করতে জানে না! আর শিল্পী, কাল প্রাতে অনুচরবর্গ নিয়ে কোতোয়াল আসবে, আলেখ্য রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত করবার জন্যে—সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো। শিল্পী, তুমি নতুন বেগমের ছবি অাঁক নি, দ্বিতীয় নতুন বেগমের সৃষ্টি করেছ।"

বাদশা ও উজির মতিমঞ্জিল ত্যাগ করলেন।

ওঃ প্রলয়! মুহূর্ত্তের মধ্যে শিল্পীর পায়ের নীচেকার কক্ষতল প্রলয় ঘূর্ণনে ঘুরতে লাগল! কক্ষের আসবাব সব তার চোখের সুমুখে যেন মত্ত হ'য়ে নাচতে লাগল, চারিদিকের দেয়াল যেন দুলতে লাগল, দীপদানে দীপ যেন মরণাহত মানুষের হাসির মত বীভৎস হ'য়ে উঠল, শিল্পী টল্‌তে টল্‌তে চিত্রপটের সামনে মেঝের উপরে বসে পড়ল!

স্বপ্ন! স্বপ্ন! সব স্বপ্ন—আপনার চারিদিকে স্বপ্নের জাল বুনে এতদিন কি প্রবঞ্চনার মাঝেই না সে এই ছ'মাস কাটিয়েছে!—কোথায় সে? কে সে!—মিথ্যা—মিথ্যা—সব মিথ্যা। তার চাইতে অনেক বেশি সত্যি, লক্ষ কোটী গুণ সত্যি, ভয়ঙ্কররূপে সত্যি এই ইরাণ-তুরাণ, ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ্, হুশেন শাহের হারেম, আর সেই হারেমে বন্দিনী নতুন বেগম—সত্যি সত্যি, ওগো অতি সত্যি, নিষ্ঠুর ভাবে সত্যি, নির্ম্মম ভাবে সত্যি, মৃত্যুর মত সত্যি!

সেই হুশেন শাহের রাজপ্রাসাদে এই আলেখ্য স্থানান্তরিত হবে কাল—একটি মাত্র রজনীর অবসানে। এই আলেখ্য, যে আলেখ্যের প্রতি অণুতে অণুতে তার অস্তিত্ব বিছিয়ে আছে, যে আলেখ্য মাসে মাসে দিনে দিনে নিমেষে নিমেষে আপনার প্রত্যেক চিন্তাটি দিয়ে, প্রত্যেক বিশ্বাসটি দিয়ে, প্রত্যেক ইচ্ছাটি দিয়ে, প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষাটি

দিয়ে, সে জাগিয়ে তুলেছে—তাই একজনের একটি মাত্র কথায় চির-দিনের জন্যে তার কাছ থেকে অপসারিত হবে। বাদশার আম-দরবারে এই আলেখ্য ঝুলবে, লক্ষ লোকের চোখের তৃপ্তির জন্যে—তার জন্যে রইবে শুধু লক্ষ কণ্ঠে অজস্র বাহবা। শিরা হ'তে বিন্দু বিন্দু করে' রক্ত চুইয়ে বাহবা লাভ! না—না—চাই নে বাহবা, চাইনে লক্ষ দশ লক্ষ কোটী লক্ষ স্লুবর্ণ মুদ্রা, আমায় ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও কেবল এই আলেখ্যখানা!

বাতুল—বাতুল, এই আলেখ্য? ওরে শিল্পী, ওরে মূর্খ মৌকূল, কোথায় তোর মানসী কোথায়? এই আলেখ্য? তোর মানসী যে প্রত্যেক নিমেষটিতে বাদশা হুশেন শাহের অন্তঃপুরবাসিনী, সূর্য্যের আলোর পর্য্যন্ত যার মুখ দেখবার অধিকার নেই, এই আলেখ্য? জড়—জড়—কেবল রং আর রং আর রং—জড়—জড়—অতি জড়। জড়? না—না—কে বললে জড়। ওরে নাস্তিক - ঐ যে, ঐ যে বুক দুলুছে না কি? ঐ যে চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দু কাঁপছে, ঐ যে ঠোঁট দুখানি পাংশু হ'য়ে উঠল—জড়? নয়—নয় কিছুতেই নয়—ঐ যে দীর্ঘ নিশ্বাসে বুক দমে গেল—ঐ যে ঘাঘরার প্রান্তটা কেঁপে উঠল না কি? পাগল—পাগল—এ যে একেবারেই জড়—শক্তিহীন, গতিহীন, ইচ্ছাহীন!

শিল্পী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সেই কক্ষতলে বসে আলেখ্যের দিকে অনিমেষ চোখে চেয়ে রইল। ঐ ঠোঁট দুখানি যদি একবার—কেবল একবার মাত্র নড়ে' ওঠে, একবার মাত্র ডাকে—"শিল্পী"। ঐ চোখের তারা দুটি যদি কেবল একটিমাত্র নিমেষের জন্যে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, যদি—যদি—যদি—আঃ কি নিষ্ঠুর শাণিত তরবারির একটুকু স্পর্শে

তার সূক্ষ্ম কোমল স্বপ্নের জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, হাওয়ায় মিশিয়ে গেল। শিল্পী নিস্তব্ধ হ'য়ে বসেই রইল—দণ্ডের পর দণ্ড কেটে যেতে লাগল, সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে নিবিড় কালো হ'য়ে উঠল, মতিমঞ্জিলের বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীর ডাক সব নীরব হ'য়ে গেল, দণ্ডে দণ্ডে প্রহর কাটতে লাগল, শিল্পী ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে ধীরে ধীরে কখন্ নিদ্রাভিভূত হ'য়ে গালিচার উপরে টলে পড়ল তা জানলও না।

* * * *

এদিকে মধ্যরজনীর নীরবতাকে মুখরতায় ভরিয়ে দিয়ে বাদশা হুশেন শাহ্‌র হারেমে মহা উৎসব চল্‌ছে। সহস্র দীপালোকে রাত্রির অন্ধকার দূর করছে, অথচ তা দিনের একান্ত স্পষ্টতায় কোন দিকেই সমাপ্তি টানে নি—সবই যেমন রহস্যময়, আভাসময়, ইঙ্গিতময়। বেলোয়ারী ঝাড়ের ঠুন্‌টান্, বলয় কঙ্কনের ঠিনি ঠিনি, নূপুর নিক্কনের রিনি-ঝিনি। কত কত রূপসী তরুণী হীরে মণি মুক্তা জহরতে ভূষিত। প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে দীপ-রশ্মিস্পর্শে তাদের আর সারা দেহ হ'তে যেন তারার টুক্‌রো ছিটিয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। তাদের নিবিড় কালো আঁখিতারা হ'তে অবিরাম ক্ষরিত হচ্ছে অমৃত ও হলাহল, জীবন ও মৃত্যু—ঐ যে দেখা যায় তাদের আবেশবিহ্বল আঁখি পাতে পাতে অঙ্কিত অমরার সিংহাসন আর গভীর গহন রসাতলের বিরাট গহ্বর।

অসংখ্য তরুণী রূপসী তাদের রূপের ডালি নিয়ে, চটুল চাহনি নিয়ে, হাসির তরঙ্গ তুলে, উঠছে, বসছে, ঘুরছে, ফিরছে, চলছে। এই তরুণীদের মেলার মধ্যে বৃদ্ধ হুশেন শাহ্।

কি নিষ্ঠুর উৎসব! কি নির্ম্মম এই অসংখ্য তরুণীদের একটি বৃদ্ধকে ঘিরে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ আহ্লাদের সমাপ্তি! না জানি ঐ চটুল চাহনীর পিছনে কত শত দীর্ঘ নিশ্বাস সংগোপিত, ঐ হাল্‌কা হাসির পশ্চাতে কত কত হতাশার গুরুভার অটুট, কত কত জীবনের ব্যর্থতা, ঐ উৎসব রজনীর পশ্চাতে আপনার কড়া ক্রান্তির হিসেব টেনে চলেছে! প্রবল প্রতাপশালী হুশেন শাহ্, ঐ বিরাট ব্যর্থতার বিনিময়ে কিছু দান করবার ক্ষমতা তোমার হাতে নেই

নতুন বেগম গান গাচ্ছিল—কি করুণ কি কোমল সে সুর! যেন তার আঁখির পাতে বিশ্বের অশ্রুরাশি থম্‌কে যাচ্ছে, যেন তার ঠোঁটের কোণে সারা জগতের বিষাদ গুম্‌রে মরছে, আর তার কণ্ঠস্বরে কি মিষ্টি বীণার তানেই অশ্রুসাগর উথলে উঠছে!

"ওগো অচেনা, তুমি এমনি পরিচিত—এতদিন তবে কোথায় ছিলে? যখন প্রথম বুল্‌বুল্ ডেকেছিল, যখন প্রথম সিরাজির স্পর্শ স্নায়ুতে স্নায়ুতে চারিয়ে গিয়েছিল, যেদিন প্রথম দিগন্তের কোণে কোণে চোখ দুটি তোমার সন্ধানে ফিরছিল, সেদিন তুমি কোথায় ছিলে—কোথায় ছিলে?—"

"বুল্‌বুল্‌কে খাঁচায় পুরে দিলে, সিরাজি জহরত-মণ্ডিত পিয়ালায় রক্ষিত হ'ল, চোখের সাম্‌নে আঁধার নেমে এল, অচেনা তুমি আজ কেমন করে' কোথায় থেকে এলে?—"

"ওগো পরিচিত—কেবলই জল ঝরবে, মেঘ থেকে কেবলই জল ঝরবে, জোছনা আর খেলবে না, ফুল আর ফুটবে না, বুল্‌বুল্ আর ডাকবে না, ওগো তুমি চির-পরিচিত—

"ওঃ"—গান আর শেষ হ'ল না। সহসা নতুন বেগম দু-হাতে বুক চেপে গালিচার উপরে লুটিয়ে পড়ল, তার মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেছে, চোখের তড়িৎ মলিন হয়ে গেছে।

বাদশা হুশেন শাহ্ চক্ষের পলকে এসে লুণ্ঠিতা নতুন বেগমের পার্শ্বে নতজানু হ'য়ে বসলেন—দেখলেন নতুন বেগম অতি কষ্টে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। বাদশা শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন—"পিয়ারী, পিয়ারী—"

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অতি কষ্টে নতুন বেগম উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, বাঁদীর পোস্তাকি মাপ করবেন। বুকের ভিতরটা হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন কে চেপে চেপে ধরছে—" বেগমের শ্বাস ফুরিয়ে এল, আর কিছু ফুটল না।

তৎক্ষণাৎ বাঁদীরা ধরাধরি করে' নতুন বেগমকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেল, শয্যায় শায়িত করে' দিলে, প্রতি মুহূর্ত্তে তার শ্বাসকষ্ট উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে লাগল। হাকিমের জন্যে লোক প্রেরিত হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন বেগমের যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের কতকটা উপশম হ'ল, তার মুখ থেকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণার চিহ্ন দূরীভূত হ'য়ে গেল, শান্তির নিশ্বাস ফেলে নতুন বেগম ধীরে ধীরে চোখ দুটি নিমীলিত করল, ধীরে ধীরে তার রঙিন্ ঠোঁটে রঙিনতর একটা হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

হাকিম এলেন, নিদ্রিতা নতুন বেগমের নাড়ী স্পর্শ করলেন, একটা বিস্ময়ের ক্ষণিক আভা তাঁর চোখ দুটোতে খেলে গেল, আত্মসম্বরণ করে' তিনি আবার দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে নাড়ী অনুভব করলেন, তারপর ধীরে ধীরে হাতখানিকে শয্যায় নামিয়ে রাখলেন। গম্ভীর কণ্ঠে

হুশেন শাহের দিকে ফিরে বললেন—"ইরাণ-তুরাণের প্রবল পরাক্রান্ত বাদশা জাঁহাপনা, নতুন বেগম এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে' বেহেস্তের পথে যাত্রা করেছেন।"

বাদশার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

* * * *

শিল্পী স্বপ্ন দেখছিল। হিমাদ্রির কোন্ গহন গভীর নির্জ্জন গুহায় একমনে সে আপনার মানসীর ছবি আঁকছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সে অনাহারে অনিদ্রায় ছবি আঁকছিল। সহস্র বৎসর পরে তার ছবি আঁকা শেষ হ'ল। তখন শিল্পী সভয়ে দেখলে, এ ত আর কেউ নয়—এ যে নতুন বেগম। দেখতে দেখতে গিরিগুহা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে মতিমঞ্জিল হ'য়ে গেল। হতাশায় শিল্পী তার অঙ্কিত আলেখ্যের সাম্‌নে লুটিয়ে পড়ল।

সহসা শিল্পী দেখলে ছবিতে আঁকা ওড়না যেন একটু কেঁপে উঠল, আলেখ্যের চোখের পাতা মিট্‌মিট্ করে' উঠল, চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, ধীরে ধীরে আঁকা মানসী-মূর্ত্তি চিত্রপট থেকে কক্ষতলে নেমে পড়ল, তার কানে এসে বাজল—"শিল্পী—"

শিল্পী ঘুম থেকে চমকে উঠল, জেগে দেখলে, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক তরুণী স্তিমিত থেকে তার মুখ দেখলে, ভয়ে বিস্ময়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—"নতুন বেগম!"

স্বপ্নময়ী বললে—"শিল্পী, নতুন বেগম মরেছে, আমি তোমার প্রণয়িনী, এস—রাত আর বেশি নেই—"

নিমেষে শিল্পীর ঘুমের ঘোর কেটে গেল—তার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু জাগ্রত হ'য়ে উঠল, তার শিরায় শিরায় তড়িৎ চারিয়ে গেল। এত স্বপ্ন নয়—এ যে সত্যি—অতি সত্যি। তৎক্ষণাৎ তরুণ যুবক উঠে দাঁড়াল, তরুণীর হাত ধরে' বাইরে বেরিয়ে এলো। রজনীর শেষ শুকতারা পূব গগনে জ্বল্-জ্বল্ করছিল। সেই শুকতারার আলোকে আলোকে প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে' দূর দিগন্তে কোথায় মিশিয়ে গেল।

(৬)

মানুষের হাজার শোক হোক্ রাজার রাজকার্য্য বন্ধ থাকে না। পরদিন বাদশা হুশেন শাহ্ কোতোয়ালকে মতিমঞ্জিল থেকে নতুন বেগমের তস্বীর আনবার জন্য পাঠালেন। কোতোয়াল অনুচরবর্গ নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশ্যে চললেন। যথাসময়ে ফিরে এসে বাদশা-সমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।"

বাদশা বিস্মিত হলেন, উজিরকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এসে দেখলেন শিল্পী অদৃশ্য। শিল্পী যে কক্ষে ছবি আঁকছিল সেই কক্ষে দুজনে প্রবেশ করলেন। দেখলেন কেউ কোথাও নেই। আপনার স্থানে পরদা-ঢাকা চিত্রপট—তার দুপাশে রজতাধারে তৈলহীন প্রদীপ দুটিতে সলৃতের ভস্মাবশেষ।

বাদশা চিত্রপট দেখে হৃষ্ট হলেন। বললেন—"উজির, চিত্রকর না থাক, চিত্রপট রয়েছে—তাই আমাদের যথেষ্ট। চিত্রকর যদি

পুরস্কার প্রত্যাশা না করে সে দোষ ইরাণ-তুরাণের বাদশার নয়—" বলতে বলতে তিনি চিত্রপটের পরদা অপসারিত করলেন।

বাদশার মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে গেল। দু'জনে মন্ত্র-মুগ্ধের মত ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রপটে রত্নখচিত সিংহাসন যেমন আঁকা ছিল তেমনি আছে; কিন্তু তার উপরকার নতুন বেগমের চিহ্নমাত্র নেই।

রত্নসিংহাসনের রত্নগুলো যেন প্রাণ পেয়ে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অভিভাষণ।*

—:o:—

এই রঙ্গপুর সহরে আমি পূর্ব্বে একবার আসি সভাপতির আসন ত্যাগ করতে, সেই সহরে আমাকে যে আর একবার আসতে হবে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে, একথা সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

আজ থেকে চার বৎসর পূর্ব্বে, যে সভায় নূতন সভাপতিকে বরণ করে নেবার জন্য আমাকে রঙ্গপুরে উপস্থিত হতে হয়েছিল, সে সভার আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য। অপরপক্ষে আজকের সভার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, ইংরাজিতে যাকে বলে পলিটিক্স। আমি "রাজনীতি"র পরিবর্ত্তে পলিটিক্স শব্দ ব্যবহার করছি এই কারণে যে, পলিটিক্স বলতে শুধু রাজার নয়, প্রজার কথাও বোঝায়। আর যতদূর জানি, এ সভার কর্ত্তাব্যক্তিদের ইচ্ছা যে, আজ রাজার অবিচারের ও রাজার অত্যাচারের কথাটা মুলতবি রেখে, প্রজার অধিকারের ও প্রজার কর্ত্তব্যের বিষয়ই আলোচনা করা হয়।

আমি এই বলে সুরু করেছি যে, একদিন আমাকে এরূপ সভার যে নায়ক হতে হবে, একথা সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এর কারণ দেশের কোনো সম্প্রদায় যে আমাকে পলিটিক্সের কোনো আসরে টেনে

---

* উত্তর-বঙ্গ রায়ত কন্‌ফারেন্সের রঙ্গপুর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। সঃ সঃ

নামাবেন, এবং সেই সঙ্গে সে আসরের মূল-গায়েন করবেন, এ দুরাশা সেকালে আমার মনে স্থান পায় নি।

পলিটিসিয়ানরা জানতেন যে আমি লিখি ছোট গল্প, আর তার চাইতেও ছোট, অর্থাৎ—চৌদ্দপেয়ে কবিতা, আর সেই সঙ্গে লিখি বড় বড় প্রবন্ধ। সে সব প্রবন্ধ এত লম্বা যে, তা পড়বার অবসর কাজের লোকের নেই, ধৈর্য্য বাজে লোকের নেই, উপরন্তু সে সব প্রবন্ধের ভাষা এত সহজ যে, পণ্ডিত লোকের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব। এই সব লেখাপড়ার ফলে, এ খ্যাতিও আমি অর্জ্জন করি যে, পলিটিক্স সম্বন্ধে আমি নির্লিপ্ত ও উদাসীন। মনের দেশে এই বিপথে যাওয়ার দরুণ বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকে আমার উপর ব্যাজারও হয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস যে, আমি যদি বাঙলায় সাহিত্য রচনা করবার বৃথা চেষ্টা না করে ইংরাজিতে পলিটিক্স লিখতুম, তাহলে একটা কাজের মত কাজ করতে পারতুম। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি যে, একটি জেলেনি জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে দেখে দুঃখ করে বলেছিল যে, "হায়! এত বড় জোয়ানটা পুঁথি পড়ে সারা হল, মাছ ধরলে কাজে লাগত"। অনেকের ধারণা যে, আমিও পুঁথি পড়ে সারা হয়েছি; এ অনুমান সত্য হোক আর না হোক, একথা সত্য যে, পলিটিক্সের বহতা জলে আর পাঁচ জনের মত আমিও বহুবার নেমেছি—তবে সেখানে কখনো মাছ ধরতে চেষ্টা করি নি।

এই সব কারণে আপনারা আমাকে আজ যে আসন দিয়েছেন, তাতে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। কথা কওয়া যাদের জীবনের প্রধান কাজ, অনুকূল শ্রোতালাভের বাড়া সৌভাগ্য তাদের আর কি হতে পারে!

(২)

আপনাদের নিমন্ত্রণ আমি সাদরে গ্রহণ করলেও, স্বচ্ছন্দ চিত্তে করি নি। সত্য কথা বলতে গেলে, এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে অবধি আমার মনে সোয়াস্তি নেই। কেন যে নেই, তার কারণ আপনাদের কাছে নিবেদন করছি।

প্রথমত, আমি জানি যে, এ রকম সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করবার আমি ঠিক যোগ্যপাত্র নই। বক্তৃতা করা আমার ব্যবসায় নয়। এ বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করবার পক্ষে আমার স্বভাব ও অভ্যাস দুইই প্রতিকূল। কথকতা করবার জন্য ভগবদ্দত্ত গলা থাকা চাই—তা সে কথকতার বিষয় মহাভারতই হোক আর নব ভারতই হোক। ভগবান আমাকে কথকের গলা দেন নি। তারপর স্বভাবের ত্রুটি আমি অভ্যাসের বলে শুধরে নিতে চেষ্টা করি নি। বক্তৃতার আসরে আমি কস্মিনকালেও গলা সাধি নি। লেখককে বক্তার উচ্চ মঞ্চে দাঁড় করানো, বৈঠকী গাইয়েকে নগর সংকীর্ত্তনে যোগ দেওয়ানোর সামিল। যে গলা দু'-চার জনকে শোনাবার জন্য তৈরি করা হয়েছে, সে গলা দু'-চার হাজার লোককে কি করে শোনানো যায়? এ প্রভেদ শুধু স্বরের নয়—সুরেরও। লেখকেরা তাঁদের ভাষা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করতে চান, সুরেলা করতে চান তার উপর যদি পারেন ত মাঝে মাঝে এত মৃদু মীড় লাগান, যা সকলের শ্রুতিগোচর হয় না। অতএব এ জাতের লোকের পক্ষে তারায় গলা চড়িয়ে সেই পঞ্চম সুর ধরা অসম্ভব, যা শুনে লোকের দশা ধরবে। আর সে বক্তৃতা করায় লাভ কি যা শুনে মানুষ ক্ষেপে না ওঠে? আমি কিন্তু আমার ক্ষমতার সীমা জানি। অনেককে ক্ষেপানো ত দূরের কথা, কাউকেও

আমি প্রাণপণ চেষ্টাতেও উত্তেজিত করে তুলতে পারি নে। বরং অনেকে বলেন যে, আমার কথা তাঁদের জলন্ত উৎসাহে বরফ জল ঢেলে দেয়। কথা আমি অভ্যেস করেছি, ধীরভাবে—বল্‌তে ধীরভাবে নয়, স্পষ্টকরে জড়িয়ে নয়, সংক্ষিপ্ত করে ফলাও করে নয়, সাদাভাবে রঙ চড়িয়ে নয়, শ্রোতার বন্ধু হিসেবে, গুরু হিসেবে নয়। তা ছাড়া আমার কথার আর একটি গুণ অথবা দোষ আছে, যা—লোক মাতানোর পক্ষে প্রতিকূল। লোকে বলে আমার গল্প ও কবিতার মধ্যে পলিটিক্‌সের ভেজাল আছে। হয়ত তা আছে, কিন্তু এ সত্য সর্ব্বলোক বিদিত যে আমার পলিটিক্সের গায়ে কবিত্ব ও উপন্যাসের গন্ধমাত্রও নেই। অতএব আমার মতামত প্রচারের যোগ্য নয়, বিচারের যোগ্য।

(৩)

কিন্তু আসলে যা নিয়ে আমি সঙ্কটে পড়েছি, সে হচ্ছে ভাষা। পূর্ব্ব হতে শুনে আসছি যে, এ সভায় এমন বহুলোক উপস্থিত থাকবে যারা ইংরাজি জানে না। আমার কথা তারা বুঝবে কি না—সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। আমি অবশ্য বাঙলা বলছি কিন্তু এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাঙলা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের জানা-ভাষা নয়।—আমরা কই বাঙলা কথা কিন্তু তার মানে হয় ইংরাজি নয় সংস্কৃত। আমাদের জ্ঞান না হতে আমাদের শিক্ষা স্থুরু হয় আর অর্দ্ধেক জীবন শেষ না হতে সে শিক্ষার শেষ হয় না। জীবনের এই অর্দ্ধেক দিন আমরা শিক্ষা লাভ করি, একদিকে ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজি শাস্ত্রে আর একদিকে সংস্কৃত ভাষা

ও সংস্কৃত শাস্ত্রে। এ শিক্ষার ভিতর অবশ্য ইংরাজির ভাগ পোনেরো আনা আর সংস্কৃতের খাদ এক আনা। ফলে আমাদের মনোভাব প্রায় সবই ইংরাজি। কাজেই আমরা যখন বাঙলা বলি কিম্বা লিখি তখন আমরা জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক, ইংরাজিরই তরজমা করি। আমাদের মধ্যে ভাষার বিষয় যাঁরা সতর্ক, তাঁরা কথায় কথায় ইংরাজি ভাষার অনুবাদ না করলেও, কথায় কথায় ইংরাজি ভাবের অনুসরণ করেন, আমাদের বাঙলার পুরো অর্থ শুধু তাঁরাই বুঝতে পারেন, যাঁদের ইংরাজি ভাষা ইংরাজি শাস্ত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচয় আছে।

সকল দেশেই, যুগ বিশেষে, নতুন ভাব নতুন জ্ঞান প্রথমে উচ্চ-শ্রেণীর লোকের মনে হয় জন্মলাভ নয় স্থানলাভ করে। তার পরে সেই নতুন জ্ঞান নতুন ভাব কালক্রমে সমগ্র জাতির মনে চারিয়ে যায়। যে সব মনোভাব নিয়ে আমরা লেখাপড়ার কারবার করি, সে সকল যে অদ্যাবধি সর্ব্ব-সাধারণের সম্পত্তি হয়ে ওঠে নি তার কারণ ও-সকল ভাব আমাদের মনেও এখনো পুরো বসে যায় নি। আমাদের নবলব্ধ জ্ঞান হয় অতি দূরদেশের, নয়, অতি দূরকালের সামগ্রী। তার পর সে জ্ঞানও আমাদের আয়ত্ব করতে হয় একটি বিদেশী ভাষা, নয় একটি মৃতভাষার সাহায্যে। এ শিক্ষার ফলে আমাদের মুখের কথা—পুরোপুরি আমাদের মনের কথা হয়ে ওঠে না। যে বস্তু আমাদের সম্পূর্ণ আপনার হয়ে ওঠে নি, তা আমরা পরকে দান করব কি করে?

তা ছাড়া—এ শিক্ষা আমাদের মনের দেশে একটি নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের সঙ্গে বিলেতি শাস্ত্রের মিল ত নেই-ই বরং অনেক ক্ষেত্রে ঘোরতর বিরোধ আছে। ফলে আমাদের মনে সেকেলে ও একেলে, দেশী ও বিলেতি ভাবের ঠেলাঠেলি গুতোগুতি

চলছে। আমরা ঠিক করে উঠতে পারি নে, এ দু পক্ষের ভিতর কোন্ পক্ষের জয় হওয়া উচিত, উভয়ের মিলন করাও আমাদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব। এ অবস্থায় মনের শান্তির জন্য আমরা আমাদের মনকে এ দু-পক্ষের ভিতর ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছি। মনের যে ভাগের ইহলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ, সে অংশ এখন ইংরাজির দখলে আর যে ভাগের পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ, সে অংশ সংস্কৃতের দখলে। এ পৃথিবীতে বেঁচেবর্ত্তে থাকবার জন্য, বড় হবার জন্য, মানুষ হবার জন্য, যে সব বিষয়ের দরকার, সে বিষয়ে আমরা যখন কথা বলি, তখন সে সকল কথার মানে দেখতে হয়, ইংরাজি সাহিত্যে, আর মৃত্যুর পর আমাদের আত্মার কি গতি হবে, সে বিষয়ে আমরা যখন কথা কই, তখন সে কথার মানে দেখতে হয় সংস্কৃত শাস্ত্রে।

রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প বাণিজ্য, এমন কি স্বদেশ, স্বজাতি, স্বরাজ্য প্রভৃতি শব্দ আমাদের কানে আসামাত্র তার ইংরাজি অর্থ আমাদের মনে উদয় হয়, যে অর্থ অশিক্ষিত লোকের জানা নেই। অপর পক্ষে আমরা যখন মৃত্যুর অপর পারে লভ্য সালোক্য, সাযুজ্য, কৈবল্য, নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রভৃতি কথা উচ্চারণ করি, তখন আমাদের মনশ্চক্ষুর সুমুখে এসে দাঁড়ায় সংস্কৃত দর্শন। স্বর্গ আর এখন আমাদের মাথার উপরে নেই, নরকও পায়ের নীচে নেই। যদি কেউ বলেন—ও-দুটি গেল কোথায়, তার উত্তর—আমাদের বিশ্বাস ঐ দু'য়ে মিলেমিশে যা সৃষ্টি হয়েছে, তারি নাম দুনিয়া।

আমি একদিন একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ লাভ করে যুগপৎ অবাক ও নির্ব্বাক হয়ে যাই। তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিল ইংরাজি সাজ, পায়ে বুট, পরণে পেণ্টলুন, গায়ে বুকভাঙ্গা কোট, গলায় ফিতে-

বাঁধা কলার, মাথায় হ্যাট ; কিন্তু তাঁর কপালে প্যাটপ্যাট করছিল, আধুলী প্রমাণ একটি হোমের ফোঁটা, আর তাঁর হ্যাটের নীচে থেকে উঁকি মারছিল বিঘৎ প্রমাণ একটি টিকি। তাঁকে দেখবামাত্র আমার মনে হল, এই মূর্ত্তিটিই হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের প্রতিমূর্ত্তি। বলাবাহুল্য যে, অশিক্ষিত ভারতবাসীর মনের এ চেহারা নয়—সে মূর্ত্তি হচ্ছে অর্দ্ধনগ্ন।

এ বিষয়ে এত কথা বলবার আমার উদ্দেশ্য, এই সত্যটি খাড়া করা যে, এই শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মধ্যে একটা নতুন জাতি-ভেদের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষিত বাঙালী একজাত, অশিক্ষিত বাঙালী আলাদা। এ দুয়ের মনের ভিতর কোনরূপ জ্ঞাতিত্ব কিম্বা কুটুম্বিতা নেই, যে জ্ঞাতিত্ব যে কুটুম্বিতা ইংরাজ আসবার পূর্ব্বে এদেশে উচ্চ-নীচ সকলের ভিতর ছিল। আজ থেকে একশ' বছর আগে আমাদের পরস্পরের শিক্ষা দীক্ষার ভিতর এমন কোন প্রভেদ ছিল না যে, আমাদের প্রপিতামহদের কথা তোমাদের প্রপিতামহেরা বুঝতে পারতেন না। সেকালে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের ভিতর অবস্থার যাই ইতর বিশেষ থাকুক, পরস্পরের মনের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। মানুষের আশা আশঙ্কা, ভয় ভাবনা, হিতাহিত জ্ঞান, ধর্ম্ম কর্ম্ম—এ সব বিষয়ের মতামত সেকালে উচ্চ নীচ সকল লোকের এজমালী সম্পত্তি ছিল। আর আজকের দিনে আমাদের মন বিলেতি ভাবের আকাশে ঘুড়ির মত খানিকটা উঠে লাট খাচ্ছে অপর পক্ষে জনসাধারণের মন যেখানে ছিল সেখানেও নেই, একমাত্র নিজের অন্নবস্ত্রের চিন্তার মধ্যে ডুবে তলিয়ে গেছে। কেননা তাদের মনকে একমাত্র সাংসারিক ভাবনার উপরে তুলে রাখবার সূত্রটি আজ ছিন্ন

হয়েছে। উচ্চশ্রেণীর লোকের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকের মনের প্রভেদ আজকের দিনে বাস্তবিকই আকাশ পাতাল। ফলে এদেশে জনসাধারণ বলে যে একটা প্রকাণ্ড সম্প্রদায় আছে সেকথা আমরা একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম।

(৪)

আমার এ কথা মোটেই অত্যুক্তি নয়।

ভুলে যে গিয়েছিলুম তার কারণ ভোলবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যা মনে করে রাখবার প্রয়োজন নেই মানুষে সহজেই তা ভুলে যায়। শুধু শিক্ষায় নয় জীবনেও আমরা নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে পৃথক হয়েছি এবং সেও অবস্থার গুণে।

আমরা যে শুধু ইংরাজি শিক্ষিত, তাই নয়—আমরা ইংরাজের হাতে-গড়া সম্প্রদায়, ইংরাজ শাসনের কৃপায় আমাদের উদয় ও আমাদের অভ্যুদয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায় ওরফে ভদ্র সম্প্রাদায়ের লোকেরা সকলেই হয় জমিদার নয় হাকিম, হয় উকিল নয় ডাক্তার, হয় স্কুল মাষ্টার নয় কেরাণী।

সেকালে এদেশে এ শ্রেণীর লোক যে মোটেই ছিল না তা নয়।

পুঁথির পঠন পাঠন করবার, খাতাপত্র লেখবার, নাড়ী টেপবার ও বড়ি গেলাবার লোক, অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ সেকালেও অবশ্য ছিল। এবং প্রধানত এই তিন জাতের লোকেই আজকের দিনে সমাজের মাথায় উঠেছেন।

সেকালে এঁরা দিন গুজরান করতেন দেশের লোকের আশ্রয়ে, আজকে করেন ইংরাজ-রাজের আশ্রয়ে। সেকালে এ দল সংখ্যায় বড় বেশি ছিল না, তাদের আর্থিক অবস্থাও ঠিক হিংসে করবার মত ছিল না এবং তাদের বিদ্যার বহরটাও খুব খাটো ছিল।

সেকালের তুলনায় একালে আপিস আদালত স্কুল-কলেজ হাঁস-পাতাল ডাক্তারখানা জেল ও থানার সংখ্যা এত অসম্ভব বেড়ে গেছে যে স্বর্গীয় পিতামহেরা একবার যদি দেশে ফেরেন ত এদেশ যে তাঁদের দেশ তা তাঁরা একনজরে ঠাওর করতে পারবেন না।

উপরে যে সকল ক্ষেত্রের উল্লেখ করলুম সে সকল ক্ষেত্রেই মানুষের কাজ হচ্ছে—হয় কথা কওয়া, নয় কলম পেষা।—এক কথায় মস্তিষ্কের কাজ। অবশ্য থানায় ও ডাক্তারখানায় ভদ্র সম্প্রদায়ের কিছু হাতের কাজও আছে কিন্তু তাকে ঠিক শিল্প বলা যায় না।

কিন্তু যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনি জাতিবিশেষেরও যদি মাথাটা প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে আর সেই সঙ্গে তার হাত পা সব শুকিয়ে যায় তাহলে সেটা কি স্বাস্থ্য কি বল কিছুরই পরিচয় দেয় না। মানুষের দেহের ওরকম অবস্থা দেখলে লোকে বলে তার মাথায় জল হয়েছে অতএব আমাদের সম্বন্ধে কেউ ও-রকম কথা বললে আমরা রাগ করতে পারি কিন্তু তার উপর হাত তুলতে পারি নে কেননা সে হাত আমাদের একরকম নেই বললেই হয়।

ইংরাজের আমলে আমাদের হাত যে শুকিয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ যে-সম্প্রদায়ের কাজই হচ্ছে হাতের কাজ, সে সম্প্রদায় একরকম উচ্ছন্নে গেছে। কামার কুমোর তাঁতি ছুতোর যুগী জোলা প্রভৃতি সব কলের তলে চাপা পড়ে পিষে গিয়েছে। শিল্পীর দল এখন আর এদেশে

নেই, আছে ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে অষ্ট্রেলিয়ায়। তাদের হাতের তৈরি মাল আমাদের জীবনযাত্রার সম্বল। কিন্তু যে দেশে শিল্প আছে সে দেশে একালে শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের, মাথার সঙ্গে হাতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, এর একটির শক্তির সঙ্গে অপরটির শক্তি বাড়ে কিম্বা কমে সুতরাং সে সব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজ দেহেরই উচ্চাঙ্গ। এদেশে সে উচ্চাঙ্গ ছিন্ন অঙ্গ। আমি যখন একটু দূর থেকে স্ব-সম্প্রদায়কে দেখি, তখন আমি মনে মনে এ কথা না বলে থাকতে পারি নে যে, "কাটা মুণ্ড কথা কয়।" শুধু কথা কয় না, বড় বড় কথা বলে, তাও আবার ইংরেজিতে! এ দেখে যাঁর আনন্দ হয় তিনি ছেলে মানুষ, আমার শুধু হাসি পায়, কিন্তু সে হাসি কান্নারই সামিল।

সে যাই হোক আমাদের সমাজ দেহের একটা প্রধান অঙ্গ যে শুকিয়ে গিয়েছে—এবং তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন যে নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে এবং জাতীয় জীবনকে সুস্থ ও সবল করতে হলে এদেশে শিল্পের যে পুনর্জন্ম দেওয়া চাই এ কথা ত সর্ব্ববাদী সম্মত। এই মনোভাবেরই ত নাম স্বদেশী!

আজকের সভায় এ বিষয়ের আলোচনা আর তুলব না। কেননা এ সমস্যা যেমন গুরুতর তেমনি জটিল। এর সরল মীমাংসা সরল হতে পারে কিন্তু মীমাংসাই নয়। কারও কাছে এমন সঞ্জীবনী মন্ত্র নেই—যার বলে আমাদের মৃত শিল্পকে এক মুহূর্ত্তে খাড়া করে তুলতে পারা যায়। এ সব মন্ত্রতন্ত্রের কথা নয়, যন্ত্রতন্ত্রের কথা। শিল্পবাণিজ্য বর্ত্তমান যুগে তার স্বদেশী চরিত্র ত্যাগ করে সর্ব্বদেশী হয়ে উঠেছে। শিল্পবাণিজ্যের জালে সমগ্র পৃথিবী আজ এমনি জড়িয়ে পড়েছে যে

ইচ্ছে করলেই তার থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার শক্তি কোন দেশেরই নেই। দেখ না কেন এত বড় ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রতাপশালী দেশ ইংলণ্ড অর্দ্ধমৃত জর্ম্মাণী আর অর্দ্ধক্ষিপ্ত রুসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হবার জন্য কতদূর লালায়িত হয়েছে। ইউরোপের প্রতি দেশের আজ এ জ্ঞান হয়েছে যে এ ক্ষেত্রে কোন দেশকে একঘরে করতে গেলে নিজে একঘরে হয়ে পড়তে হয় এবং তাতে আর যাই হোক, অন্নবস্ত্রের কোন সুসার হয় না। আমাদের শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবশ্য করতেই হবে, নইলে পৃথিবীর আর সব মহাজন জাতের কাছে আমাদের দেশ রেহানাবদ্ধ হয়ে থাকবে আর তাদের স্থদ দিতেই আমরা সর্ব্বস্বান্ত হব। এ যুগের আর্থিক হিসাব এই। যে জাতি মাল ঘরের ও পরের জন্য তৈরি করে, তার স্থান সবার উপরে। যে জাতি মাল কি ঘরের কি পরের কারও জন্যে তৈরি করে না, তার স্থান সবার নীচে। আর যে জাতি মাল শুধু ঘরের কিম্বা শুধু পরের জন্য তৈরি করে, এমন কোনও জাতি যদি থাকে – তার স্থান মাঝে, তার কপালে হয় ওঠা, নয় নামা ছাড়া অন্য গতি নেই। তবে এ সমস্যা আমাদের পক্ষে বিশেষ গুরুতর এই কারণে যে, আমাদের দেশে এমন কিছু শিল্প নেই, যাকে লালন পালন করে আবার আমরা বড় করে তুলতে পারি। এ বস্তু আমাদের নতুন করে গড়তে হবে—তার জন্য বহু ভাবনা চিন্তা চাই—বহু পরিশ্রম চাই, অটল ধৈর্য্য চাই, একাগ্র সাধনা চাই। যদি কেউ মনে করেন যে, তিনি শুধু সভায় বক্তৃতা করে ও কাগজে আর্টিকেল লিখে আমাদের লুপ্ত শিল্পকে উদ্ধার করবেন, তাহলে আমি বলি, তিনি কলেরও বল জানেন না, ধনেরও বল জানেন না। বর্ত্তমানে দুটি ধাতু পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব

করছে, সোনা আর রূপো। যে জাত এ দুই ভূতকে আমলে না আনতে পারবে, সে জাত পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবে। আর এ দুটিকে সত্য সত্যই দখলে আনতে হলে, চাই প্রবুদ্ধ জ্ঞান আর প্রকৃষ্ট কর্ম্ম। আমরা যে মনে করি যে, এ লড়াই আমরা কথায় ফতে করব, তার কারণ আমরা জানি শুধু বক্তৃতা করতে আর কলম পিষতে। উপরে যা বললুম তার থেকে এ অনুমান করবেন না যে, শিল্প-বাণিজ্য নিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বলা কওয়ার কোনই সার্থকতা নেই। তা যদি মনে করতুম, তাহলে আমি এ সভায় উপস্থিত হতুম না, কেননা একমাত্র কথা কথা কওয়া ব্যতীত অপর কোন শক্তি আমার নেই।

এই সব আলোচনার প্রথম ফল এই যে, আমাদের জাতীয় দৈন্যের বিষয়ে আমরা যখন সচেতন হই, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা কি মহা সঙ্কটে পড়েছি।

এর দ্বিতীয় ফল এই যে, আমাদের জীবন সমস্যাটা যে কত ভীষণ, সে বিষয়ে আমাদের চোখ ফোটে। আর যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন বিপদ চোখে পড়লেই তা অর্দ্ধেক কেটে যায়।

(৫)

দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আমরা যে পৃথক হয়ে পড়েছি,—দেশের লোকের মনের ও জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে অতি দূর হয়ে পড়েছে, এই কথাটা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আমি "রায়তের কথা" লিখি; কেননা নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যা কিছু যোগাযোগ আছে, সে একমাত্র জমিসূত্রে। আগে যে লিখি নি, তার কারণ ও-কথা দু-বছর আগে বললে তা'তে বড় কেউ কান

দিত না। আজকের দিনে সকলে দিতে বাধ্য, কারণ জনসাধারণকে হঠাৎ আমাদের পলিটিক্সের আখড়ায় টেনে আনা হয়েছে।

আজকের দিনে সবারই মুখে একটি কথা নিত্য শোনা যায়, সে কথা হচ্ছে ডিমোক্রাসি। এই ইংরেজি কথাটার নানারূপ সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে যথা—প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন, লোকায়ত্ত শাসন ইত্যাদি। সাদা বাঙলায় ডিমোক্রাসির মানে হচ্ছে রাজ্যের সেই শাসন-প্রণালী, যার গোড়ায় আছে লোকমত। একথা বলাই বেশি যে, লোকমত জানতে হলে লোকের কাছে যাওয়া দরকার, তাদের সুখ দুঃখ তাদের অভাব অভিযোগের সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। আমি যদি ভোটের জন্য তোমাদের দ্বারস্থ হই, তাহলে তোমরা আমাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করবে, আমি বাঙলার মন্ত্রীসভায় বসলে, আমার দ্বারা তোমাদের কি দুঃখ দূর হওয়া সম্ভব। এর জবাব আমাকে দিতেই হবে, এবং সে জবাব আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব, যদি না আমি জানি তোমাদের ব্যথা কোথায়। এর থেকে আমি ধরে নিয়েছি যে, আজকের দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায় "রায়তের কথা"য় কান দেবেন। এ ধরে নেওয়াটা আমার পক্ষে যে ভুল হয় নি তার প্রমাণ, আমার জবানী রায়তের কথা শুনে শিক্ষিত সম্প্রদায় ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। অনেকেই আমার মতে:সায় দিয়েছেন, যাঁরা দেন নি তাঁরা চুপ করে আছেন। অবশ্য আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, অর্থাৎ—একদল পলিটিসিয়ান আছেন, যাঁরা শুনতে পাই, আমার উপর ঈষৎ নারাজ হয়েছেন। তাঁদের মতে আমার কথাটা ঠিক; কিন্তু এ সময়ে তা তোলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। তাঁরা নাকি আমার ঐ লেখার দরুণ উভয় সঙ্কটে পড়েছেন, একপক্ষে জমিদার, অপর

পক্ষে রায়ত, এদের মধ্যে কার মন রেখে চলবেন, তা তাঁরা ঠিক বুঝতে পারছেন না। যেহেতু তাঁরা পেট্রিয়ট, সে কারণ তাঁরা রায়তের পক্ষে, আর যেহেতু তাঁরা পলিটিসিয়ান, সে কারণ তাঁরা জমিদারের পক্ষে। এর উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, পেট্রিয়টিজম ও পলিটিক্সের এই বিচ্ছেদটা যত শীগ্‌গির মিলনে পরিণত হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

পেট্রিয়টিজম ও পলিটিক্সের, দেশভক্তি ও রাজনীতির এই বিচ্ছেদটা কাল্পনিক নয়। পেট্রিয়টিজম হচ্ছে একটা মনের ভাব আর পলিটিক্স হচ্ছে একটা বৈষয়িক কাজ। দেশভক্তি চাই কি গান গেয়েই আমরা নিঃশেষ করে দিতে পারি, অপর পক্ষে রাজনীতি চাই কি একটা স্বত্বের মামলা মাত্র হয়ে উঠতে পারে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, গান গাওয়া ও বক্তৃতা করা ছাড়াও দেশভক্তির আরও ঢের কাজ আছে। একটি জগৎ-বিখ্যাত ফরাসী লেখক আজীবন দুনিয়া দেখে শুনে শেষটা মানুষকে একটা অমূল্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি সকলকে ডেকে বলেন—"নিজের জমি আবাদ করো।" আমিও আমার স্বজাতিকে বলি, নিজের জমি আবাদ করো। এ জমি শুধু ধানের জমি নয়, মনের জমিও বটে, জ্ঞানের জমিও বটে, ধর্ম্মের জমিও বটে, কর্ম্মের জমিও বটে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজের জীবন নিজে গড়ে তুলতে কোমর না বাঁধব, ততদিন আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেইহ বে, আর তার ফলে ক্ষণিক উল্লাসের পিঠ পিঠ আমাদের আক্ষেপ করতে হবে।

(৬)

জমি আবাদ করতে হলে, প্রথমে জমি চেনা চাই। আমি "রায়তের কথায়" এক জায়গায় বলেছি যে, এদেশে এমন মানব

জমিন পতিত রয়েছে, যা আবাদ করলে ফলত সোনা। আর সে মানব জমিন হচ্ছে বাঙলার কৃষক-সম্প্রদায়।

পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা একটা নূতন কথা শুন্‌লে, না ভেবে চিন্তে তার একটা প্রতিবাদ করে বসেন, কেননা ভাববার চিন্তবার অভ্যাস তাঁদের নেই, আছে শুধু প্রতিবাদ করবার। তার্কিকদের এ উপদ্রব আমাকে অপর ক্ষেত্রেও সহ্য করতে হয়েছে এবং সেই সূত্রে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভও হয়েছে।

আমি কলম ধরে অবধি এই মত প্রচার করছি যে, বাঙলা-সাহিত্য বাঙলা ভাষাতেই লেখা কর্ত্তব্য। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়, আমাদের অভ্যস্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রসাদে ও প্রভাবে একটি নূতন ভাষা গড়ে তুলেছি—যে-ভাষা আধ-বাঙলা আধ-সংস্কৃত এবং যে ভাষার নাম সাধুভাষা। আমরা বলি বাঙলা, লিখি সাধুভাষা। মুখের কথার সঙ্গে বইয়ের কথার এই বিচ্ছেদটা দূর করার প্রস্তাব করবার দরুণ আমার বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ আনা হয় যে, আমি বঙ্গসাহিত্যের ইজ্জৎ নষ্ট করছি, আমি ইতর কথাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, আমি মুড়ি-মিছরির একদর করছি, এক কথায় বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বনাশ করতে প্রস্তুত হয়েছি। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে বহু তর্কাতর্কি বহু বকাবকি, বহু রাগারাগি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। এর ফল কি দাঁড়িয়েছে? —আজ নূতন লেখকের দল প্রায় সকলেই নিজের জবানী কথা কই-ছেন, উপরন্তু বঙ্গসাহিত্যের দু-একটি মহারথী যাঁরা আমার উপর শব্দভেদী বাণনিক্ষেপ করেছেন, তাঁরাও আবার কেঁচে মাতৃভাষাতেই গণ্ডূষ করছেন।

তারপর আমি বহুদিন থেকে প্রচার করে আসছি যে, যতদিন না আমরা আমাদের নিজের ভাষায় শিক্ষিত হব ততদিন আমরা

যথার্থ শিক্ষিত হব না, ততদিন জ্ঞান বিজ্ঞান সকলই আমাদের মুখস্থ থাকবে, কিছুই আমাদের মনস্থ হবে না। বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করে, আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের জ্ঞানের যে বিচ্ছেদ ঘটেছে সেই পার্থক্য দূর করবার প্রস্তাব করবার দরুণ আমার বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ আনা হয়েছে যে, আমি আমাদের শিক্ষার আভিজাত্য নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছি, বাঙলা-ভাষার মত একটা ইতর ভাষাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন করতে উদ্যত হয়েছি, বাঙলাকে ইংরাজি রাজাসনে বসাতে চাচ্ছি—এক কথায় শিক্ষার সর্ব্বনাশ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি। আমি আজ ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখছি যে, কাল না হোক, পরশু বাঙলা ভাষাই বাঙালীর শিক্ষার বাহন হবে, আর তার দৌলতে, বাঙালীর মন সেইরূপ শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করবে, বাঙলা ভাষায় লেখবার দরুণ বাঙলা সাহিত্য যে শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করছে।

আমি কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী কোন ভাষার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করি নি। আমার কথা এই যে মৃতভাষা ও বিদেশী ভাষা যত্ন করে শেখবার জিনিস নয়, কষ্ট করে লেখবার জিনিষ নয় তা ছাড়া অপর ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য নিজের ভাষা ভোলা কখনই হতে পারে না। দূরদেশ ও দূর কালের জ্ঞান বিজ্ঞান আত্মসাৎ করবার জিনিস। যা বাইরে থেকে আসে তা নিজের ভাষার সাহায্যেই আয়ত্ত করতে হবে, নিজের মন দিয়েই পরিপাক করতে হবে।

এই সব কারণে যখন শুনি যে আমি "রায়তের কথা" তুলে ইতর লোককে নাই দিয়ে মাথায় চড়াচ্ছি, সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি করছি, যেখানে পরস্পরের মনের মিল আছে সেখানে মনান্তর ঘটাচ্ছি, এক কথায় আমাদের অভিজাত সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন

করতে উদ্যত। তখন সে অভিযোগের প্রতিবাদ করাও নিস্প্রয়োজন মনে করি। এস্থলে আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই। ভাষা, শিক্ষা পলিটিক্স; সকল বিষয়েই আমার মতামতের ভিতর একটি বিশেষ মনোভাব ফুটে বেরয়। সে হচ্ছে এই বিশ্বাস যে বাঙলার নব-সভ্যতা বাঙলার জমির উপরেই গড়ে তুলতে হবে আর সে জমি শুধু চাষের জমি নয় মনেরও জমি।

(৭)

এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ যুগে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে আমাদের জাত গড়ে তোলা। জাতি-গঠনই যে আমাদের রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য এ কথা মুখে সকলেই বলেন এবং মনে অনেকেই করেন। এবং প্রতি দেশসেবকই নিজের ধারণা অনুসারে এ ক্ষেত্রে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নেন।

আমার ধারণা এই যে আমাদের স্বজাতিকে তার ভিৎ থেকেই গড়ে তুলতে হবে। অতএব আমাদের দেখতে হবে সে ভিৎ কোথায়।

বাঙালীর মনের ভিৎ হচ্ছে বাঙলার ভাষা। আর বাঙালীর জীবনের ভিৎ হচ্ছে বাঙলার চাষা। এই চাষা শব্দটা মুখে আনতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, কেননা কথাটার ভিতর কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞার পরিচয় ফুটে বেরয়।—যে জমি চষে তার প্রতি এই অবজ্ঞা যেমন অযথা তেমনি জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই আমি জাতীয়জীবনে কৃষক সম্প্রদায়ের স্থান নীচে হলেও তার মূল্য যে কত উচ্চ নিজের সম্প্রদায়কে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

মানুষে যে দিন কৃষিকাজ করতে আরম্ভ করেছে সেই দিন তার সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছে। পৃথিবীর সকল সভ্যতাই হচ্ছে কৃষিমূল। শুধু তাই নয়—সেই দিনই পৃথিবীর একটা ভূভাগ মানুষের স্বদেশ হয়ে উঠেছে। মরুভূমি কারও স্বদেশ নয়, কেননা যে ভূমি মানুষকে অন্ন দেয় তাই মানুষের মাতৃভূমি। জন্মভূমি জননীরই তুল্য কেননা জননী শিশুকে স্তন্য দেন আর জন্মভূমি মানুষকে অন্ন দেয়। যে স্বদেশ-প্রীতির গুণকীর্ত্তন করতে করতে আমাদের দশা ধরে সে প্রীতি আদিতে কৃষকেরই মনে জন্মলাভ করে। আর সেই মাটি ভালবাসাটাই উদার হয়ে স্বদেশ-প্রীতির আকার ধারণ করেছে। আর স্বদেশ-প্রীতি যে আসলে কৃষকেরই মনোভাব তার পরিচয় প্রতি সভ্য দেশেই পাওয়া যায়। ইউরোপের গত যুদ্ধে সকল দেশেই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে পেট্রিয়টিক মনোভাব যে পরিমাণে কৃষকের মধ্যে আছে সে পরিমাণে কলের কুলির মধ্যে নেই। স্বদেশকে জর্ম্মাণ-দের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ফ্রান্সের কৃষকেরা হাজারে হাজারে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কেননা ফ্রান্সের, কৃষকদের কাছে জর্ম্মাণদের কর্ত্তৃক ফ্রান্স অধিকার মাতৃহত্যারই তুল্য। আর যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে খুনীর হাত থেকে মাকে বাঁচাবার জন্য নিজের রক্তপাত করতে দ্বিধা করে না। কি ফ্রান্স কি জর্ম্মাণী কি ইতালী সকল দেশেই যে সম্প্রদায় জমির মালিক আর যে-সম্প্রদায় জমি চষে সেই সম্প্রদায় প্রধানত Nationalist, আর যে-সম্প্রদায় কল কারখানায় মজুরি করে সে সম্প্রদায় প্রধানত inter-nationalist। যারা কল কারখানায় মজুরি করে দিন আনে দিন খায় তাদের মনে স্বদেশ-প্রেমের চাইতে স্বজাতি-বাৎসল্য প্রবল। আর

ইউরোপের এক দেশের মজুর অপর দেশে মজুরকে তার স্বজাতি মনে করে। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে-স্বরাজ্য লাভের জন্য আমরা সকলে অস্থির হয়ে উঠেছি সে স্বরাজ্য আমাদের ভাগ্যে যদি কখনো জোটে, তা হলে—আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ই আমাদের স্বদেশপ্রীতির সর্ব্বপ্রধান আধার ও নির্ভর স্থল হইবে।

আজকে যে তাদের সে প্রীতি নিজের ক্ষেতের গণ্ডী পেরয় না—তার কারণ যে শিক্ষার ফলে এ ভালবাসা উদার হয় সে শিক্ষা তাদের নেই।

ভাবের দিক ছেড়ে দিলেও, একমাত্র বৈষয়িক হিসেবে দেখলেও দেখা যায় যে কৃষক সম্প্রদায় হচ্ছে আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়স্থল। ইংরেজ আসবার পূর্ব্বে এ দেশের সকল সম্প্রদায় এই কৃষিজীবীদের আশ্রয়েই জীবন ধারণ করত। শিল্পের সঙ্গে কৃষির যোগ চিরদিনই অতি ঘনিষ্ঠ, আজকের দিনেও সে যোগ নষ্ট হয় নি। বোম্বায়ের কাপড়ের কল ও বাঙলার চটের কল দেখে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে আজ জল আসে। তাঁরা পারলে দেশটাকে একটা বিরাট কারখানা করে তোলেন কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে তুলো ও পাটের অভাবে ও-সব কল একমিনিটও চলতে পারে না, আর তুলো ও পাটের জন্ম হয় জমিতে।

একালের সঙ্গে সেকালের তফাৎ এই যে আমাদের দেশে সেকালে শুধু শিল্পের সঙ্গে কৃষির নয়, শিল্পীর সঙ্গে কৃষকের যোগাযোগটাও অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁতি জোলা কামার কুমোর, জমিদারের কাছথেকে পেত জমি ও কৃষকের কাছথেকে ধান। উঁচু জাতের লোকেরাও ঐ জমির উপসত্বের উপরই সংসার চালাত।

ব্রাহ্মণের খোরপোষ চলত—ব্রহ্মোত্তরের কৃপায়। কৃষাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁর যে পরিচয় ছিল তার প্রমাণ এই শ্লোক

বামন গেল ঘর।
লাঙ্গল তুলে ধর॥

সেকালে বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ কায়স্থ লেখাপড়ার কাজের চাইতে ক্ষেতের কাজে বেশি মনোনিবেশ করতেন। ফলে কৃষির মর্য্যাদা ও কৃষকের মর্ম্ম আমাদের চাইতে সে কালের বাঙালী ঢের বেশি বুঝত। এ সত্য তাদের প্রত্যক্ষ ছিল যে সমগ্র সমাজ ঐ কৃষির ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। আজকে যে কথা তর্ক করে বোঝাতে হয়—সে জিনিস ছিল তাদের চোখে-দেখা পদার্থ।

আজকের দিনে আমরা এ সত্য ভোলবার যে অবসর পাই তার কারণ, এক জমিদার ছাড়া ভদ্রসম্প্রদায়ের আর কাঁউকেও নিত্য নিয়মিত কৃষকের হাত-তোলা খেতে হয় না। অথচ আজকের দিনে কৃষকের উপর আমাদের যতটা নির্ভর সেকালে ততটা ছিল না। ধনসৃষ্টির দুটি উপায়—কৃষি ও শিল্পের ভিতর শিল্প আমাদের নেই, আছে শুধু কৃষি।

আমরা—যারা মাইনের চাকর, একটু খোঁজ করলেই জানতে পারব সে মাইনে আসে কৃষকের কাছথেকে—তার পর ওকালতি বলো, ডাক্তারি বলো, সবারই ফিসের টাকা, ঐ কৃষকের কাছ থেকেই আসে। কিন্তু সেটা যে আমাদের চোখে পড়ে না, তার কারণ সে টাকা আসে, হয় সরকারের তহবিল নয় জমিদারের তহবিলের ভিতর দিয়ে তার পর পাঁচ হাত ঘুরে। কথাটা যে কতদূর সত্য একটা কাল্পনিক

উদাহরণ দিয়ে তা বোঝানো যাক। আজকাল এ দেশে ধর্ম্মঘট আমাদের হাতে একটা রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠেছে। রাজার অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার কারো কারো মতে ও-ছাড়া আমাদের অপর কোনও অস্ত্র নেই। ধরে নেওয়া যাক তাই। যে সব ধর্ম্মঘটের আমরা সৃষ্টি করছি তাতে যারই যা অসুবিধা হোক দুনিয়ার কাজ একরকম চলে যায়। কিন্তু ধরুন যদি কৃষকেরা পণ করে বসে যে ফসল আর তারা বুনবে না—তাহলে কি হয়? সমগ্রজাতির শুধু ভাবলীলা নয়, সেই সঙ্গে ভবলীলাও স্বল্প দিনেই সাঙ্গ হয়। এই সব কারণে আমি এ সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি ভদ্র-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। যে-কৃষি বাঙলার ঐশ্বর্য্যের মূল ও যে-কৃষক বাঙলার শক্তির আধার, সেই দুয়ের উন্নতি সাধনই—যাঁরা জাতিগঠন করতে চান, তাঁদের প্রথম কর্ত্তব্য। এই হচ্ছে আমার লেখা রায়তের কথার মূল কথা।

(৮)

আমরা যখন বলি যে, আমরা জাতিগঠন করতে চাই—তার অর্থ আমরা একজাতি গঠন করতে চাই—কেননা পলিটিক্সের হিসাবে এক দেশের লোকসমূহ একজাতি বলেই গণ্য।

আমাদের দেশে সকলকে নিয়ে একটা জাতি গড়ে তোলবার অন্তরায় হচ্ছে আমাদের জাতিভেদ।

প্রথমত ধর্ম্মের প্রভেদের দরুণ আমরা সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি জাতিতে বিভক্ত। হিন্দু একজাতি, মুসলমান আর এক।

তারপর আমরা—যারা নিজেদের হিন্দু বলি, আমরা একজাত নই—ছত্রিশ জাত। এবং সামাজিক হিসেবে এই অসংখ্যজাত—পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

এ প্রভেদ পুরাকাল থেকে চলে এসেছে, তার পর ইংরাজি শিক্ষা আবার আমাদের মধ্যে নূতন একটা জাতিভেদের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় একজাতি, অশিক্ষিত সম্প্রাদায় আর এক।

তা ছাড়া ধনী দরিদ্রের যে জাতিভেদ সব দেশেই আছে, সে ভেদ এদেশেও আছে। আর এ কথা নিশ্চিত যে, মানুষে মানুষে এই বৈষম্য—পলিটিক্যাল হিসাবে এক জাতি গঠনের অন্তরায়। সুতরাং যিনি বাঙলায় একজাতি গঠনের প্রয়াসী তাঁর ভেবে দেখা উচিত, এর ভিতর কোন্ ভেদটি আমাদের দ্বারা দূর হওয়া সম্ভব।

ধর্ম্মের ভেদে যে জাতিভেদ ঘটেছে, সে ভেদ দূর করা যে অসম্ভব সে কথা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষের লোকের মনোভাব আজও এতটা পলিটিক্যাল হয়ে ওঠে নি, আর আশা করি কখনও উঠবে না যে তারা ধর্ম্মের চাইতে পলিটিক্সকে বড় করে তুলবে—কেননা তা করার অর্থ আত্মার চাইতে সংসারকে বড় করে তোলা।

এ ক্ষেত্রে আমরা যা করতে পারি সে হচ্ছে এই যে, ধর্ম্ম যেন আমাদের পরস্পরের আত্মীয়তার প্রতিবন্ধক কিম্বা প্রতিকূল না হয়। এই কারণে ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্স জড়ানো—আমি একান্ত ভয়ের বিষয় মনে করি। কেননা এ অবস্থায় জাতিতে জাতিতে যে পার্থক্য আছে তা'ত থেকেই যাবে; উপরন্তু পরস্পরের বিরোধের সুযোগ ক্রমে বেড়েই চল্‌বে। এই কারণে আমাদের দেশে পলিটিক্যাল হিসেবে মুসলমান-দের যে এক শ্রেণী আর হিন্দুদের আর এক শ্রেণী করা হয়েছে সে

বন্দোবস্তের আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। এর ফল যে কি করে শুভ হতে পারে, তার মর্ম্ম গ্রহণ করা আমার বিদ্যেয় কুলোয় না। আর যাঁদের কুলোয় তাঁদের দূরদর্শিতারও আমি তারিফ করতে পারি নে।

সে যাই হোক—শিক্ষাজাত আমাদের এই নূতন জাতিভেদ দূর করার সাধ্য আমাদের আছে, অতএব এ দেশের উচ্চ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিম্ন সম্প্রদায়ের মনের যে বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, সেই বন্ধন সূত্রে পরস্পরের আবার আবদ্ধ হবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এক দেহের অন্তরে যদি দু'টি মন থাকে যারা পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ শূন্য তাহলে সে দুয়ের উল্টোটানে সে দেহের সকল শক্তি নষ্ট হয়, সকল গতি ব্যর্থ হয়।

এখন দেখা যাক, কি উপায়ে আমরা আমাদের মনের ঐক্য ফিরে আনতে পারি। এর দুটি উপায় আছে।

প্রথম। আমরা ভদ্রসম্প্রদায় যদি স্কুল কলেজে না ঢুকি, আপিস আদালত ছেড়ে দিই, অর্থাৎ—লেখাপড়ার সম্পর্ক না রাখি, তাহলে অবশ্য আমরা দেশশুদ্ধ লোক সহজেই বিদ্যাবুদ্ধিতে একজাত হয়ে যাই।

এ উপায়টা দেখতে অতি সহজ, কেননা কিছু করার চাইতে কিছু না-করার দিকে মানুষের মনের স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। এবং ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে এ উপায় অবলম্বন করবার প্রস্তাবও যে না হয়েছে তা নয়।

দ্বিতীয়। উপায় হচ্ছে অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করা। আমি এই দ্বিতীয় উপায়ের পক্ষপাতী।

কেন পক্ষপাতী তার কৈফিয়ৎ দিতে গেলে পণ্ডিতের তর্ক সুরু করতে হয়। এ সভা সে তর্কের ক্ষেত্র নয়। সুতরাং একটা উদাহরণের সাহায্যে কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

আমাদের ভদ্র-সম্প্রদায় যখন প্রথম ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেন, তখন তাঁদের মধ্যে জনকতক উৎসাহী ব্রাহ্মণযুবক আমাদের সামাজিক জাতিভেদ তুলে দেবার উদ্দেশ্যে পৈতা ফেলে দেন! তাঁরা ভেবেছিলেন যে উক্ত উপায়ে অতি সহজে ব্রাহ্মণ শূদ্র একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু ফলে দাঁড়াল এই যে দু'দশ জন ছাড়া আর কেউ পৈতা ফেললেন না, আর যাঁরা ফেললেন তাঁরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হলেন। অর্থাৎ—কি ব্রাহ্মণ-সমাজ কি শূদ্র-সমাজ উভয় সমাজেরই তাঁরা বহির্ভূত হয়ে থাকলেন।

কিছুদিন থেকে এ দেশের লৌকিক-মনের একটা উজানগতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অনেক অব্রাহ্মণ জাত আজকের দিনে পৈতা নিচ্ছে, এক আধটি করে নয় শয়ে শয়ে কোথাও বা হাজারে হাজারে। এ উপবীত ধারণের ফলে তারা ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠে নি, কিন্তু শূদ্রত্বের অপবাদ থেকে তারা মুক্ত হচ্ছে এবং এই সূত্রে তাদের আত্মমর্য্যাদাও বেড়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টার আমি পক্ষপাতী। তাই শিক্ষাজাত জাতিভেদ দূর করবার জন্যে আমার মতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের পৈতা ফেলাটা সদুপায় নয় তার সদুপায় হচ্ছে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে মনের পৈতা নেওয়া! এই কারণেই আমি লোকশিক্ষার এত পক্ষপাতী। জনগণকে যে-শিক্ষা দিতে আমরা আজ প্রয়াসী হয়েছি জানি তার ফলে লোকসমাজ মনে ব্রাহ্মণসমাজ হয়ে উঠবে না। কিন্তু সেই শিক্ষাসূত্রে এ দুই সমাজের মনের যোগ হবে। এতে

সমগ্র সমাজের মনের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে, কেননা তখন আমাদের সমাজদেহের সর্ব্বাঙ্গে একই রক্ত চলাচল করবে।

বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমি ভদ্র সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা নষ্ট করতে চাই নে, অর্থাৎ—আমাদের সমাজদেহের মুণ্ডপাত করতে চাই নে। এ যুগে সব চাইতে বড় বল হচ্ছে বুদ্ধিবল, এবং জ্ঞান বিজ্ঞানই হচ্ছে বুদ্ধির প্রধান খোরাক। আমাদের মনকে সে খোরাক না যোগালে জাতির যে সর্ব্বপ্রধান শক্তি তাই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে, তার চাইতে সর্ব্বনাশের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমি চাই চাষা ভদ্র হোক। আর আমার বিশ্বাস চাষারাও চায় না যে ভদ্র সম্প্রদায় চাষা হোক। জনসাধারণের ঐ পৈতা নেবার প্রবৃত্তি থেকেই দেখা যায় যে তারা নিজে উপরে উঠতে চায় অপরকে নীচে নামাতে চায় না।

(৯)

বিশেষ করে রায়তের কথা আলোচনা করবার জন্য এ সভায় আমি উপস্থিত হই নি। এ বিষয়ে আমার যা বক্তব্য ছিল সে সবই আমি "রায়তের কথা"য় বলেছি। যে কথা একবার বলেছি সে কথার পুনরুল্লেখ করবার কোনও প্রয়োজন নেই।

তা ছাড়া আমার কথার এমন কোনও প্রতিবাদ অদ্যাবধি আমার কর্ণগোচর হয় নি, যার দরুণ আমি আমার মতামত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছি। দক্ষিণ কিম্বা বাম কোন মার্গের পলিটিসিয়ানরা আমার কথার এমন কোন জবাব দেন নি, যার উল্টো জবাব দেওয়া দরকার।

এমন কি জমিদার সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে চুপ করে আছেন। এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রায়তের অবস্থার উন্নতিকল্পে আমি যে সব প্রস্তাব করেছি, তাতে তাঁদের বিশেষ কিছু অমত নেই।

তবে শুনতে পাই যে, কেউ কেউ আমার প্রতি এই দোষারোপ করছেন যে, রায়তের কথা তুলে আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সৃষ্টি করছি।

আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের নিম্নসম্প্রদায়ের যুদ্ধ বাধানোর অভিপ্রায়ের লেশমাত্র যে আমার মনের কোন কোণে স্থান পায় নি তার প্রমাণ এই যে, এক্ষেত্রে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনের ও জীবনের বন্ধন দৃঢ় করা। বলা বাহুল্য যে, আমাদের ভদ্র-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক অল্পবিস্তর জমির মালিক, অর্থাৎ—জমিদার। আমার বিশ্বাস যেখানে সে বাঁধন একেবারে ছিঁড়েও যায় নি, সেখানে তা ঢিলে হয়ে গিয়েছে। আমার এ বিশ্বাসের কারণ যে কি, তা এতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে বলেছি।

জমিদার ও রায়তে যদি আজ যুদ্ধ বাধে, তাহলে কোন্ পক্ষ যে এ ফেরা হার মানবে তা আমি সম্পূর্ণ জানি। সুতরাং সে বিবাদের যিনি সৃষ্টি করবেন, তিনি আর যারই হোক, রায়তের উপকার করবেন না। জমিদার-সম্প্রদায় চিরকালই বাঙলার একটা প্রবল সম্প্রদায় ছিল আর আজকের দিনে সব চাইতে প্রবল সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে। আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের একটি পৃথক সম্প্রদায় করে তোলা হয়েছে। দুদিন পরে যদি দেখা যায় যে, লাট দরবারে তাঁরাই দেশের বিধাতা হয়ে বসেছেন, তাহলে আর যিনিই হোন আমি আশ্চর্য্য হব না।

প্রজার অবস্থার আমি যে বদল করতে চাই, সে আইনের মারফৎ; আর বর্ত্তমান আইনের বদল করা আর না করার উপর

ভবিষ্যতে জমিদারের হাত অনেকটা থাকবে। সুতরাং জমিদার যদি প্রজার বিরোধী হন, তাহলে প্রজার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে কিঞ্চিৎ দেরি লাগবে।

রায়তের দুরবস্থা না ঘুচলে বাঙালী জাতির যে দেহে বল ও মনে শক্তি আসবে না, এ সত্যটা জমিদার সম্প্রদায়ের কাছেও অবিদিত থাকতে পারে না। সুতরাং তাঁরা যে জাতীয়-উন্নতির পথ আগলে দাঁড়াবেন, এ ভয় আমি পাই নে। তা ছাড়া জমিদারদের এ জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে যে, তাঁরা যদি রায়তের উন্নতির বিরোধী হন, ত আজ হোক কাল হোক সমগ্র জাতি তাঁদের বিপক্ষ হয়ে উঠবে। আর তার ফল যে কি হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সজ্ঞানে কেউ আত্মহত্যা করে না, কোন ব্যক্তিও নয়, কোন সমাজও নয়।

তবে একটি কথা। বিরোধের কারণ বর্ত্তমান রেখে বিরোধ কেউ চিরদিনের জন্য স্থগিত রাখতে পারে না। তুমি যদি শুধু তোমার স্বার্থ দেখ, তাহলে আমিই বা কেননা আমার স্বার্থ দেখব এই হচ্ছে মানুষের সহজ কথা। আমি প্রজার হয়ে যে সকল দাবী করেছি, সেগুলি মঞ্জুর করলে, জমিদার রায়তের বিরোধের সম্ভাবনা অনেক কমে আসে। সুদূর ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, তাই আমরা বর্ত্তমান সমস্যার একটা বর্ত্তমান মীমাংসার পথ দেখাতে চেষ্টা করেছি।

গৃহ-বিবাদ সৃষ্টি করবার অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে যে কেন আনা হয়েছে, তা আমি বেশ জানি। ধনী ও দরিদ্রের ভিতর যে জাতিভেদ রয়েছে, সে ভেদ কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূর করতে যিনি প্রয়াসী হবেন,

তাঁর বিরুদ্ধে এ অপবাদ সকল দেশে সকল ধনীব্যক্তি ও তাঁদের মোসাহেবের দল চিরদিনই নিয়মিত এনে থাকেন। পলিটিক্সের ভিতর যখনই ইকনমিক্সের সমস্যা এসে পড়ে, তখন যিনি সে সমস্যার বিচার করতে বসেন, তিনিই নিন্দার ভাগী হন। রাজনীতির লম্বা চৌড়া কথা দিয়ে অর্থনীতির কথা চাপা দেওয়া এক শ্রেণীর পলিটিসিয়ানদের চির-কেলে রোগ। কিন্তু এ চেষ্টার ফলে ইউরোপে জনগণের দারিদ্র্যের কথাটা চাপা পড়া দূরে থাক, আজকের দিনে সে-দেশের রাজনীতি ঐ অর্থনীতির নীচে চাপা পড়েছে। অতীতে কি ছিল জানি নে। কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের জীবনযাত্রা এত কষ্টকর হয়ে পড়েছে যে, সে কষ্টের কথাটা উহ্য রেখে পলিটিক্সের স্বাধীনতার কথা বললে ইউরোপের লোক আজ তা আর কানে তোলে না। সেদেশে class war, অর্থাৎ—কারখানার মালিকের সঙ্গে তার মজুরের বিবাদটা আজ ধর্ম্মযুদ্ধ বলে গণ্য। এই সব দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে যে, দেশের বেশির ভাগ লোকের আর্থিক অবস্থার কথাটা চাপা দিয়ে যে সকল পলিটিক্সের কথা আজকাল কওয়া হচ্ছে, তার মোহ বেশি দিন টিঁকবে না। আমাদের সমাজদেহের রোগ কোথায় এবং তার চিকিৎসা কি এ বিষয়ে আজ যদি আমরা উদাসীন থাকি, তাহলে ভবিষ্যতে সে রোগ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। রায়তের কথা মুখ্যত তাদের ব্যথার কথা এবং সে ব্যথার কতকটা উপশম যে আমরাই করতে পারি, এই সত্যটা সকলের চোখের সুমুখে দাঁড় করানো আমার মতে প্রতি শিক্ষিত লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য এবং আমি যথাসাধ্য সেই কর্ত্তব্য পালন করতে চেষ্টা করেছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি আমাদের সম্প্রদায়কে তোমাদের কথা শোনাবার চেষ্টা করেছিলুম আর আজ আমি তোমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের কথা শোনাতে চেষ্টা করলুম। অবস্থা তোমাদেরও ভাল নয়, আমাদেরও ভাল নয় সুতরাং সমগ্রজাতির শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য তোমাদের সঙ্গে আমাদের মনের ও জীবনের ঘনিষ্ঠ মিলনের প্রয়োজন আছে। এই আমার শেষ কথা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বিলাতের পত্র।

—:০:—

(লণ্ডন থেকে আমার একটি বন্ধু আমাকে যে পত্র লিখেছেন, তার এক অংশ প্রকাশ করছি। এর থেকে পাঠকেরা দেখতে পাবেন যে, যে সকল যুবক ভবিষ্যতে আমাদের দেশের intellectual-নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, তাদের মনের ভিতর কি সকল মত পুষ্ট হচ্ছে। রাজনৈতিক বাজে বুলি ও হুজুগের অসারতা সম্বন্ধে তাঁদের যে চোখ ফুটছে, নিম্নোদ্ধৃত ছত্রক'টি তার নিদর্শন।—সম্পাদক।)

লণ্ডন, ২৫শে অগস্ট্, ১৯২০।

* * * *

সবুজ পত্রের জন্য প্রবন্ধ পাঠাতে পারছি নে, তার জন্য বড়ই লজ্জিত রয়েছি। মাঝে প্রায় ২৭।২৮ দিন বেশ একটু স্কটলাণ্ডে আর লেকডিষ্ট্রিক্টে বেড়িয়ে এলুম। এডিনবরায় ছিলুম প্রায় দিন তের; বাকী ক'দিন হাইলাণ্ডস্-এ, আর লেকস্-এ। আপনার বোধ হয় ও-সব জায়গা দেখা আছে। ইন্‌ভারনেস, ফোর্ট অগস্টস্, ওবান আর কেজিক,—বড় চমৎকার লাগল। মনে হ'ল, যেন ডারওয়েণ্ট-ওয়াটার বরোডেল্ অঞ্চলটা হাইলাণ্ডস্-এর চেয়েও সুন্দর। কিন্তু হাইলাণ্ডস্ এক ধরণের জিনিস, এ আর এক ধরণের। দেশে হিমালয় দেখেছি, হিমালয়ের বিরাট্ বিশাল রূপ না থাকলেও এদেশের পাহাড়

অতি মনোরম লাগল। আবার সেই সব জায়গায় যাবার ইচ্ছে হয়। শেষ দু'দিন ব্লাকপুল-এ কাটাই। অতি কদর্য্য লাগল এই সী-সাইড (Sea-side place) প্লেসটা—কি ভীষণ ভীড়, কি ভাল্‌গারিটী—নাগরদোলা, রিং-খেলার আড্ডা, সমুদ্রের ধারের রাস্তায় আর বীচে লোকের গা ঘেষাঘেষি। আমাদের দেশের তীর্থস্থানের মত লোকের ঠেলাঠেলি, কিন্তু উদ্দেশ্য একেবারে অন্য রকম। এখানকার ছোটলোকেরা মিডল্‌ স্কুল অবধি প'ড়ে পুরাতন বিশ্বাস আর শালীনতা আর স্বাভাবিক সুরুচি হারাচ্ছে, কিন্তু কুসংস্কার বা অন্ধ-বিশ্বাস যাচ্ছে না। সেখানে (ব্লাকপুল-এ) দেখলুম ম্যাডেম লীলা, ম্যাডেম ল্যরা, ম্যাডাম কিরো-প্রমুখ খাঁটী ইংরেজ মহিলা—সংখ্যায় কম নয়—হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলছেন, ৬ পেনী থেকে শিলিং দর্শনী—আর সর্ব্বত্রই মেয়ে-পুরুষে লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে গেছে। এদেশের ডেমোক্রাসীর যে উৎকট রূপ দেখছি, আমাদের দেশে এর আবৃত্তির কল্পনা করে ভীত হয়ে যাচ্ছি, বোধ হয় ডেমোক্রাসী কোথাও টিকবে না। আরিষ্টোক্রাসী ছাড়া ভাল শাসন যেন হওয়া সম্ভব নয়। রুষেও তো নাকি বল্‌শেভিক্‌-তন্ত্র এখন জনকতক মাথাওয়ালা লোকের ইঙ্গিতে চ'লছে। Emancipation of the intellect, freedom of the spirit—এ সব বুলী দেশে শুনতুম—কোথায় সে সব ? মনে হয়, বুঝি সাবেক কালের চাল-চিন্তা এখনকার চেয়ে ভাল ছিল, শোভন সুন্দর ছিল। কিন্তু এখন অবশ্য তার টিঁকে থাকা অসম্ভব, কারণ জীবণ ঢের বেশি জটিল হ'য়ে যাচ্ছে। The goldon age that never was—তার জন্য অতীতের দিকেই তাকাতে ইচ্ছে করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বড়ই নিরাশ হ'য়ে প'ড়ছি।

স্কটলাণ্ডে মুমূর্ষু গেলিক ভাষার অবস্থা স্বচক্ষে দেখা গেল। এত বড় একটা ভাষা (গেলিক আর আইরিশ একই ভাষা), ১৫০০ (খ্রীঃ) পর্য্যন্ত যার সাহিত্য পশ্চিম-ইউরোপের সব চাইতে বড় সাহিত্য ছিল, যে-ভাষা এক সময়ে সমস্ত পশ্চিম-ইউরোপে চ'লত (খ্রীঃ পূঃ ৪০০ থেকে কেল্টিক ভাষার প্রচার ছিল প্রায় সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপে) এখন তার চর্চ্চা নেই, আদর নেই, হাজার তিরিশেক জেলে আর চাষার ভাষা হয়ে তার অবশিষ্ট বছর তিরিশ চল্লিশের জীবন গুজরাচ্ছে। আইরীশরা সংখ্যায় চার মিলিয়ন, এর মধ্যে বিশ হাজার লোক গেলিক বলে। ইংরেজের হাত এই গেলিক ভাষা আর কেল্টিক কালচার আর স্পিরিটকে ধ্বংশ করতে কম ছিল না। তাই আইরীশ লোকেরা, মুখ্যতঃ ইংরেজ-বিদ্বেষের বশে, আইরীশ-গেলিকের পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যর্থ-প্রয়াস করছে। আমি ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার বহুত্বে বিশ্বাস করি; সব ধুয়ে মুছে যাক, এক বিশ্বভাষা বিশ্বসভ্যতা তার জায়গায় চলুক, এই মতে আমি বিশ্বাস করি নে, একে সম্ভবপর বিবেচনা করি নে, কল্যাণকর বলেও ভাবি নে। A federation of cultures, languages, religions—not their suppres sion by one type. ইংরেজ ব'নে-যাওয়া হাইলাণ্ডার অতি ভীষণ জীব; এই জন্যই বাইরে—the Scot is the better Englishman. যেমন জার্ম্মাণ ও পোলিশ য়িহুদী আজকাল ইংলণ্ডে গোঁড়া ইংরেজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

খিলাফৎ ডেলিগেশনের কর্ত্তারা এখানে খুব খানিক হৈচৈ করলেন। দেখ্‌ছি, স্বদেশী আন্দোলোনের যুগে যে সব Mushroom patriots উঠেছিলেন, লম্ফে ঝম্পে, বোকামিতে, গোঁড়ামিতে * * প্রমুখ

সে সব ভুঁইফোড়দের চেয়ে একটুও কম নন্। এই দলের লোকেরা তোফা আছেন—আহার বিহার ভ্রমণ বেশ চ'লছে—কিন্তু কাজ কিছু কর'তে পারলেন না। এঁরা তুর্কীকে উদ্ধার করবার জন্য আমেরিকাতে প্রয়াণ করবার মানস করছিলেন, কিন্তু একটি বাঙালী মুসলমান এই রকম ক'রে না-হক্ গরীব ভারতবর্ষের পয়সা খরচ করবার বিরুদ্ধে দাঁড়ানতে শীগ্‌গিরই সবাই ঘরে ফির্‌ছেন। বোধ হয় আলিগড়াইট্ ইয়ং টার্কদের সঙ্গে থেকে, এঁদের সাহচর্য্য তাঁর বড় সুখকর লাগছে না। যে মুসলমান চোস্ত উর্দ্দূ ব'লতে পারে না, আলিগরাইটরা তাকে কৃপার চক্ষে দেখে—তার সঙ্গে একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের দৃষ্টিতে কথা কয়। * * * * * *

কৈফিয়ৎ।

—:*:—

আমার বন্ধু বান্ধবেরা গত কংগ্রেস সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। এ আলোচনা একটু ধীর ভাবে করা কর্ত্তব্য, কেননা আপাত দৃষ্টিতে এ কংগ্রেস যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তা এক হিসেবে যেমন হাস্যকর আর এক হিসেবে তেমনি গুরুতর। কংগ্রেস সম্বন্ধে একটা মতস্থির করবার পক্ষে ইংরাজিতে যাকে public opinion বলে, তার থেকে কোনরূপ সাহায্য আজ পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে যাঁর সঙ্গেই কথা কও না কেন, দেখতে পাবে তাঁর মত সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, অর্থাৎ—সে মত অপর কারোও মতের সঙ্গে মেলে না। আমি ইতিপূর্ব্বে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিষয়ে এহেন ঘোর মত-ভেদের পরিচয় পাই নি। মহাত্মা গান্ধির প্রস্তাবের যাঁরা বিপক্ষে তাঁদের পরস্পরের মতেরও যেমন কোন মিল নেই, যাঁরা পক্ষে তাঁদের পরস্পরের মতেরও তেমনি মিল নেই। গত কংগ্রেস আর কিছু করুক আর নাই করুক, দেশের লোককে অব্যবস্থিতচিত্ত করে রেখে গিয়েছে। এই কারণে এ কংগ্রেস সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা বারান্তরে লিপিবদ্ধ করব।

এই কংগ্রেসের সঙ্গে আমার যেটুকু ব্যক্তিগত সংস্রব ছিল আজ সেই সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলতে চাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি যখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বাঙলার নবগঠিত কাউন্সিলের একটি সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াই তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজ একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন কিন্তু অসন্তুষ্ট হন নি, তারপর সেদিন যখন আমি আমার সে অভিপ্রায় ত্যাগের কথা প্রকাশ করি, তখনও আমাদের শিক্ষিত সমাজ একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন, এবং এ সংবাদ শুনে অনেকে যেমন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ আবার তেমনি অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন। এতে অবশ্য আমি আশ্চর্য্য হই নি—কেননা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী আমাদের কর্ত্তব্য যে কি, সে বিষয়ে লোকমতের কোনরূপ ঐক্য, কোনরূপ স্থিরতা নেই।

যেহেতু আমি বাঙলার কোনও পলিটিক্যাল-পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট নই—সে কারণ অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার পক্ষে কংগ্রেস-পার্টির অপর বিশ জনের মতানুসরণ করবার কারণ কি?

এস্থলে আমি আমার ব্যক্তিগত মতই প্রকাশ করব—কেননা, আমরা অনেকে এক কাগজে নাম স্বাক্ষর করলেও আমার ধারণা, আমাদের মধ্যে প্রতি ব্যক্তিই নিজের নিজের হিসেব থেকে কাউন্সিলের সদস্য হবার অভিপ্রায় ত্যাগ করেছেন।

কাউন্সিল বয়কট করার যে কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ কিম্বা সার্থকতা আছে, এরূপ বিশ্বাস আমার কোনও কালে ছিল না, আজও নেই। আমি কি কংগ্রেসে, কি লোক-সমাজে, উক্তরূপ বয়কট করবার স্বপক্ষে অদ্যাবধি এমন কোনও যুক্তি তর্ক শুনি নি, যার দরুণ আমার পূর্ব্বমত ত্যাগ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। ধরে নেওয়া যেতে

পারে যে, এ বিষয়ে অধিকাংশ বাঙালী একমত—নচেৎ কংগ্রেসের বাঙালী কর্তাব্যক্তিরা কখনই কাউন্সিলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করতেন না, এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন না। যাঁরা বলেন যে, কাউন্সিলকে দক্ষযজ্ঞে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা সেখানে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের কথা একেবারেই মিছে—কেননা, ও-কথা তাঁরা তাঁদের ভোটারদের কাছে বলেন না। অতএব এ বিষয়ে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁরাও যে উক্ত প্রস্তাবানুসারে চলতে বাধ্য—এ মত আমি গ্রাহ্য করতে পারি নে। আমার মতে যাঁরা ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক Congress Committee-র মেম্বর, তাঁরা উক্ত প্রস্তাব শিরোধার্য্য করতে অবশ্য বাধ্য, বাদবাকী সকলে নয়। কেননা কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্ট নয় এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবও আইন নয়। তবে এ কথা আমি মানি যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিব্যক্তি যদি তার মতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে ও সেই অনুসারে চলতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে রাজনীতির কাজ চলে না, কেন না ও-হচ্ছে দশে মিলে করবার কাজ।—

এ অবস্থায় যাঁরা কাউন্সিলের সদস্য পদপ্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁরা কংগ্রেসের মত উপেক্ষা করতে পারতেন, যদি তাঁরা জানতেন যে তাঁদের electorate-এর মত অন্যরূপ।

আমাদের পক্ষে নিজ নিজ electorate-র বেশির ভাগ লোকের মত জানা অসম্ভব। এই কারণে আমি কংগ্রেসের মত গ্রাহ্য করা সঙ্গত মনে করি। যত দিন না দেশে electorate organisation

গঠিত হচ্ছে তত দিন কাউন্সিলের ক্যাণ্ডিডেট্‌দের পক্ষে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতির মতানুসারে চলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই—কেন না সে মত যে electorate-এর মত নয়, এমন কথা আমরা জোর করে কেউ বলতে পারি নে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী